ভূমিকা

চীনের কিয়াঙ্‌সু প্রদেশের নানকিঙ্‌ শহরে, একদা চতুর্দশ বছর আগে, এই উপন্যাস আমি লিখি। কোলাহল থেকে দূরে শান্ত এক ছোট্ট ঘর···আমার পড়ার ঘর···সেই ঘরে বসেই আমি লিখি। তার নীচু জানলা দিয়ে বাইরে, শহরের ছাদের পর ছাদ পেরিয়ে, নগর-প্রাচীর ছাড়িয়ে, সোজা দেখতে পেতাম সান-ইয়াৎ-সানের মর্মর সমাধি-স্মৃতি, রক্ত-পাথরের পাহাড়ের গায়ে ঝকমক ক'রে উঠতো তার প্রস্তর শুভ্রতা।

যে-সব মানুষের কথা নিয়ে আমার এই কাহিনী রচিত, তারা কিন্তু সেই ধনী প্রদেশের বাসিন্দা নয়। দুর্ভিক্ষ বিতাড়িত হ'য়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হাঁটতে তারা এই নানকিঙ্‌ শহরে এসে পৌছত। তাদের বাড়ীঘরদোর সব ছিল উত্তর অঞ্চলের আন্‌হুই প্রদেশে··· সেখানেও আমি বহুকাল বাস করেছি, তাদের মধ্যে থেকে তাদের জেনেছি, চিনেছি। দুর্ভিক্ষ শেষ হ'য়ে গেলে, তারা আবার সেই উত্তর অঞ্চলে ফিরে যেতো।

কিন্তু আজ সেই দক্ষিণী শহর, উত্তরাঞ্চল এবং চীনের সমস্ত পূর্ব উপকূল শত্রুরা [জাপানী ফ্যাসিষ্টরা] দখল ক'রে নিয়েছে। যে ঘরে বসে চরম নিশ্চিন্ত মনে নির্বিবাদে আমি লিখতাম, সে-ঘর, সে-বাড়ী আজ জাপানীরা অধিকার ক'রে নিয়ে আছে। না জানি, কত না অনাত্মীয় দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে সে আছে! শত্রুর আক্রমণের জঘন্যতম ও নিষ্ঠুরতম অপঘাত নানকিঙ্‌ শহরকে সহ্য ক'রতে হয়েছে। শত সহস্র নাগরিক লুণ্ঠিত, ধর্ষিত এবং নিহত হয়েছে। নবীন চীনের রাজধানী ক'রে নানকিঙ্‌ শহরকে তারা যে-সব সুন্দর সৌধমালায় বিভূষিত করে, আজ সে-সব সুরম্য অট্টালিকায় বিরচণ ক'রছে বিদেশী প্রভুর চরণাশ্রিত কলের পুতুলের শাসক আর তাঁর অনুচরেরা।

সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি শুধু সুনিশ্চিতভাবে একটী জিনিস জানি—'গুড আর্থ' যাদের নিয়ে লেখা, তারা তেমনি সজীব, সবল এবং সজাগ ভাবেই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে,—যে-মাটীকে, যে-দেশকে তারা ভালবাসে আজও তেমনি ভাবে তাকে ভালবেসে তারা বেঁচে আছে। যেদিন শত্রুরা পরাজিত হ'য়ে বিতাড়িত হবে, সেদিন তারাই আবার সেখানে মাথা তুলে থাকবে ; যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আবার ঘরে ঘরে ফিরে আসবে তাদের ছেলেরা, যারা আসতে পারবে না, যুদ্ধক্ষেত্রেই থাকবে শুয়ে। নতুন ক'রে সেদিন আবার তারা গড়ে তুলবে নতুন সব ভিত্তি। যদি এই যুদ্ধ-কণ্টকিত বর্ষের পর বর্ষ মানবতার কোন প্রয়োজনে লাগে, তা'হলে দেখা যাবে একটা মস্ত বড় প্রয়োজনীয় কাজ তারা স্থায়ীভাবে ক'রে গিয়েছে, তারা সমগ্র পৃথিবীর সামনে প্রমাণ ক'রে দিয়ে গিয়েছে চীনের অতি সাধারণ প্রতিদিনের মানুষের মধ্যে আছে কি প্রচণ্ড বীরত্ব আর অপূর্ব মহিমা।

পার্ল এস্ বাক

এক

আজ ওয়াং লাঙের বিয়ে।…

ভোরবেলা মশারির ভেতর আলো-আঁধারীর মধ্যে চোখ মেলেই ওয়াং লাঙের মনে হয় সে-কথা…আজকের স্নিগ্ধ সকাল মনে হয় অন্য রকম।

বাড়ীটা নিঝুম। কেবল থেকে থেকে বাবার চাপা দম-বন্ধ কাশির শব্দ কানে আসছে। বাবার ঘরটা ওর ঘরের সামনে, মাঝের ঘরের ও-পাশে।

প্রতিদিন ঘুম ভেঙেই বাবার কাশির শব্দই ওয়াং শোনে সর্বপ্রথম। বিছানায় শুয়ে শুয়েই শোনে, তারপর যখন শব্দটা ক্রমে ক্রমে কাছে এগিয়ে আসে আর কাঠের দরজাটাও কব্জার ওপর মোচড় খেয়ে কঁকিয়ে ওঠে, সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে।

কিন্তু আজ আর দেরী করে না ওয়াং। মশারি সরিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে। দেখে, আঁধার কাটিয়ে ভাবী দিনের আহ্বান। কাগজ-সাঁটা ছোট্ট ঘুলঘুলির ফাঁকে সোনালী আকাশের টুক্‌রো দেখবার জন্য ওয়াং ছিঁড়ে ফেলে কাগজটা।

বসন্ত এসে গেছে…কাগজ দিয়ে ঘরের ফাঁক আজ বন্ধ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

ওয়াঙের ইচ্ছে বাড়ীটা আজ ঝক্‌ঝকে ক'রে ফেলে। এই গোপন ইচ্ছেটুকু বাইরে প্রকাশ ক'রতে কোথা থেকে লজ্জা এসে ঘিরে ধরে তাকে।

ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে দেয় বাইরে। মৃদু, কোমল বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া। শুভ সূচনা। শুকনো মাঠগুলো তৃষ্ণার্ত হ'য়ে পড়ে আছে—বর্ষণের ধারা ব'য়ে গেলেই তাদের ফুটবে ফুল, ধরবে ফল। আকাশে বৃষ্টির আভাস আজ আর নেই। কিন্তু এই হাওয়া বইতে থাকলে দু'চার দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। সুলক্ষণ। কালই বাবাকে বলেছিল ওয়াং—আর ক'দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে গম যাবে নষ্ট হ'য়ে। আর আজই কিনা ভগবান তাদের জন্য তাঁর এই আশীর্বাদ পাঠালেন। বসুমতী এবার সুফলা হবে।

ওয়াং তাড়াতাড়ি উঠে মায়ের ঘরে গিয়ে নীল পাজামাটা পরে নিলো। গরম জলে স্নান সেরে জামা পরবে।

শোবার ঘরের পাশেই হেঁসেল। তারই এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে ড্যাবডেবে দৃষ্টি মেলে ওয়াঙের প্রতীক্ষায় বলদটা ডাকছে মাঝে মাঝে। থাকবার ঘর আর রান্না ঘরটা মাটির—নিজেদেরই জমির মাটি দিয়ে ওয়াঙের ঠাকুর্দার হাতের তৈরি। ক্ষেতের খড় দিয়ে চাল ছাওয়া, নিজেদেরই ক্ষেতের খড়। ঐ প্রকাণ্ড উনুনটা···এত বছরের দাহনে কালো পাথরের মতো হ'য়ে উঠেছে। উনুনের ওপরে চাপানো রয়েছে একটা প্রকাণ্ড কড়াই। অতি সাবধানে জলের জালা থেকে আধ-কড়াই জল ঢেলে নিল ওয়াং; তারপর কিছুক্ষণ কি ভেবে জালার সব জলটাই ঢেলে দিলে। আজ ওয়াং সর্ব অঙ্গে জল ঢেলে স্নান করবে, পরিচ্ছন্ন হবে। সেই শৈশকালের পর দেহের দিকে কারো দৃষ্টি পড়েনি আজ পর্যন্তও। আজ একজন তাকে দেখবে। তাই দেহটাকে পরিচ্ছন্ন ক'রে নিতে হবে।

উনুনের পেছনেই কুটো জমানো আছে। তার থেকে কিছু এনে উনুন ধরালো। কাল আর ওয়াঙকে উনুন ধরাতে হবে না। মা মারা গেছে ছ'বছর। এই দীর্ঘ ছ'বছর ওয়াং উনুন ধরিয়েছে, জল গরম করেছে—তারপর বাটি ভ'রে বৃদ্ধ বাবার কাছে এনে দিয়েছে। এই ছ'বছর বৃদ্ধ রোজই গরম জলের আশায় ছেলের জন্য প্রতীক্ষা ক'রেছে। কাল থেকে এ সবের শেষ। ওয়াংকে আর শীতে-গ্রীষ্মে অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়ে গিয়ে উনুন ধরাতে হবে না। সেও শুয়ে শুয়ে প্রতীক্ষা করবে···তার কাছেও এক বাটি গরম জল আসবে। আর যদি ফসল ভালো হয় জলের বদলে আসবে চা।

প্রতিদিন কাজ করতে করতে যদি তার ক্লান্তিই আসে—উনুন ধরাবার জন্য থাকবে তার সন্তানেরা; বহু-সন্তানবতী হবে নিশ্চয়ই ওয়াঙের বৌ। ক্ষুদ্র ঘর তিনটি উছলে উঠবে তার সন্তানদের হুটোপাটি উচ্ছ্বাস আর আনন্দে। ভাবীদিনের এমনিতর স্বপ্ন দেখে ওয়াং।

মা মারা যাবার পর বাড়ীটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। বাড়ীর তিনখানা ঘর বৃদ্ধ বাবা আর ওয়াঙের পক্ষে বেশী। আত্মীয়স্বজনের ভিড় ওদের আটকাতে হয়েছে—বিশেষ ক'রে কাকা। প্রকাণ্ড গোষ্ঠী-পরিবার তাদের। এ বাড়িতে এসে মৌরুসী পাট্টা জমাবার কি চেষ্টাই না করেছে তারা। কাকা মতলব হাসিল করার জন্য কতো রকম কৌশল করেছে। ওয়াংকে

বারবার বলেছে : 'বুড়ো বাপকে একা এক ঘরে ফেলে রাখছিস। বাপ-বেটায় এক সঙ্গে ঘুমোলে তো তোর তাজা শরীরের তাপে হিমের রাতে বুড়ো শরীর একটু গরম থাকে।' ওয়াঙের যদি একটু সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে আর একখানা ঘর খালি হয়ে যাবে—আর তাতে কাকাদের স্থানও হ'য়ে যেতে পারে।

বুড়ো সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলেছে : 'না না, আমার পাশে আর কেউ শোবে না—শোবে আমার নাতিরা। তাদেরই কচি দেহের তাপ আমার এই মরা শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

আসছে—সেই নাতিরাই আসছে। একটি নয়, দুটি নয়—আরো…আরো …অনেক। মাঝের ঘরটায়ও বিছানা পাততে হবে। ওঃ, সব ঘরগুলোই তাহলে বিছানায় বিছানায় ভরে যাবে।

শূন্য গৃহ শিশুর শয্যার ভরে-ওঠার সুখ-স্বপ্নে ওয়াং নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। কাপড় সামলাতে সামলাতে বৃদ্ধের শীর্ণ মূর্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

কাশির বেগে ধুঁকতে ধুঁকতে বলে : আজ এখনো জল গরম হ'লো না রে? আমি তো মরছি কাশতে কাশতে।' ওয়াং ফিরে আসে রান্নাঘরে লাল হয়ে ওঠে। বলে : 'কাঠগুলো কেমন ভিজে, জ'লো হাওয়া'

বৃদ্ধের কাশির বেগ থামে না। জল গরম হ'য়ে গেলে একটা বাটিতে … নিয়ে ওয়াং একটু ইতস্তত: করে। তারপর একটা পাত্র থেকে কয়েকটা চায়ের পাতা নিয়ে বাটিটার জলে ফেলে দিয়ে বাবার কাছে নিয়ে আসে। বৃদ্ধের দৃষ্টি লোভে জল্ জল্ ক'রে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কড়া কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে ওঠে : 'এঃ, খুব যে বড়মানুষী দেখছি আজ! চা, না তো—আস্ত পয়সা গেলা।'

'এই আজই একটু খাও বাবা! আরাম লাগবে,' একটু হেসে ওয়াং বলে। বৃদ্ধ তার শীর্ণ অস্থিসার গ্রন্থিল আঙুলগুলো দিয়ে বাটিটা ওয়াঙের হাত থেকে তুলে নিয়ে আপন মনে কি বলতে থাকে, বোঝা যায় না। কোঁকড়ানো পাতাগুলো ধীরে ধীরে জলের ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা দু'চোখ ভরে দেখে। দেখে দেখে তৃপ্তি যেন আর শেষ হয় না। এই মহামূল্য পানীয় মুহূর্তেই শেষ ক'রে ফেলতে বুকটা কেমন টন্‌টন্ ক'রে ওঠে।

'খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে বাবা!'

'ওঃ, তাইতো—' চম্‌কে উঠে বৃদ্ধ এক নিঃশ্বাসে বাটিটা শেষ ক'রে ফেলে। মাতৃস্তনে মুখ দিয়ে পরিতৃপ্ত শিশুর মুখে যে তৃপ্তি ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনি অপূর্ব তৃপ্তি ফুটে ওঠে বৃদ্ধের মুখে।

কিন্তু এদিকে ওয়াং যে বে-হিসেবীভাবে কড়াইয়ের সব জল বালতিটাতে

ঢেলে নিলো, তা কিন্তু বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়ালো না। গরম হ'য়ে বলে উঠলো : 'ব্যাটা, জলগুলো কিভাবে ফেলছে দেখ না ; ক্ষেতে জল বুঝি আর লাগবে না।'

ওয়াং জলই ঢালে, কোন উত্তর দেয় না।

চিৎকার ক'রে ওঠে বুড়ো : 'জবাব দিচ্ছিস না যে ?'

ওয়াং আস্তে আস্তে জবাব দেয় : সেই নতুন বছরের পর একদিনও ছান করিনি বাবা।'

এক অচেনা নারী এসে ওকে দেখবে, তাই এত আয়োজন,—একথা বাবাকে বলতে সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। তাড়াতাড়ি বালতিটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে যায়। দরজা ভালো ক'রে বন্ধ হয় না। বাবা দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলে :

'চোখ খুলতে না খুলতেই চা, ছান ক'রে অমন ক'রে জল নষ্ট করা ; এসব ভালো নয় বাপু। প্রথম থেকে মেয়েমানুষকে মাথায় তুললেই হয়েছে আর কি। কেই—'

তর থেকে চেঁচিয়ে বলে ওয়াং : 'রোজ তো করি না, একদিনই তো— া, জলটা নষ্ট হবে না বাবা। ছান হয়ে গেলে সব জলটাই মাটিতে ঢেলে ।'

বৃদ্ধ চুপ ক'রে যায়।

ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আলোর একটি ঋজু রেখা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। গরম জলে গামছা ভিজিয়ে ওয়াং তার পেটা দেহখানা বেশ ভাল ক'রে রগড়ে রগড়ে পরিষ্কার করে। দিনটা বেশ গরম ; কিন্তু গায়ে জল পড়লে কেমন একটু শিরশিরিয়ে ওঠে। গরম গামছা দিয়ে রগড়া'নো দেহ থেকে বাষ্প মন্থরভাবে উর্ধ্বে উঠতে থাকে। মায়েদি বাক্স খুলে ওয়াং একটা নীল সুতী-পোষাক পরে নেয়। গরম জামা না পরলে হয়তো একটু শীত করবে, কিন্তু ময়লা জামাটা আজ আর গায়ে দিতে ইচ্ছে হয় না। জামার বাইরের কাপড়টা ছিঁড়ে ভেতরের তুলো বেরিয়ে পড়েছে। এক নারী তার জীবনে প্রথম আসছে, এসেই এই দৈন্য দেখবে। তার এই দৈন্যকে শ্রীতে ভরিয়ে তুলবে ঐ নারীই ; কিন্তু তবুও এই প্রথম প্রভাতেই শ্রীহীনতার মাঝে তাকে সে আহ্বান করবে না।

নীল পা'জামা খানা পরে সেই রঙেরই কোর্তাখানা চাপিয়ে দিল। ঐ একটি মাত্র জামাই তাঁর সম্বল—নিমন্ত্রণ বা উৎসবের দিনে শুধু পরে, তাও

বছরে দশ-বারো দিনের বেশী হবে না। তারপরে অতিক্রান্ত বেণীটি খুলে ভাঙা টেবিলের দেরাজ থেকে চিরুণী নিয়ে আঁচড়াতে বসে।

আবার বাবা এসে দরজার ফাঁকে মুখ রেখে বলে : 'আজ আমায় না খাইয়েই রাখবি নাকি রে? সকাল বেলা পেটে কিছু না পড়লে বুড়ো মানুষ আমি কত বেলা পর্যন্ত থাকবো, বল্‌তো?'

কালো রেশমী ফিতে দিয়ে বেণী বাঁধতে বাঁধতে ওয়াং বলে : 'এই আনছি বাবা।'

কোর্তাটা আবার খুলতে হলো। বেণীটা মাথায় জড়িয়ে ওয়াং বালতি হাতে বাইরে এলো। খাবার কথা নিজে ভুলেই গেছে। ভুট্টার ময়দা দিয়ে একটু মণ্ড ক'রে বাবাকে দিয়ে আসবে, ওর নিজের তো কিছু আজ আর খাওয়া চলবে না।

হেঁসেলের দাওয়ার কাছে এসে বালতির জলটা মাটিতে ঢেলে দিয়েই ওয়াঙের মনে পড়ে গেল কড়াইতে একটুও জল নেই। উনুনও আবার ধরাতে হবে। মেজাজ গরম হ'য়ে ওঠে। উনুন ধরাতে ধরাতে আপন মনে বকবক্‌ করে ওয়াং : ভোর না হ'তেই 'বুড়োর খাওয়া আর খাওয়া।' প্রকাশ্যে কিছু বলে না। যাক্‌গে, আজকের পরে আর তো রাঁধতে হবে না—যত সব ঝামেলা। কালই তো এসব শেষ। কুয়ো থেকে জল এনে সামান্য জল কড়াইতে ঢেলে দিল। জলটা ফুটে উঠতেই তাড়াতাড়ি মণ্ড তৈরি ক'রে বাবাকে দিয়ে এল।

'এখন এই খাও বাবা, আজ রাতে আমরা ভাত খাব।'

কাঠি দিয়ে মণ্ডটা নাড়তে নাড়তে বাবা বলে : 'চালই বা কই রে, দেখ্‌তো ঝুড়িটা।' খুবই সামান্যই হয়তো ঝুড়িটায় আছে।'

'তা অল্প একটু কমই না হয় হবে।'

বৃদ্ধের কানে কথাটা প্রবেশ করে না, সে সশব্দে মণ্ডের বাটিতে চুমুক দেয়।

ওয়াং লাঙ আবার ঘরে গিয়ে কোর্তা প'রে নেয়; মুখে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বেণীটা পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দিলে। আজ একবার দাড়িটা কামিয়ে নিলে হতো। সূর্য তো এখনও ওঠেনি। তার বধূকে নিয়ে আসার জন্য জমিদার-বাড়ী যাবার আগেই সে নাপিত-পাড়ায় গিয়ে কামিয়ে নিতে পারবে; কিন্তু পয়সা। কোমর থেকে একটি ছাই রঙের থলি বের ক'রে গুনে দেখলো,

ছ'টা রুপোর টাকা আর কিছু খুচরো রেজকী আছে। রাত্তিরে জন কয়েক বন্ধুকে খেতে বলা হয়েছে—বাবা এখনও জানে না। জানলে আবার রাগারাগি করবে। কয়েকজনের মধ্যে তো কাকা আর তার ছেলে—তা এদের বলা তো বাবারই খাতিরে! তাছাড়া পাড়াপড়শী তিনজন। মনে মনে ওয়াং ঠিক করে, শহর থেকে কিছু শূয়রের মাংস, মাছ, আর বাদাম কিনে নেবে। বাঁশের কোঁড় যদি পায় তাও নেবে। বাগানে বাঁধাকপি হয়েছে—কপি দিয়ে মাংসের স্টু বেশ হবে। অন্য মাংসও কিছু নিতে হবে। তেল আর সয়াবীনের চাটনীটা আগেই কিনে ফেলতে হবে। কামাতে গেলে মাংসটা আবার কেনা হবে না, টাকায় টান পড়বে। যাক্‌গে, নাই হলো। হঠাৎ ওয়াং স্থির করে, মাথাটা আজ কামাতেই হবে। আর কিছু হোক আর না-হোক্‌।

বাবাকে কিছু না বলেই ওয়াং বেরিয়ে পড়ে। নিশাবসানে কালো অন্ধকারের বুক চিরে প্রত্যুষের রক্তিমাভা কাটিয়ে দূর-দিগন্তে সূর্য উঠছে। গম আর যবের অঙ্কুরে শিশির ঝলমল করছে। ওয়াঙের কৃষকের মন নাড়া খায়, ওয়াং নীচু হ'য়ে হাতের স্পর্শে গাছগুলো পরীক্ষা করতে বসে। গাছগুলো বৃষ্টির আশায় তাকিয়ে আছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ওয়াং ব্যগ্র দৃষ্টি আকাশে মেলে দিয়ে দেখল, বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। কিছু ধূপ এনে মন্দিরে জ্বালিয়ে দিতে হবে। শুভদিন, দেবতাকে স্মরণ না করলে যে উৎসবই অঙ্গহীন হয়ে যাবে!

আঁকাবাঁকা পায়ে-হাঁটা পথ ধরে ওয়াং চলে। ওই তো অদূরে শহরের ধূসর প্রাচীর। ফটক পার হয়ে সেই জমিদার-বাড়ী—যেখানে ওর বরণীয়া-কন্যা গোলামীর শৃঙ্খলে দিন কাটিয়ে চলেছে শৈশব কাল থেকে। অনেকে বলে যে, জমিদার-বাড়ীর বাঁদী বিয়ে করার চাইতে সাত জন্ম বিয়ে না করা ভালো। ওয়াং হতাশ হ'য়ে পড়েছিল—ওর আর বুঝি বিয়ে করাই হলো না। বাবা ওকে বুঝিয়েছে, বিয়েতে যা খরচ আজকাল, আর বেটিগুলোও তেমনি। এক রাশ কাপড়-গয়না না হ'লে তারা ফিরেও তাকায় না। সুতরাং বাঁদী ছাড়া গরীবের আর গতি নেই। নাহলে অত খরচ জোটাবে কোথা থেকে? তারপর বাবাই উদ্যোগী হ'য়ে জমিদার-বাড়ী এসে খোঁজ ক'রে মেয়ে ঠিক করেছে। বয়স একটু বেশী, আর চেহারাটাও তেমন ভালো নয়।

চেহারা ভালো নয় শুনে ওয়াঙের বুক মোচড় দিয়ে উঠেছিল। বৌ-র রূপে অন্যের চোঁখই যদি না টাটালো তবে আর বৌ কি হলো! ছেলের

মুখের দিকে তাকিয়ে বাপ সব বোঝে। তারও মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বলে : 'চাষীর ঘরে বৌ তো আর শিকেয় তুলে রাখবার নয়। সুন্দরী বৌ নিয়ে কি ধুয়ে খাবি? আমাদের চাষার ঘরে এমন শক্ত বৌ চাই যে ঘর সামাল দেবে এক হাতে, আর-এক হাতে মাঠে কাজ করবে আবার ছেলেও বিয়োবে বছর বছর। সুন্দরী বিবিরা এসব করবে না, বুঝলি। আমাদের কুচ্ছিৎ বৌ-ই ভাল রে। আর সুন্দরীরা সব যোয়ান বাবুদের পাতের এঁটো, এই তুই জেনে রাখিস। তা ছাড়া সুন্দরী যে চাস্, তুই কি ভেবেছিস্ বাবুদের বাড়ীর সোনা-রঙ ছেলেদের ছেড়ে তারা তোর চাষীর ঘর করতে আসবে?' ঠিক কথাই বাবা বলেছে—তবুও কোথায় যেন একটু কাটার খোঁচা। কিন্তু মনের কষ্ট চেপে ওয়াং একটু গরম হয়েই বাবাকে বলেছিল : 'আর যা খুশী হোক্‌গে—মুখে বসন্তের দাগ-ফাগ যেন না থাকে ঠোঁট-কাটাও যেন না হয়। ভালো ক'রে দেখে নিও, নইলে কিন্তু বিয়েই করবো না।'

যাই হোক্, মেয়েটির মুখে দাগও নেই, ঠোঁট দুটিও কাটা নয়। ওয়া ঐটুকুই মাত্র শুনেছে। তারপর একদিন বাপ-ব্যাটায় মিলে দুটো গিল্টি-কর রূপোর আংটি আর একজোড়া কানের দুল কিনে এনেছে। বাবা তাই দি ক'নে আশীর্বাদ ক'রে এসেছে। যে রমণী আজ ওয়াঙের জীবনে আসছে, তা সম্বন্ধে ওয়াং এর বেশী খবর রাখে না। তবে এটুকু সে জেনেছে যে সে অপরিচিতা রমণী আসবে আজ ওর পরম সান্নিধ্যে একান্ত আপনার হ'য়ে।

শহরের বড় ফটকের সংলগ্ন সুড়ঙ্গের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ওয়াং হেঁটে চলে এই পথে ভিস্তিওলারা জল নিয়ে আনাগোনা করে। ভিস্তি থেকে জল পা পড়ে নীচের পাথর স্যাঁতসেঁতে পিছল হ'য়ে আছে। গরমের দিনেও এ জায়গা ঠাণ্ডা। তরমুজওলারা তাদের তরমুজ ঠাণ্ডা রাখার জন্য এখানে ভিজে মাটি ওপর রেখে দেয়। তরমুজ অবশ্য এখনও দেখা দেয়নি। কাঁচা পিচ্ ফলে ঝুড়ি সারবেঁধে প'ড়ে আছে। ফেরিওলারা—'চাই পিচ্, চাই পিচ্—' ব হেঁকে যাচ্ছে। ওয়াং মনে মনে ভাবে : বৌ যদি ভালোবাসে, ফেরার প ওকে কিছু কিনে দেবো।'

ফিরবার পথে ওয়াং আর একা থাকবে না। সঙ্গে থাকবে ওর জীবন-সঙ্গিনী—ওর সারা জীবনের সাথী। সত্যি! স্বপ্ন নয় তো! বিশ্বাসই হয় না এত সুখ!

ফটক পেরিয়ে ডাইনে মোড় ঘুরে নাপিত-পাড়ায় এলো ওয়াং। তখনও নিঝুম, তখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। কেবল জনকয়েক সকালের হাটেই বেচাকেনা সেরে ফিরে গিয়ে চাষের কাজ করবে রাতেই বেসাতি নিয়ে এসেছে। ঝুড়ির পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রাতভোর কেঁপেছে। শূন্য ঝুড়িগুলো এখন পড়ে আছে ওদের কাছে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পাছে চেনা লোকের সামনে না পড়ে যায়। কোনো বিদ্রূপ সহ্য করতে পারবে না ও। রাস্তার ওপারে আপন ঘ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাপিতেরা। ওয়াং সোজা ে দোকানটায় গিয়ে টুলের ওপর ব'সে নাপিতকে হাতের ইশারায় দিল। নাপিত তাড়াতাড়ি এসে উনুনের ওপর থেকে খানিকটা গরম একটা পেতলের বাটিতে ঢেলে নিল, তারপর ব্যবসায়ীর অভ্যস্ত স্বরে জি করলো: 'পুরো কামাবে তো ?

'হাঁ, চুল দাড়ি সব।'

'নাক কান পরিষ্কার হবে ?

'কত লাগবে ?'—ওয়াং ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

একখণ্ড কালো রঙের কাপড় জলে ভেজাতে ভেজাতে নাপিত বললে :

'চার পয়সা।'

'দুই পয়সায় হবে না ?'

ওয়াঙের মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে নাপিত জবাব দেয় : 'নিশ্চয় হবে — আধা দাম—আধা কাম। একটা কান আর একটা নাক—আর আদ্ধেক দা তা, কোন্ দিকের দাড়ি কামাবে, দাদা ?' ব'লে পাশের নাপিতের তাকিয়ে চোখ টিপতেই সে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওয়াং ব পারে এই হাসি কার উদ্দেশ্যে। ওর ভেতরটা কুঁকড়ে গেল। ক্ষুদ্র ন বটে, কিন্তু যত ক্ষুদ্রই হোক—সহুরে ব্যক্তিদের সামনে কেন জানি ওয়াং সংকুচিত হ'য়ে ওঠে। শোধরাবার জন্য তাড়াতাড়ি সে বলে : 'তা তোম খুশী তাই করো।'

নাপিত লোক হিসেবে নেহাৎ মন্দ নয়। ওয়াং নিজেকে তার হ সমর্পণ ক'রে দেয়। সাবান লাগিয়ে ঘসতে ঘসতে নাপিত ওয়াংকে ব 'চুলগুলো কেটে ফেল্লে তোমায় মন্দ দেখাবে না ভাই। আর আজ-কা ফ্যাসানই তো বেণী কেটে ফেলা—বেণী রাখে সব সেকেলে লোকেরা।'

ওয়াঙের মাথার বেণীটির বড় কাছে নাপিতের কাঁচি নৃত্য করে, ওয়াঙের ভয় করে। চিৎকার ক'রে বলে : 'বাবাকে না বলে ও বেণী কাটতে পারবো না।' নাপিত হেসে ওঠে।

কামানো হ'য়ে গেলে নাপিতের ভেজা শিরা-ওঠা হাতে পয়সা গুনে দিতে দিতে ওয়াং শিউরে ওঠে : 'ওঃ, এতগুলো নগদ পয়সা চলে গেল।' যেতে যেতে কেশবিহীন মাথায় আর মুখে হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে ওয়াং নিজেকে সান্ত্বনা দেয় : 'যাকৃগে। একটা দিনই তো।' তারপর বাজারে গিয়ে সের খানেক শূয়রের মাংস কিনল। কসাই শুকনো পদ্ম পাতায় মাংসটা দিল জড়িয়ে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে কি ভেবে আধপো গরুর মাংসও কিনল। আর খানিকটা সয়াবীনের চাটনীও নিয়ে নিল। কেনাকাটার পর্ব শেষ হয়ে গেলে এক গন্ধ-বণিকের দোকানে গিয়ে ওয়াং ধূপকাঠি কিনল। তারপর আস্তে আস্তে চললো জমিদার-বাড়ীর দিকে। ওর বড় লজ্জা করতে লাগল।

জমিদার-বাড়ীর ফটকে পৌঁছুতেই কোথা থেকে লজ্জা আর ভয় সমস্ত রক্ত হিম ক'রে দিল। একা সে এলো কি করে? বাবাকে বা কাকাকে নিয়ে এলেই হতো কিংবা কেনো প্রতিবেশীকে। এই বিরাট রাজবাড়ীর মতো বাড়ী, এত বড় বাড়ীতে ওয়াং মাথাই গলায়নি কোনোদিন। বিয়ের বাজার হাতে নিয়ে রাজবাড়ীতে প্রবেশই বা করবে কি ক'রে? নিজের মুখেই বলতে হবে বৌ নিতে এসেছে। সিংহদ্বারের দিকে তাকিয়ে ওয়াং দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। দরজা তখনও খোলেনি; লৌহ-কীলক বসানো কালো অতিকায় দুটো দরজা। দু'দিকে পাথরের তৈরি দুটো সিংহমূর্তি। কেউই নেই সেখানে, ডাকবে কাকে? ফিরে আসে ওয়াং।

হঠাৎ সমস্ত শরীরটা বড় অবসন্ন মনে হয়। কিছু খেতে হবে। সকালে তো কিছুই পেটে পড়েনি; একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

রাস্তার পাশেই অপরিসর চায়ের দোকানটায় গিয়ে টেবিলের ওপর দুটো পয়সা রেখে ওয়াং গিয়ে বসলো। অতি অপরিচ্ছন্ন পোষাকের ওপর কুচকুচে কালো রঙের এপ্রন-এঁটে-ভৃত্য কাছে এলো, তাকে খাবার আনবার হুকুম দিল ওয়াং। খাবার এসে পৌঁছলে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কাছে দাঁড়িয়েই ভৃত্যটি পয়সা দুটো নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগল। খেলা না থামিয়েই নির্লিপ্তভাবে সে জিজ্ঞেস করে : 'আর কিছু আনবো?'

ওয়াং মাথা নেড়ে নিষেধ জানায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে, চেনা মুখ

নেই একটাও, আশ্বস্ত হয়। কয়েকজন বসে চা খাচ্ছিল। সবাই গরীব। পরিচ্ছদে ওয়াংই এদের মধ্যে বিশিষ্ট। ভিখিরী যাচ্ছিল পথ দিয়ে, যেতে যেতে ওকে শিক্ষকমশায় মনে ক'রে ভিক্ষে চাইলো।

এর আগে ওয়াঙের কাছে কেউ কোনোদিন ভিক্ষে চায়নি—শিক্ষক বলেও কেউ ভাবেনি। তাই পরম খুশী হয়ে ভিখিরীকে দুটো পয়সা ভিক্ষে দিয়ে দিল। জানোয়ারের থাবার মত দুটো কালো কালো হাত বার ক'রে ছোঁ মেরে পয়সা দুটো তুলে নিয়ে ট্যাকে গুঁজে ছুটে চলে গেল লোকটা।

ওয়াং ব'সেই রয়েছে। সূর্য অনেকটা ওপরে। কাছেই দোকানের ভৃত্যটি অস্থির ভাবে পায়চারী করছে। কিছুক্ষণ পরে ওকে রূঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিলে: 'মিছিমিছি ব'সে থাকা চলবে না এখানে, ভাড়া লাগবে। কিছু কিনে খেতে হয়তো খাও।'

ওয়াং জলে ওঠে। দুত্তোর! মিছিমিছি বসে থাকাবো কেন? ঢের আগেই চলে যেত। নেহাৎ জমিদার-বাড়ী গিয়ে বৌ আনতে হবে, তাই। অপেক্ষা করতেই হবে। ঘেমে উঠল ওয়াং। কি আর করে, আবার চায়ের হুকুম দিতে হয়। কিন্তু ওর মুখের কথা শেষ না হ'তেই ও শুনতে পেল: 'পয়সা দাও আগে—' তাকিয়ে দেখল সেই ছোকরা। ওয়াঙের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল কিন্তু পয়সা বের করতেই হবে। ডাকাত! ডাকাত!

সামনের লোকটা কে যাচ্ছে? রাতে যাদের নেমন্তন্ন করেছে তাদেরই একজন না। সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি বাকী চাটুকু গিলে পেছনের দরজা দিয়ে ওয়াং বেরিয়ে উধাও হয়ে গেল। আবার এল জমিদার-বাড়ীর সামনে। ফটকের দরজা খুলেছে। অনেক বেলা হয়েছে। দারোয়ান বাঁশের খড়কে দিয়ে অলসভাবে দাঁত খুঁটছে। কি লম্বা মানুষটা! বাঁ গালে একটা বড় আঁচিল, তাতে তিনটে লম্বা লম্বা চুল। ওয়াঙের ঝুড়িটা দেখে ফেরিওয়ালা ভেবে কর্কশ স্বরে চিৎকার ক'রে উঠল: 'কি চাই?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওয়াং বলে আমতা আমতা ক'রে: 'আ—মি—আ-আ-মি ওয়াং লাঙ।'

'হুঁ, তা চাই কি?' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দারোয়ান বলে। বোঝা গেল এ পুরুষ-প্রবরটি অপাত্রে সৌজন্যের অপচয় করে না কোনোদিন।

'আমি এসেছি—'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি চাঁদবদন।' আঁচিলের চুল তিনটে পাকাতে পাকাতে দারোয়ান তাড়া দেয়।

'একটি মেয়ে—একজন দাসী—' আর বলতে পারে না ওয়াং, কণ্ঠে যেন কে একটা মস্ত পাথর ঠেলে দিয়েছে। ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠে।

হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠে লোকটা :'হোঃ হো, বর ? একখানা ঝুড়ি লটকে যা খোল্‌তাই চেহারা বাগিয়েছো, তা চিনবে কার সাধ্যি ? তা বেশ বেশ।'

কুণ্ঠায় একেবারে এতটুকু হয়ে যায় ওয়াং। আমতা আমতা ক'রে বলে : এই একটু মাংস কিনে আনলাম।' বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু দারোয়ানের নড়বার কোন লক্ষণ নেই।

'যাবো ?' ওয়াং জিজ্ঞেস করে।

দারোয়ান সবকটা দাঁত বের ক'রে বিশ্রী হেসে বলে : 'মাথাটি তাহলে খসিয়ে রেখে ফিরতে হবে বাপু ?'

এতক্ষণে ওয়াংকে লক্ষ্য ক'রে দেখল দারোয়ান। নেহাৎ সাদাসিধে গোবেচারী ভালোমানুষী চেহারা লোকটার। বলে : 'রূপোর চাবিতে সব দরজাই খোলে হে চাষার-পো।' ওয়াং বোঝে, কিন্তু মিনতি করে : বড় গরীব—'

দেখি তোর গেঁাজ বের কর্‌।'

ওয়াং সত্যি সত্যি ঝুড়ি নামিয়ে কোর্তা তুলে কোমর থেকে থলিটা নিয়ে উপুড় ক'রে বাঁ হাতের তেলোয় ঢেলে দিল। দারোয়ান উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল লোকটার বোকামী দেখে। একটা টাকা আর চৌদ্দটা পয়সা ছিল। ছোঁ মেরে টাকাটা তুলে নিয়েই দারোয়ান লম্বা লম্বা পা ফেলে 'বর। বর।' বলে চিৎকার করতে করতে অন্দরের দিকে চললো। ওয়াং একটা প্রতিবাদ করারও সময় পেল না।

ভয়ানক রাগ হলো ওয়াঙের। দারোয়ানের ঘোষণায় ওর বুকটাও দুর্ দুর্ ক'রে ওঠলো। কিন্তু উপায় নেই, পেছন পেছন ওকে যেতেই হয়—পা কাঁপে থর্ থর্ ক'রে। মুখ দিয়ে আগুন ছোটে। মাথা বোঁ বোঁ করে। মাথা নিচু ক'রে মহলের পর মহল পেরিয়ে যায়—সামনে সেই 'বর। বর।' চিৎকার, আর মূর্ত প্রতিধ্বনির মতো ও চলেছে পেছনে। চার পাশ থেকে আসে নানা সুরের হাসি আর সরস মন্তব্য। প্রায় শ'খানেক মহল পার হয়ে দারোয়ান থামলো। তারপর ওয়াংকে একটা ছোট ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই এসে বলল :

'হুকুম হয়েছে, চল্ রাণীমা'র দরবারে।'

ওয়াং যাবার জন্য পা তুলতেই দারোয়ান মহা বিরক্তিতে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে : 'ব্যাটা গেঁয়ো ভূত, ঐ আস্তাকুঁড় কাঁধে ঝুলিয়ে যাচ্ছেন রাণীমার সামনে।'

ওয়াং ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাইতো। কিন্তু ঝুড়িটা রাখে কোথায়? কিছু যদি খোওয়া যায়! ঐ সের-টাক মাংস আর মাছটুকুর জন্য যে সারা সংসার ওৎ পেতে নেই একথা ওয়াঙের বিশ্বাসই হয় না। দারোয়ান ওর এই ভয় আঁচ ক'রে বলে : 'নিকুচি করেছে তোর মাংসের—ও-রকম জিনিস এবাড়িতে কুকুরেও খায়না, বুঝলি।' ব'লে ঝুড়িটা ওয়াঙের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দরজার পেছন ছুঁড়ে দিয়ে ওয়াংকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। কারুকার্য খচিত জালি আর স্তম্ভের সারি পেরিয়ে প্রশস্ত অলিন্দের ওধারে প্রকাণ্ড হলঘর। এত প্রকাণ্ড একটা ঘর যে হতে পারে, না দেখলে ওয়াঙের বিশ্বাসই হতো না। ওয়াংদের বাড়িখানার মতো গোটা কুড়ি বাড়ি ঐ একটা ঘরেই পুরে ফেলা যেতে পারে। হয়তো তাতে এর একটি কোণও ভরবে না। উঁচু ছাদ। মাথা তুলে ওপরে কড়ি বরগার অপরূপ কারুকার্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ওয়াং। দরজার কাছে এসেই চৌকাঠে হোঁচট্ খেল একটা। দারোয়ান ধরে ফে'লে বললে : 'হ্যাঁ, ঠিক অমনি ক'রে চার-হাতপায়ে উপুড় হয়ে রাণীমাকে একটা পেন্নাম কর্ দেখি ব্যাটা।'

লজ্জায় ভেঙে পড়ে ওয়াং। সম্বিত ফিরিয়ে এনে সামনে তাকিয়ে দেখে,—হল-ঘরের মাঝখানে একটি কারুকার্য খচিত উচ্চাসনের ওপর বসে আছেন এক স্থবির নারী মূর্তি। উজ্জ্বল শাটীনের পরিচ্ছদে আবৃত ছোট দেহটি, মুখখানা বলিকীর্ণ, কালো রেখা-বলয়িত গভীর কোটর-গত তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র দু'টি চোখ, এক হাতে আফিঙের নল; কোমল মসৃণ সোনার প্রতিমার হাতের মতো পীত বর্ণ হাতখানা। অভিভূত ওয়াং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে গিয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ফেলে।

বৃদ্ধা গুরু গম্ভীর স্বরে দারোয়ানকে আদেশ করে : 'হয়েছে, হয়েছে, খুব হয়েছে। উঠিয়ে দে এবার। ওকি সেই বাঁদীটার জন্য এসেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ রাণীমা—' দারোয়ান জবাব দেয়।

'তুই বলছিস্ কেন; ওর কি নিজের মুখ নেই?'

'রাণীমা, চাষা তো, জানে না কিছুই।'—আঁচিলের লোম তিনটি পাকাতে পাকাতে দারোয়ান বলে।

ওয়াং যেন বাস্তবে ফিরে আসে। দারোয়ানের দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে নিজেই বলে: 'রাণীমা, আমরা চাষী-মানুষ, অপরাধ নেবেন না।'

রাণীমা, অর্থাৎ কর্ত্রী ঠাকরুণ স্থির-গাম্ভীর্যের সঙ্গে সন্ধানী-দৃষ্টি মেলে কি যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু আফিঙের নলটার ওপর হঠাৎ তার মুঠি চেপে বসলো। মুহূর্তে তাঁর জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল ওয়াঙের অস্তিত্ব। ঝুঁকে প'রে লুব্ধভাবে নলের ধোঁয়া টানতে টানতে যেন তারি মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল চেতনা। চোখের সে-তীক্ষ্ণতার ওপর ছায়া ঘনিয়ে এলো, বিস্মৃতির কালো পর্দা নেমে এলো দৃষ্টির ওপর। ওয়াং বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অল্পক্ষণ পরেই আবার রাণামার দৃষ্টি ওয়াঙের ওপর ফিরে এল। উগ্রস্বরে জিজ্ঞেস করলেন: 'কে ওটা, এখানে কি করছে?' যেন আগের সব কিছু তাঁর স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গেছে। দারোয়ানের মুখে কোনো ভাব-বিকারই দেখতে পেলো না ওয়াং। সে নিরুত্তর। ওয়াং অবাক হয়ে নিজেই উত্তর দিল: 'আমি আপনার সেই দাসীর জন্য দাঁড়িয়ে আছি রাণীমা।'

'দাসী? কোন্ দাসী আবার?'

পাশের পরিচারিকা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর লুপ্ত স্মৃতি চকিতে যেন ফিরে আসে। অনুশোচনার স্বরে বলেন: 'পোড়া কপাল! সব ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—ওলান্ ওলান্। কোন্ এক চাষীর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছে, না? তুই বোধ হয় সেই চাষী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ রাণীমা,' মাথা নামিয়ে ওয়াং উত্তর দেয়।

'যা যা, শিগ্‌গির ওলান্‌কে ডাক তোরা,' পরিচারিকাকে হুকুম করেন রাণীমা। এই ব্যাপার মিটিয়ে ফেলে নির্জন ঘরের শূন্যতার মধ্যে আফিঙের নেশায় ডুবে থাকার জন্য বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

খুব দেরী হলোনা। পরিচারিকা হাতে ধরে ওলান্‌কে নিয়ে এল। দীর্ঘ, পুরুষালি গঠন—নীল রঙের জামা আর পা'জামা পরা। একবার দেখেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় ওয়াং। ওর বুকটা আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই ওর জীবন-সঙ্গিনী! ওর বধূ! ওর প্রিয়া!

নির্বিকার কণ্ঠে বৃদ্ধা ডাক দেয়: 'এদিকে আয় বাঁদী। এই লোকটাকে দেখছিস? ও তোর বর।'

বাঁদী কাছে গিয়ে নতশিরে জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তৈরি হয়েছিস্?'

প্রতিধ্বনির মতো ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেয় ওলান্ : 'আজ্ঞে।'

ওয়াং শোনে। ঐ তো সে দাঁড়িয়ে সামনেই। পিঠটাই কেবল চোখে পড়ে। কণ্ঠস্বরটা ওর কানে হয়তো মধু বর্ষণ করলো না, কিন্তু এ সেই স্বর যা শুনতে ভালো লাগে। কণ্ঠস্বরে উচ্চতা নেই, হয়তো মধু ঝরে না, তবে উগ্রতা নেই—সাধারণ স্থির অচঞ্চল। পরিষ্কার ক'রে চুল বাঁধা, সামান্য পরিচ্ছদেও পারিপাট্য-পরিচ্ছন্নতা আছে। পা বাঁধা নয়। ওয়াঙের মনটা দমে যায়। যাক্ গে, ওসব কথা ওয়াং পরে ভাববে। এখন ভাবার সময়ও নেই।

রাণীমা দারোয়ানকে আদেশ করেন : 'বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে আয়, ওরা যাক্ এবার।' তারপর ওয়াংকে বলে : 'তুই গিয়ে ওর পাশে দাঁড়া, আমি যা বলি মন দিয়ে শোন।'

বৃদ্ধা বলতে শুরু করে। ওয়াং শোনে : 'ওলান্ দশ বছর বয়সে এ বাড়ীতে আসে। এখন ওর বয়স আন্দাজ কুড়ি। দশটা বছর ও এখানেই আছে। সেবার দুর্ভিক্ষের বছরে ওর বাবা মা খেতে না পেয়ে দক্ষিণ দেশে আসে সান্টুঙ থেকে। মেয়েকে এই জমিদার-বাড়ীতে বেচে দিয়ে পথের খরচা ক'রে তারা আবার দেশে ফিরে যায়। তারপর থেকে আর তাদের কোনো খোঁজ নেই। মেয়েটার শক্ত চওড়া গড়ন, আর উঁচু চোয়াল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস যে এরা এ অঞ্চলের মানুষ নয়। খাটতেও পারে খুব—যা বলবি সব পারবে মেয়েটা। চেহারাটা অবশ্যি তত ভালো নয়। তা চাষার ঘরে সুন্দর বৌ দিয়ে কি দরকার? যারা ব'সে খায় তারাই সুন্দরী বৌর রূপের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে পারে। খুব সোজা সরল মানুষ ওলান্—যেদিকে চালাবি সেদিকেই চলবে। মেজাজ নেই, বেশ ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়ে। এ বাড়ীর সুন্দরী দাসীদের ভিড়ে বাবুদের হাতে থেকে ও বেঁচে গেছে—চাকরদের নজরেও নিশ্চয়ই পড়েনি—কারণ বাবুদের পাতের এঁটো সুন্দরী দাসীরা ওদের ভোগেই লাগে। তাদের ছেড়ে যে চাকরদের চোখে পড়েছে, তা মনে হয় না। যাই হোক, তুই ওকে যত্ন করিস। পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা না থাকলে, মেয়েটাকে আমি কখনোই কাছছাড়া করতাম না। রান্না ঘরের কাজে ওর জুড়ি নেই। অবশ্যি, পাত্র পাওয়া গেলে আর বাবুদের দরকার না থাকলে দাসীদের বিয়ে দিয়ে সংসারে স্থির ক'রে দেওয়াই জমিদার-বাড়ীর রীতি।'

তারপর ওলানের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'বছর বছর যেন ছেলে হয়। স্বামীর কথা শুনিস, শ্রদ্ধা-মান্য করিস, আর প্রথম ছেলে হলে দেখিয়ে যাস।'

ওলান মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

কিছু বলা উচিত কিনা ভেবে ওয়াং অস্থির হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বৃদ্ধা যেন বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। বলে উঠলেন: 'যা, এবার যা তোরা এখান থেকে—'

ওয়াং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে বেরিয়ে আসে। ওলান পেছনে। দারোয়ান ওলানের বাক্সটা নিয়ে ওদের পেছনে পেছনে হাঁটে। যে-ঘরে ওয়াঙের ঝুড়িটা রাখা ছিল, সেঘরে ধুপ ক'রে বাক্সটা ফেলে দারোয়ান মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

ওয়াঙ লাঙ ফিরে ওলানের দিকে তাকায়। এই শুভদৃষ্টি। চৌকো গড়ন, সরল মুখ—নাকটা একটু ছোট ও চওড়া চাপা, নাসারন্ধ্র তাই একটু বিস্ফারিত। ঠোঁটদুটো ছোট। চোখের দৃষ্টিতে বিষাদের ছায়া। মুখে কঠিন নীরবতা; যেন ইচ্ছে থাকলেও ভাঙবে না। শুভদৃষ্টি! কিন্তু জীবনের এই প্রথম শুভদৃষ্টি ঐ নারীর মধ্যে না আন্‌লো কোনো শিহরণ, না পারলো তার শান্ত ধৈর্যের বর্ম ভেদ করতে। ওয়াং খুঁজে পায় না কোন কমনীয়তার রেখা। ঐ মুখ শুধুই একখানা অতি সাধারণ ঔদাস্যে পরিপূর্ণ শান্ত নির্বিকার মুখ। একি পাথর কেটে মুখ! কিন্তু তবুও ওয়াং হৃষ্ট হলো। মেয়েটির তাম্রাভ বর্ণে বসন্তের দাগও নেই, ঠোঁটও কাটা নয়। ওরই দেওয়া গিল্টীকরা দুল জোড়া দুলছে কানে, হাতে সেই আংটি!

একটা চাপা পুলকে ভরে ওঠে ওয়াঙের মন। জীবন-সাথীকে আজ কি পেল ওয়াং? কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ হতে দেয় না। পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে কর্তৃত্বের ইঙ্গিতে ও বাক্স আর ঝুড়িটা দেখিয়ে দেয়। নিঃশব্দে বাক্সটা কাঁধে তুলে নেয় ওলান্। অতিরিক্ত ভারে ওর পা কাঁপতে থাকে। ওয়াঙের দৃষ্টি এড়ায় না। বলে: 'থাক, বাক্সটা আমিই নিচ্ছি, ঝুড়িটা বরং তুমি ধরো।'

ভাল পোষাকটা বুঝি নষ্ট হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে বাক্সটা কাঁধে তুলে নেয়। ওলানের কোনো পরিবর্তন নেই হাবেভাবে। নীরবে ঝুড়িটা হাতে ঝুলিয়ে নেয় সে। আবার কতকগুলো কুতূহলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পার হতে হবে ভেবে যেন অস্থির হয়ে ওঠে ওয়াং। 'খিড়কীর দরজা টরজা নেই?' ওয়াং জিজ্ঞেস করে।

ওলান একটা সংকীর্ণ অব্যবহৃত জঙ্গল-ভরা আঙিনা পেরিয়ে ওয়াংকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসে। একটা বুড়ো পাইনগাছের তলা দিয়ে বহু প্রাচীন একটা দরজা খুলে ওরা বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় পা দেয়। বার দুই পেছন ফিরে দেখল ওয়াং। বড় বড় পাদু'খানির স্থির সঞ্চরণে ওলান হেঁটে

চল্‌ছে, যেন আজন্ম ঐ পথ দিয়েই সে চলায় অভ্যস্ত। মুখে কোন ভাবের চিহ্নমাত্র নেই।

সহর-প্রাচীরের প্রান্তে এসে হঠাৎ ওয়াং থেমে পড়ে। এক হাতে বাক্সটা ধরে আরেক হাতে কোমর হ'তে দুটো পয়সা বের ক'রে, দু'টা কাঁচা পিচ ফল কিনে ওলানকে দিয়ে খেতে বললে, ওয়াঙের কথা বলার মধ্যে আদেশের সুর। ওয়াঙের হাত থেকে পিচগুলো নিয়ে নিঃশব্দে নিজের হাতের মধ্যে রাখে, ঠিক লোভী বালিকার মতো।

ক্ষেতের আল ভেঙ্গে চলেছে ওরা। পিছন ফিরে ওয়াং তাকায়, দেখে, একটা পিচ ফল নিয়ে সন্তর্পণে একটু একটু ক'রে খাচ্ছে ওলান। ওয়াঙের দিকে চোখ পড়তেই ফলটা হাত দিয়ে ঢেকে চিবোন বন্ধ ক'রে দেয়।

পশ্চিমের মাঠে ক্ষেত্রদেবতার মন্দির, ছোট্ট মন্দির, একটা মানুষের সমান উঁচুও হবে না, ঝামা ইঁটের তৈরি, ছাদ টালির। ওয়াঙেরই ঠাকুরদাদা সহর থেকে ইঁট এনে এটা তৈরি করিয়েছিল। দেয়ালের বাইরের দিকটায় একদা আঁকা ছিল একটা পাহাড় ও বাঁশ ঝাড়ের চিত্র। কালের দাপটে পাহাড় গেছে মুছে, বাঁশগুলো হয়েছে রেখায় পর্যবসিত। মন্দিরে দু'টি মৃন্ময়ী মূর্তি দাঁড়িয়ে, ধ্যান-গম্ভীর—সঙ্গিনীকে পাশে নিয়ে ক্ষেত্রদেবতা। এই জমিরই মাটি দিয়ে তৈরি প্রতিমা। লাল কাগজের সজ্জা পরানো। ক্ষেত্রদেবতার গোঁফে বাস্তবের ছাপ আনা হয়েছে—সত্যিকার চুল লাগানো হয়েছে। ওয়াঙের বাবা নিপুণ হাতে নতুন ক'রে প্রতিমার পোষাক তৈরি ক'রে দেয় প্রতি বছর। আবার প্রতি বর্ষায় নষ্ট হ'য়ে যায় সে-সাজ।

এখন সবে মাত্র বছরের শুরু। লাল কাগজের পোষাক এখনও তাই নষ্ট হয়নি। সুসজ্জিত ক্ষেত্রদেবতার মূর্তি দেখে ওয়াঙের মনে তৃপ্তি আসে। ওলানের হাত থেকে ঝুড়ি নামিয়ে অতি সাবধানে ধূপকাঠি বের করে। ধূপকাঠিগুলো ভাগ্যিস ভেঙ্গে যায়নি, ভেঙ্গে গেলে যে ভারী অমঙ্গল হবে।

সারা গ্রামের পূজো পড়ে এই ক্ষেত্রদেবতার মন্দিরে। বেদীর ওপর ধূপের ভস্ম জমে আছে। কাঠিদুটি তারই মধ্যে গুঁজে দিয়ে চক্‌মকির আগুনে একটা শুকনো পাতা ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিল ওয়াং।

দু'জনে পাশাপাশি দেবতার সামনে দাঁড়ালো। ধূপ লাল হ'য়ে জ্ব'লে শুভ্র ভস্মে নিঃশেষ হয়ে যায়, নারী চোখ ভরে দেখে···ধূপকাঠির মাথায় ভস্ম জমে ওঠে, নীচু হ'য়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ঝেড়ে দেয় ওলান। তারপর হয়তো

অন্যায় কিছু ক'রে ফেলেছে ভেবে সন্ত্রস্ত হ'য়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকায় ওয়াঙের দিকে। ওয়াঙের বড় ভালো লাগে এই দৃষ্টি ; ভালো লাগে প্রতিটি ভঙ্গি ওর। ওলান্ যেন সমস্ত মন দিয়ে বুঝে নিয়েছে, এ ধূপ ওয়াঙের একলার নয়, ওদের দু'জনেরই। এই তো বিবাহের শুভ লগ্ন! নীরবতায় দাঁড়িয়ে থাকে ওরা পাশাপাশি—ধূপ জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হ'য়ে যায়।

দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ওয়াং আবার বাক্স কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়।

বাড়ির দোরে বসে বৃদ্ধ পরম আরামে দিন-শেষের রোদটুকু ভোগ করছিল। ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ি এলো, বৃদ্ধ নড়লো না, যেন লক্ষ্যও করলো না। এতে যে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। মুখ না ঘুরিয়েই বললে : 'ঐ যে মেঘখানা দেখছিস ওয়াং,' এমনি ভাব যেন, আকাশের মেঘ ছাড়া মাটির পৃথিবীতে দেখবার আর কোনও কিছুই নেই, 'চাঁদটার বাঁকা কোণটার দিকে হেলে আছে, ঐটেতে বৃষ্টি হবে, কিন্তু কালকের আগে হবে না।' তক্ষণি চোখ পড়লো ওয়াং বৌ-এর হাত থেকে ঝুড়ি নামাচ্ছে। সুতরাং কণ্ঠস্বরে বেশ ঝাঁঝ মিশিয়ে বললে : 'সব উড়িয়ে এসেছ তো একেবারে।' টেবিলের উপর ঝুড়িটা তুলে রাখতে রাখতে জবাব দেয় ওয়াং : 'রাতে জন কয়েককে খেতে বলেছি বাবা—'

ওলান্‌এর বাক্সটা শোবার ঘরে নিয়ে নিজের বাক্সের পাশে রেখে দেয়। তারপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাক্স দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে ওয়াং। বাবা দরজার কাছে এসে মোটা গলায় বলে : 'পয়সা, পয়সা নয়তো যেন খোলাম কুচি! দু'হাতে পয়সা ওড়ানো হচ্ছে।' কিন্তু ছেলে যে বুদ্ধি ক'রে বিশেষ দিনটায় দু'চার জনকে খেতে বলে এসেছে. এতে কিন্তু সে খুশীই হয়েছে। প্রকাশ করল না বটে বৌটা—ঘরে এসেছে মাত্র—সায় পাচ্ছে—মনে করবে আর সেও উড়নচণ্ডী হয়ে উঠুক আর কি। ঘরে কি আর লক্ষ্মী থাকবে তাহ'লে?

ওয়াং কিছু না ব'লে ঝুড়ি নিয়ে রান্না ঘরে গেল। ওলান্‌ও গেল পেছন পেছন। জিনিসগুলো বের ক'রে রাখতে রাখতে ওয়াং জিজ্ঞেস করে : 'জন সাতেক নেমন্তন্ন করেছি, রাতে খাবে, রাঁধতে পারবে তো?'

ওয়াঙের দিকে না চেয়েই ওলান্ অকুণ্ঠিত স্বরে জবাব দেয় : 'সেই ছোটবেলা থেকেই তো জমিদার বাড়ী রাঁধার কাজ করেছি। মাংস ছাড়া এক বেলাও খেতো না তারা।'

ওয়াং মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যের আগে আর সে ফেরে না।

নিমন্ত্রিতরা আসে সন্ধ্যার পরেই। কাকা এলো তার অকালপক্ক, শৃগাল-ধূর্ত ছেলেটিকে নিয়ে, বয়স তার মাত্র পনেরো এবং এ-গাঁ-ও-গাঁ থেকে এলো কয়েকজন চাষী আর চিং। মাঝের ঘরেই জায়গা হয়েছে।' সকলে বসলে ওয়াং রান্নাঘরে গিয়ে স্ত্রীকে পরিবেশন করতে বললে। ওলান্ বললে: 'আমি খাবারগুলো তোমার হাতে সাজিয়ে দি, তুমি দিয়ে এসো। ওদের সামনে বেরুতে আমার লজ্জা করে।'

বৌ-এর এ উত্তরে খুব খুশী হয় ওয়াং। মনে মনে গর্ব বোধ করে। এ নারী তারই, একান্তই তার—একমাত্র তারই কাছে এ নারী নির্ভয়, অন্য পুরুষকে তার ভয়।

ওয়াংই পরিবেশন করে। শতমুখে রান্নার প্রশংসা করে সকলেই। ওয়াং বাইরে বিনয় প্রকাশ ক'রে রীতি অনুযায়ী ক্ষমা ভিক্ষা চায় আয়োজনের দৈন্য আর রান্নার অপটুতার জন্য, মনে মনে সে কিন্তু গর্বস্ফীত। একটু সির্কা, কিছু চিনি, আর সামান্য একটু সয়াবীনের চাটনি দিয়ে কি স্বাদই না ফুটিয়েছে ওলান্ ঐ মাংসটুকুর। অমন রান্না কখনও খায়নি ওয়াং।

বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে খেল নিমন্ত্রিতরা। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব করলো। সবাই চলে গেলে ওয়াং রান্নাঘরে এসে দেখল, বলদটার পাশে খড়ের ওপর ওলান্ ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে চুলে খড়কুটো লেগেছে। ওয়াং ডাকতেই ঘুমের ঘোরে চমকে উঠে দু হাত দিয়ে আপনাকে আড়াল করতে চেষ্টা করলো,—যেন প্রহার থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। তারপর চোখ খুললো—সেই রহস্যময় নির্বাক দৃষ্টি। ওয়াঙের মনে হয়, ওলান্ যেন শিশু। হাত ধরে ওকে নিয়ে যায় সেই ঘরে যে-ঘরে আজ ও স্নান করেছে সেই ঊষাভোরে ওলানের জন্য।

টেবিলের ওপর একটা লাল মোমবাতি জ্বেলে রাখল ওয়াং। সেই ক্ষীণ, প্রায়-অস্পষ্ট আলোকের সামনে দাঁড়িয়ে পুরুষ ওয়াং আর ওই পরিচয়হীনা রমণী। হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠে ওয়াং। ওর সমস্ত মন ভরে বার বার গুঞ্জন হতে থাকে—এ রমণী ওরই, একান্ত করেই ওর।

তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন ক'রে বিছানায় চলে যায় ওয়াং। ওলান্ও নীরবে মশারির অন্য ধারে গিয়ে শোবার জন্য প্রস্তুত হয়।

'বাতিটা নিভিয়ে দিও শোবার আগে।' ওয়াঙের কণ্ঠে আদেশের সুর।

মোটা লেপখানা নেয় গলা পর্যন্ত ওয়াং, ঘুমোবার ভান করে। কিন্তু

আজও ঘুম আসছে না চোখে। ওর সমস্ত দেহ কাঁপছে এক চাপা উন্মাদনায়, কাঁপছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। নিশীথিনীর আঁধার কক্ষের চারদিকে। নিঃশব্দে ওলান্ বিছানায় এসে বসে। সর্বদেহে একটা পুলকের আবেগে ওয়াং কেঁপে ওঠে। অন্ধকারের গায়ে একটা আচম্‌কা হাসি আছড়ে দিয়ে উন্মত্তের মতো ওয়াং বুকে টেনে নেয় ওলান্‌কে।

রীতিমত বিলাস এখন ওয়াঙের। পরদিন ওয়াং আর বিছানা ছেড়ে ওঠে না। শুয়ে শুয়ে ঘামতে থাকে ঐ নারীকে, প্রাণ ভরে দেখে।

ঘুম থেকে ওলান্ ওঠে—ধীরে ধীরে দেহটাকে এদিক-ওদিক মোচড় দিয়ে, আলা বসন অঙ্গে নেয় জড়িয়ে। কাপড়ের জুতো জোড়া বড় বড় পা দু'খানায় গলিয়ে নেয়। বেড়ার ফাঁক ধরে আলোর ঋজু রেখা ওলানের গায়ে এসে পড়েছে। উষা-ভোরের সেই ম্লান আলোয় ওয়াং দেখলো রসিয়ে রসিয়ে ওর মুখখানা। কোনো পরিবর্তন নেই, নেই কোন ব্যঞ্জনা ঐ মুখে। বিচিত্র! বিচিত্র ওই রমণী। একটি মাত্র রাত্রের ব্যবধান—ওলট্ পালট্ ক'রে দিয়ে গেছে ওয়াঙকে, পুরুষ ওয়াং। কিন্তু এই নারী, এই রমণী—ওর শয্যা ছেড়ে অবলীলায় গেল উঠে—যেন এমনিই রোজ সে এই শয্যা থেকেই যায় উঠে এমনি ভাবে। বৃদ্ধের কাশির আওয়াজ শোনা যায়। ওয়াং ওলান্‌কে বলে:

'বাবাকে এক গ্লাস জল গরম ক'রে দাও আগে। বাবার বুকে চাপা কাশি।'

'চা দেব?' ওলান্ জিজ্ঞেস করে—সেই অচঞ্চল স্বর, যেমন ছিল কাল।

সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু ওয়াং বিব্রত হ'য়ে ওঠে। বলতে চায়: 'দেবে না তো কি? চাষা-ভূষো হ'লেও কাঙাল নই আমরা।' সে দেখাতে চায়, এ বাড়িতে চা পর্ব একটা কিছু না। অবশ্যি জমিদার বাড়ির চাকররা চা খায়, গোলাম বাঁদীরাও শুধু জল খায় না। কিন্তু প্রথম দিনই বৌয়ের বড়মানষী-চাল দেখলে বাবা চটে আগুন হবে। তা ছাড়া বড়মানষী করার মতো অবস্থাও তো তাদের নয়। কাজেই ওয়াং বলে:

'না-না, কক্‌খনও চা দিও না। ওতে বাবার কাশি বেড়ে যায়।'

শুয়েই রইল ওয়াং—উষ্ণতার পরম তৃপ্তিতে। ওলান্ যায় হেঁসেলে, উনুন

জ্বালে, জল গরম করে। ওয়াং আর-একবার ঘুমোতে চেষ্টা করে—আজতো সে তা পারে। কিন্তু নির্বোধ শরীর—আঁধার কাটতে না কাটতেই বিছানা ছেড়ে ওঠার অভ্যাস, সুযোগ থাকলেও ঠিক আরাম পায় না। তবুও শুয়ে থাকে কিন্তু ঘুম আসে না। অন্তর দিয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে, কর্মহীনতার বিলাস উপভোগ করতে চেষ্টা করে ওয়াং।

এই যে নারী তার জীবনে এলো, তার কথা ভাবতে এখনও কেমন যেন একটা লজ্জা ওয়াঙের।

খানিকক্ষণ ভাবলো জমি-জমার কথা, ক্ষেতের শস্যের কথা। গম অঙ্কুরিত হ'য়েছে মাত্র; বৃষ্টি পেলে ফসল খুব ভালো হবে এবারে; চিঙের কাছ থেকে কিছু সাদা শালগমের বীজ কিনতে হবে; যদি অবশ্য দামে ঠিক হয়। কিন্তু প্রাত্যহিক কর্মধারার এই সব চিন্তায় জড়িয়ে থাকে ওয়াঙের নতুন জীবনের নতুন অনুভূতির গান। রাতের কথা মনে হতেই হঠাৎ মনে হয়, ওলানের পছন্দ হয়েছে তো ওয়াঙকে! এ এক নতুন বিস্ময়। ওয়াং এতক্ষণ শুধু নিজেকেই সন্ধান করেছে—কেবল ভেবেছে তার শয্যায়, তার পাশে, এই গৃহে এই নবাগতা নারীটি ঠিক ঠিক মানিয়ে যাবে কিনা। হ'লোই বা মুখখানা সাদাসিধে, সাধারণ, হাত দু'খানা পুরুষালী, কিন্তু তার দেহখানিতে তো কোন পুরুষের ছোঁয়া লাগেনি। মনে হ'তেই ওয়াং হেসে ওঠে। সংক্ষিপ্ত হাসি সেই প্রথম বারের হাসির মতো। হুঁসেলের বাঁদীর ঐ নির্বিকার মুখখানার বাইরে তরুণ জমিদারদের চোখ আর কিছুই দেখতে পায়নি তা'হলে। দেখেছে ওয়াং: স্থূল, মোটা অস্থির দৃঢ় গঠনের কাঠামোতে তৈরি বলিষ্ঠ দেহ সুডৌল, কোমল সৌন্দর্যে ভরা। হঠাৎ ওয়াং আপনার মনেই দাবী ক'রে বসে—এই নারী ওকে স্বামী ব'লে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে, ভালোবাসবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনে কেমন লজ্জা পায় আবার।

দরজা খুলে যায়, প্রস্তর মূর্তির মতো নির্বিকার ভঙ্গিতে ওলান্ দুই হাতের মাঝখানে একটি বাষ্পায়িত বাটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়াং বিছানায় উঠে বসে, হাত বাড়িয়ে বাটিটা নেয়। জলে চায়ের পাতা ভাসছে। ওয়াং ওলান্‌এর মুখের দিকে তাকায়। ওলান্ সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে; বলে:

'বাবাকে দিইনি চা,—তুমি বারণ করেছিলে—কিন্তু তোমার জন্যে…'

ওয়াং বোঝে ওলান্ ভয় পেয়েছে। মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে। ওলান্‌কে কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে: 'তা বেশ, বেশ,

আমি ভালোবাসি চা।' বলেই চায়ের বাটিটা টেনে নিয়ে সশব্দে চুমুক দেয়। নতুন রোমাঞ্চ ওয়াঙের। ভাবতেও ও যেন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে—'এই নারীর ভালোবাসা ও পেয়েছে।'

ওয়াঙের কেবলি মনে হয়, এই নারীকে দেখে দেখেই এই ক'টা মাস কেটে গেল, কোন কাজই করেনি। কিন্তু সত্যিই কাজ করেছে অভ্যাস মতো। খুরপী কোদাল নিয়ে মাঠে প্রতিদিন ভুট্টা গাছের গোড়াগুলোকে নিড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমের ক্ষেতে চাষ দিয়ে পেঁয়াজ আর রসুন লাগিয়েছে। কিন্তু আজ কাজে সত্যি এসেছে আয়েস। সূর্য মাঝ-আকাশে এলেই সে এখন বাড়ী চলে যেতে পারে; খাবার থাকে তৈরি, পরিষ্কার টেবিলে সাজানো; বাটি-কাঠি, সব কি সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে। এতদিন খেটে বাড়ি ঢুকেই হেঁসেলে ঢুকতে হ'য়েছে। অসময়ে ক্ষিদে পেলে বাবা নিজেই একটু ভুট্টার মণ্ড, নয়তো একখানা মোটা রুটী হাতে বানিয়ে রসুন দিয়ে খেয়ে নিয়েছে।

এখন সবই থাকে তৈরি। মাঠ থেকে এসেই টেবিলের পাশে বেঞ্চিতে ব'সে পড়লেই হলো। মাটির মেঝে কি সুন্দর লেপে দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে ওলান্। জ্বালানি-কাঠের ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। সকালে ওয়াং বেরিয়ে গেলে ওলান্ও একটা ঝুড়ি আর একগাছা দড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘুরে ঘুরে শুকনো লতাপাতা, শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনে। তাই দিয়ে দুপুরের রান্না হয়, কাঠের খরচ বেঁচে যায়। ওয়াং খুব খুশী।

বিকেলের দিকে শহরের দিকের বড় রাস্তা থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে বাড়িতে ঢোকার মুখেই জমানো সারগাদায় ফেলে নিঃশব্দে আপনা থেকেই এসব করে ওলান্, কারো নির্দেশের অপেক্ষা সে করে না। সন্ধ্যায়ও ওর বিশ্রাম নেই। বলদটাকে পেটভরে ঘাসজল দেয়।

তারপর রাজ্যের যত ছেঁড়া কাপড় নিয়ে বসে। বাঁশের তকলীতে নিজে সুতো কেটে সেলাই করে সেসব; গরম কাপড়গুলোতে তালি লাগায়। কতকালের ময়লা ছেঁড়া-বিছানা। লেপ-তোষকের তুলো শক্ত হ'য়ে চাপ বেঁধে, ময়লায় মলিন হ'য়ে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে ছারপোকার বাসা। ওলান্ বিছানা সব রোদে দিয়ে, ছারপোকা মেরে ঝেড়েঝুড়ে পরিপাটি ক'রে তোলে। এম্‌নিতর একটার পর একটা কাজ ওলান্ শেষ করে তোলে; তিন-তিনখানা ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সংসারের শ্রী ফিরিয়ে আনে। বৃদ্ধের কাশিও

সেরে গেছে। দক্ষিণের প্রাচীরে হেলান দিয়ে এখন সে পরিতৃপ্ত আরামে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে রোদ পোহায়।

কিন্তু ওলান্ বড় একটা কথা বলে না; অতি প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত দু' একটা কথা ছাড়া কথাই বলে না। সেই নীরব জীবনসঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওয়াং দেখে চওড়া পা দু'খানির উপর স্থির মন্থর ছন্দে এ-ঘর ও-ঘর করছে সেই বিকারহীন চতুষ্কোণ মুখখানি; সেই অনুচ্চার ভীরু চাহনির পথে ওয়াং ওর হৃদয়ের কোনো সন্ধানই পায় না। রাত্রের অন্ধকারে তার কোমল দেহের উষ্ণতার পরিচয় অবারিত হ'য়ে যায় ওয়াঙের কাছে। দিনের আলোয় নিতান্ত সাধারণ ওলান্ নীল পরিচ্ছদের আবরণ তুলে দেয় সে-পরিচয়ের ওপর। বাইরে থাকে খালি একটি নিতান্ত অনুগতা, সেবারতা, বাক্যহীনা পরিচারিকা, তার বেশী কিছু নয়। 'কথা বলো না কেন তুমি?'—ওয়াঙের জানতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু কোনোও যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না তার এ প্রশ্নের। ওলান্ তার কর্তব্য ক'রে যাবে এই তো যথেষ্ট।

ক্ষেতে কাজ করতে করতেও মাঝে মাঝে ওলানের চিন্তায় হারিয়ে যায় ওয়াং। ঐ শতমহলা ভবনে কি দেখেছে ওলান্ এতদিন? কি ইতিহাস সে ফেলে রেখে এসেছে সেখানে, কোন্ অজানা সে-ইতিহাস! তারপর নিজের মনেই লজ্জিত হ'য়ে ওঠে—কেন এ কৌতূহল! কেন এ আসক্ত!...রমণী বই আর কিছুই তো নয় ওলান্—।

তিনটি মাত্র ঘর। দু'বার রান্না আর খাওয়া,—এতটুকুই তো কাজ। সে আজীবন এক বৃহৎ ধনী পরিবারের সহস্র কাজে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত খেটে মরেছে, ঐ অতটুকু কাজ তাকে কতক্ষণ আর জড়িয়ে রাখবে। অনবরত কদিন ধরে গমের ক্ষেতে খেটে খেটে সেদিন ওয়াঙের পিঠ যেন ক্লান্তিতে ভেঙে যাচ্ছিল। নীচু হ'য়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়লো পাশে একটা ছায়া—ওলান্ এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে খুরপী।

সংক্ষেপে শুধু বললে: 'আমার সংসারের কাজ সব শেষ,—আর যা কাজ, সে-ই রাতে।' তারপর ওয়াঙের বাঁ দিক্‌কার চষা জমিটার ঢেলা ভাঙার কাজে লেগে যায়।

গ্রীষ্মের সবে শুরু। তীক্ষ্ণ সূর্য-কিরণ দু'জনের পিঠে কেটে বসছিল। ওলানের সারা মুখে স্বেদধারা। ওয়াং জামা খুলে ফেলেছে। ওলানের স্বেদ-সিক্ত জামা গায়ে সেঁটে একেবারে চামড়ার ওপর ভিজে বসেছে। নীরব কর্মের মিলিত ছন্দে,

পরিপূর্ণ সঙ্গতিতে ওয়াং ওলান্ যেন মিশে মিশে এক হয়ে যায়। ওয়াঙের শ্রান্তির খেদ যেন সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে। ওদের সব অনুভূতি আজ যেন এক হয়ে মিশে যায়। ভাষা নেই—বেগ নেই। ওদের দু'জনের এই মাটি ওরা একসঙ্গে কোপায়, চষে, বড় বড় মাটির চাপ বার বার উল্টিয়ে মেলে দেয় সূর্যের দিকে···সেই মাটি,—যে-মাটি গড়েছে তাদের ঘর, পুষ্টি দিয়েছে দেহে···রূপ দিয়েছে তাদের দেবতাকে।···ঐশ্বর্যময়ী কালো মাটি ছড়িয়ে কোদালের আঘাতে ভাঙছে, যাচ্ছে গুঁড়িয়ে, কণাগুলো বি চ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে। কোদালের মুখে কখনও বা একটা ইট ওঠে, একটা কাঠের খণ্ড বা এমনি ধারা কিছু—কোনও মূল্যই যার নেই। কবে কোন্ অতীত যুগে হয়তো কত নরনারী এই মাটির নীচে আছে কবরে ঘুমিয়ে, হয়তো এখানেই ছিল কারো গৃহসংসার, সব ভেঙে শেষ হয়ে আবার মাটিরই মাঝে মিশে এক হয়ে গেছে। ওরাও সব এমনি করেই মাটিতে ফিরে যাবে, মিশে যাবে এই মাটিতেই এক এক ক'বে, সকলের অস্তিত্বই মিশে যাবে এই মাটির বুকে। ওয়াং-ওলান্ কাজ ক'রে চলেছে—দু'জনে একসঙ্গে—শুদ্ধবাক, কিন্তু কর্মচ্ছন্দে মাটির বুকে ফসল সৃষ্টির কাজ করে ওরা এ ভাবেই।

সূর্য গেল অস্তাচলে। পিঠ সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে ওয়াং তাকায় ধীরে ধীরে পাশের রমণীর দিকে। স্বেদে আর মাটির রেণুতে মিশে মুখখানা বিচিত্র হয়ে উঠেছে। মাটির রঙে রাঙিয়ে গেছে ওলানের দেহ। স্বেদ-সিক্ত নীল জামা আঁট হ'য়ে লেপ্টে আছে ওলানের দেহে। হাতের কাজটুকু শেষ ক'রে শরীরটাকে সোজা ঋজু ক'রে নিয়ে ওলান্ তার স্বাভাবিক নির্বিকার স্বরে, একেবারে সোজাসুজি ব'লে গেল : 'আমার পেটে বাচ্চা—'

ওয়াং নির্বাক, নিস্পন্দ। কি বলবে সে! ওলান্ নীচু হ'য়ে মাটি থেকে একটা ছোট্ট ঢিল কুড়িয়ে ফেলে দিলে। অতবড় একটা কথা ওলান্ বলে গেল যেন : 'এই চা এনেছি তোমার জন্তে', বা, 'চলো, এবার খাবে চলো—' এমনি নিত্য দিনের ভঙ্গীতে বলে গেল। কিন্তু ওয়াঙের কাছে—ওয়াং বলতে পারে না—কত বড় কথা! ওয়াঙের বুক ফুলে উঠে যেন সীমার বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যেতে চায়। ধরণীতে ফল-সৃষ্টির পালা এবার ওদেরও।

তাড়াতাড়ি ওলানের হাত থেকে কোদালখানা তুলে নিয়ে ওয়াং বলে : 'সন্ধ্যে হলো চলো বাড়ি যাই। আজ কাজ থাক। বাবাকে খবরটা দিইগে।' ওর স্বর স্বন।

বাড়িতেই ফেরে ওরা—ওলান্ পেছনে, মেয়েদের রীতি তাই। বৃদ্ধ দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে রাতের আহারের প্রতীক্ষায়। বৌ এসেছে অবধি কিছুতেই আর সে হেঁসেলে যায় না। চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বৃদ্ধ: 'রোজ খাবারের জন্য এভাবে বসে থাকতে হবে নাকি!' বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বেশ উঁচুতে।

ওয়াং ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে: 'তোমার বৌমা'র বাচ্চা হবে যে—'

বেশ সহজ ভাবেই কথাটা ওয়াং বলতে চেয়েছিল,—এই যেমন, 'পশ্চিমে মাঠে আজ বীজ ছড়িয়ে দিলাম বাবা'-কিন্তু পারলো না। খুব আস্তেই বলেছে কিন্তু ওর মনে হলো যেন সারা পৃথিবীকে শুনিয়ে বলেছে।

বৃদ্ধ চোখ রগড়ে কথাটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে হা হা ক'রে উচ্চ হাসির রো তুলে ওলান্কে হেঁকে বলে: 'ওঃ, ফসল হয়েছে দেখছি।'

ওলানের মুখ দেখতে পায় না বৃদ্ধ। ওলান্ বলে: 'আমি খাবার তৈরি ক'রে আনছি—'

ছোট ছেলের মতো বৃদ্ধ ওলানের পেছনে পেছনে রান্না ঘরে যায় 'তাইতো, খাবার-খাবার—' যেন নাতির স্বপ্নে খাবারের কথা ভুলেই গিয়েছিল এখন কথাটা আবার মনে হতেই, সেই শিশু কোথায় গেল হারিয়ে।

স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ওয়াং একা টেবিলের পাশে বেঞ্চিতে বসে মাথাটা রয়েছে হাতের ওপর। ওরই দেহ, ওরই অস্তিত্ব মন্থন ক'রে উজ্জীবি হ'য়ে উঠেছে নব প্রাণের অঙ্কুর—।

তিন

প্রসবের দিন এগিয়ে এল। ওয়াং বললে ওলান্কে: 'এ সময়ে এ থাকতে নেই,—মেয়েদের কাউকে এনে রাখতে হয়।' ওলান্ মাথা নাড়ে

রাতের খাওয়ার পর ওলান্ বাসন ধুচ্ছিল। বৃদ্ধ শুয়ে পড়েছে। নির্জন পরিবেশে ওরাই শুধু দু'জনে। প্রদীপের কম্পিত শিখার ম্লান আলো পড়েছে ওদের মুখে।

উদ্বিগ্ন ওয়াং জিজ্ঞেস করে: 'কেউ না?' আর কোন উত্তর সে খুঁজে না। ওলানের কাছ থেকেও আর কোনো উত্তরের আশা নেই, কে ওলানের কথা বলার অর্থ—হয়তো বা মাথাটাকে ডাইনে বা

একটুখানি হেলিয়ে দেওয়া, বা তার বিস্তৃত মুখ থেকে অনিচ্ছায় খ'সে-পড়া দু'একটা আকস্মিক শব্দ। এসবে ওয়াং অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবুও আবার বলে: 'বাড়িতে আমরা বাপ-বেটায় দু'টো মরদ! এ সময় মা তো গাঁয়ের কাউকে আনিয়ে নিতেন। আমি আবার এসবের জানি না কিছুই। বাবুদের বাড়িতে তো বহুদিন ছিলে, সেখান থেকে বলে কাউকে আনা যায় না?

ওলান্ এ বাড়ীতে আসার পর আজই প্রথম জমিদারবাড়ীর নাম করলে। মুহূর্তে ওলানের ক্ষুদ্র চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল, রাগে মুখখানা থম্থম করছে। ওলানের এ চেহারা আগে ওয়াং দেখেনি কখনও।

ওলান্ চিৎকার ক'রে ওঠে: 'না—না, ও-বাড়ীর কেউ না—।'

ওয়াঙের হাত থেকে হুঁকো প'ড়ে যায়। সে হতবাক হয়ে ওলানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুহূর্তে ওলানের মুখ আবার আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে যায়। খাবার কাঠিগুলো একত্র ক'রে গুছোতে থাকে, যেন কোন কথাই সে বলে নি।

অবাক ওয়াং আবার যুক্তি দেখিয়ে বলে: 'কথাটা ভালো ক'রে বুঝে দেখ। বাড়িতে তো আমরা দুই মরদ, বিয়নোর ব্যাপারে কিছুই জানি না। শ্বশুর তো আর বৌয়ের আঁতুড়ে গিয়ে ঢুকতে পারবে না। আর আমার কথা যদি বলো, আমি তো একেবারেই আনাড়ি। আর যা চোয়াড়ে দু'খানা হাত দেখছো, বাচ্চাটা হয়তো হাতের চাপে চেপ্টেই যাবে। বাবুদের বাড়ির দাসীবাঁদীদের তো হামেসাই বাচ্চা হচ্ছে...'

টেবিলে কাঠিগুলো গুছিয়ে রাখা হ'য়ে গেছে। ওয়াঙের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওলান্ বলে: 'ও বাড়িতে ফিরবো আবার খোকনকে কোলে নিয়ে। তার আগে নয়। লাল জামা, লাল ইজের পরিয়ে নিয়ে যাবো খোকনকে। মাথায় দেবো টুপী, তাতে থাকবে ছুঁচের আঁকা বুদ্ধ-মূর্তি। আর পায়ে পরিয়ে দেব বাঘমুখো জুতো। আর আমিও নতুন জুতো পরবো সেদিন, আর নতুন কালো সাটীনের জামা। যাবো সেই হেঁসেলে যেখানে আমি কাটিয়েছি কত দিন, সকলে দেখবে! তারপর যাবো রাণীমার সামনে, আফিঙের নল হাতে ঝিমোচ্ছেন। দেখাবো আমার খোকনকে, দেখাবো আমাকে।'

ওলানের মুখে এক সাথে এত কথা ওয়াং শোনেনি কখনও। কথাগুলো

বিনা ছেদে, অতি ধীরে একে একে বেরিয়ে আসে। ওয়াং বোঝে ও যখন মাঠে কাজ করেছে, তখন অন্তরালে নিভৃতে বসে স্বপ্নের এই জাল বুনছে। কি বিচিত্র রহস্যময়ী! কে জানতো অনাগত শিশুকে নিয়ে এত স্বপ্ন ও দেখেছে! দিনের পর দিন কাজ ক'রে গেছে, একটি কথা নেই মুখে এরই মধ্যে ওর স্বপ্নের ছেলে ভূমিষ্ট হয়েছে, তাকে নতুন জামা পরিয়ে নিয়ে নতুন জামা পরেছে! নতুন মা!

মুহূর্তের জন্য ওয়াঙের ভাষা যায় হারিয়ে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে তামাক টিপে কল্কেতে ভরতে ভরতে গম্ভীর কণ্ঠে বললে 'কিছু টাকা তো তোমার চাই—'

ওলান্ ভীরু কণ্ঠে বলে: 'গোটা তিনেক যদি দাও—অনেক টাকা—আমি অনেক হিসেব ক'রে দেখছি—ওর কমে কিছু করা যায় না তবে একটা পয়সাও বাজে খরচ করবো না। খুব হিসেব ক'রে কাপড় কিনবো।'

ওয়াং কালই পশ্চিমের মাঠে যে পুকুর আছে তা থেকে বোঝা দেড়েক নলঘাস কেটে এনে বেচেছে। সে-টাকাটা তখনও কোমরে গোঁজাই রয়েছে। ওলান্ যা চেয়েছে তার চাইতে বেশীই আছে। প্রথমে তিনটে টাকাই টেবিলের ওপর রেখে দিলো—তারপর কি ভেবে আর-একটা টাকা বের ক'রে ঐ সঙ্গেই রাখলো। এই টাকাটা ওয়াং বহুদিন ধরে জমিয়ে রেখেছিল, চায়ের দোকানে গিয়ে একদিন জুয়া খেলার ইচ্ছে তার অনেক দিনের। কিন্তু আজও তার খেলা হ'য়ে ওঠেনি। কেবল জুয়ার ছক্‌টার সশব্দ উত্থান-পতন ভয়ে ভয়ে দেখেছে। ওয়াঙের ভয়, খেলতে গিয়ে যদি হেরে যায়! ওয়াং তার অবসর সময়টা কাটাতো শহরে গল্প-বুড়োর গল্প শুনে। থালায় একটি পয়সা ছুঁড়ে দিলেই হলো।

তামাকটা ধরাতে ধরাতে ওয়াং বলে: 'এটাও রেখে দাও—এই ছেলে আমাদের প্রথম ছেলে, রেশমী জামা না হয় ক'রো।

ওলান্ টাকাতে হাত দিতে পারলো না হঠাৎ। নিস্পন্দ হয়ে কেবল তাকিয়ে রইল। তারপর চাপাস্বরে বললে: 'গোটা টাকা হাতে করলাম জীবনে আজ এই প্রথম।' পরক্ষণেই টাকাগুলো হঠাৎ তুলে নিয়ে শোবার ঘরে চ'লে গেল।

তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার চিন্তা ঘন হয়ে ওঠে ওয়াঙের

মনে। মাটির দৌলতে আজ সে সব পেয়েছে—যে-মাটিতে নিজে হাতে সে হল্ চালিয়েছে--নিজের সবকিছু গলিয়ে মিশিয়ে রস সিঞ্চন ক'রেছে যে-মাটিতে। তার সমস্ত প্রাণ-শক্তির কেন্দ্রও তো ঐ মাটি। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঢেলে খাদ্য ফলিয়েছে সে, আর সেই ফসল এনে দিয়েছে তার হাতে এই ঐশ্বর্য। দু'টো পয়সা কাউকে দিতে গেলে ওয়াঙের বুকটা টন টন ক'রে উঠেছে। কিন্তু কই আজ তো মনে সে-ব্যথা নেই। আজ শহরের কোনো বণিকের অমার্জিত হাতে তার শ্রমার্জিত অর্থের চলে-যাওয়া তাকে দেখতে হলো না; আজ তা নতুন সার্থকতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠছে, রূপান্তরিত হ'য়ে যাচ্ছে তারই ছেলের দেহখানিকে জড়িয়ে। আর এই নারী—যে তারই সঙ্গে কাজ ক'রে এসেছে কোন কথা না ব'লে, মনে হতো যার দৃষ্টিতে কিছুই হয়তো পড়ে না, তারই চোখে কিনা ধরা পড়লো নব পরিচ্ছদে সজ্জিত তাদের সন্তানকে!

ওলান্ একাই রইল। সেই মুহূর্ত এল অবশেষে। সেদিন সূর্য তখনও যায়নি অস্তাচলে, স্বামীর পাশে কাজ ক'রছিল ওলান্। গমের মৌসুমের পর ধানের চারা রোয়া হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রথম বর্ষণের স্পর্শে ধানের শীষ পরিণতি পেয়ে হাসছে প্রথম হেমন্তের কোলে সোনালি আভায়। সমস্ত দিন কাস্তে হাতে ধান কেটেছে দু'জনে। গুরুভার দেহ ওলানের সঞ্চরণশীলতা দিয়েছে কমিয়ে, গতি মন্থর, ওয়াঙের অনেক পেছনে পড়ে গেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা। ওলানের হাত শ্লথ হ'য়ে আসে। অধীর দৃষ্টিতে ওয়াং তার দিকে ফিরে তাকায়। হঠাৎ ওলান্ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হাত থেকে কাস্তে যায় পড়ে। মুখে ফুটেছে এক নব বেদনার স্বেদ-নিষেক।

ওলান্ই কথা বলে: 'সময় হ'য়ে এসেছে আমি বাড়ি যাচ্ছি। না ডাকলে ঘরে ঢুকোনা যেন। খালি একটা কঞ্চি চেঁছে ফালি ক'রে দিয়ে যেও, নাড়ী কাটতে লাগবে।'

ওলান্ মাঠ পেরিয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে গেল। সেই সাধারণ নির্লিপ্ত ভঙ্গী, যেন কিছু হয়নি। যতক্ষণ দেখা যায়, ওয়াং তাকিয়ে থাকে। তারপর পুকুরের পাড়ে গিয়ে একটা সরু সবুজ কঞ্চি নিয়ে কাস্তে দিয়ে চেঁছে ঘনায়মান শরৎ সন্ধ্যায় বাড়ির দিকে চলে।

টেবিলের ওপর রোজকার মতোই সদ্য-প্রস্তুত গরম খাবার। বাবা বসে বসে খাচ্ছে। খাবার তৈরি করার জন্য আসন্ন সৃষ্টির অত বড় বেদনা বুকে রেখে কাজ করছে বেচারী। ওয়াং ভাবে—সাধারণের কত উর্ধ্বে ওলান্।

শোবার ঘরের দরজার গিয়ে ওয়াং ধীরে ধীরে ডাকে : 'এই যে কফি চেঁছে এনেছি।'

ওয়াং ভাবে, এই বুঝি ওলান্ ওকে ভেতরে ডাকবে। না তাকে ডাকলো না, ওলান্ই হামা দিয়ে এসে দরজার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে দিলে। একটি কথা বললো না। কিন্তু ওয়াং শুনতে পেলো, বহুদুর-থেকে আগত শ্রান্ত পশুর মত হাঁপাচ্ছে ওলান্।

বৃদ্ধ খাওয়ার ফাঁকে বলে : 'খেয়ে নে না বাপু, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে—'

তারপর আবার খেতে খেতে বলে : 'ভাবছিস্ কেন? একটু সময় তো লাগবেই। তোর দাদা হবার সময় গোটা রাত্তিরটাই লেগে গেল। গণ্ডা পাঁচেক ছেলে হ'লো, বেঁচে আছিস একা তুই। এই জন্যেই বুঝেছিস্ মেয়েদের বছর বছর ছেলে বিয়োতে হয়।' তারপর হঠাৎ যেন একটা হারিয়ে-যাওয়া চিন্তার খেই খুঁজে পেয়ে বলে : 'ও! কাল এ সময় ঠাকুর্দা হয়ে গেছি।' খাওয়া থামিয়ে প্রবল বেগে হাসতে শুরু করে বুড়ো।

ওয়াং দরজায় দাঁড়িয়ে শোনে—পশুর মত হাঁপাচ্ছে ওলান্। দরজার ফাঁকে গরম রক্তের এক ঝলক্ গন্ধ আসে নাকে—কুৎসিৎ ন্যাকারজনক গন্ধ। ওয়াং ভয় পায়। ভিতরে কষ্ট-শ্বাসের শব্দটা দ্রুততর, উচ্চতর হ'য়ে ওঠে। প্রবল-শক্তিতে চাপা বেদনার গুম্‌রানি একটা—সশব্দ হয়ে ফুটতে দেয়না ওলান্। অসহ্য।

দরজা ভেঙে ঢুকবে ঘরে ওয়াং ?

হঠাৎ একটা স্বল্প অথচ তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ কানে আসে।

ওয়াং সব ভুলে যায়। ওলান্এর কথা মনেও রাখে না। অধীর মিনতিতে জিজ্ঞেস করে : 'কি হ'লো গো? ছেলে না মেয়ে?'

আবার কান্না। এবারে বলিষ্ঠ, তীক্ষ্ণ, বিরতি-হীন কান্না।

আবার চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করে ওয়াং : 'ছেলে হলো না মেয়ে হ'লো, এটুকু অন্ততঃ বলনাগো।'

প্রতিধ্বনির মত নিস্তেজ একটা স্বর ভিতর থেকে উত্তর দেয় : 'ছেলে।'

ওয়াং নিশ্চিত হ'য়ে গিয়ে টেবিলে বসে। যাক্, শিগ্‌গিরই ঝামেলা মিটে গেল। খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। বাবা বেঞ্চির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কতটুকু মাত্র সময়ের মধ্যে এত বড় একটা আবির্ভাব হলো।

ওয়াং বাবার মাথা ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয়: 'ও বাবা, বাবা, তোমার নাতি হয়েছে যে। আজ থেকে তুমি ঠাকুর্দা হ'লে, আর আমি বাবা।'

বিশ্ব-বিজয়ীর স্বর ওয়াঙের কণ্ঠে।

বৃদ্ধ জেগে উঠে হাসতে থাকে: 'এঁ্যা, ঠাকুর্দা, তাইতো—' হাসতে হাসতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

হঠাৎ প্রবল ক্ষুধা বোধ হয় ওয়াঙের। কিন্তু তাড়াতাড়ি খেতে পারে না কিছুতেই। ঘরের মধ্যে ওলান্‌এর নড়াচড়ার শব্দ আর সেই শ্রান্তিবিহীন তীব্র কান্না।

ওয়াং সগর্বে বলে অপেন মনে: 'নাঃ, আর শান্তিতে থাকা যাবেনা দেখছি এ বাড়ীতে।'

খাওয়া শেষ করে ওয়াং আবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওলান্ তাকে ভেতরে ডাকে। ঘরের বায়ুতে রক্তের গন্ধ ভ'রে আছে, কিন্তু রক্তের এতটুকু চিহ্ন নেই কোথাও। কাঠের গামলায় সব আবর্জনা ফেলে, জল ঢেলে ওলান্ দৃষ্টিপথের বাইরে ঠেলে দিয়েছে সব খাটের তলায়। লাল মোমবাতিটা জলছে; ওলান্ পরিচ্ছন্ন শয্যায় শুয়ে; পাশে রীতি অনুসারে ওয়াঙেরই পা'জামায় সুপ্ত শিশু জড়ান।

ওয়াং নির্বাক। ওর বুকের সমস্ত স্পন্দন ভিড় ক'রে যেন বেরিয়ে আসতে চায়। ঝুঁকে পড়ে ছেলেকে দেখে ওয়াং। গোলগাল মুখখানা, কুঞ্চিত, শ্যামসুন্দর। মাথায় একরাশ ভিজে কালো চুলের ভিড়। কান্না থেমে গেছে, ক্ষুদ্র চোখ দু'টি ঝিমিয়ে পড়েছে।

ওয়াং স্ত্রীর দিকে চায়, ওলান সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। কঠিন বেদনার স্বেদধারায় তখনও ওর চুল সিক্ত, অনাবৃত চোখদুটি কোটরাগত। আর কোন পরিবর্তন নেই।

সেই প্রতিদিনের ওলান যেন।

কিন্তু ওয়াঙের চোখে ঐ শায়িত মূর্তিটি অপূর্ব মাধুরীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ওর মনের অণুতে পরমাণুতে সে মাধুরীর স্পর্শ লাগে। ঐ মা আর ছেলে। ওয়াঙের অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে। কি বলবে ও। কিছু ভেবে পায় না। শুধু বলে: 'কাল সহরে গিয়ে পাউণ্ডটাক লাল চিনি এনে গরম জল দিয়ে পানা করে তোমায় খেতে দেব।'

ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে ওর মুখ হতে বের হ'য়ে এল—যেন কথাটা

এইমাত্র ভেবেছে : 'কাল ঝুড়িখানেক ডিম এনে লাল রং ক'রে গ্রামের সবাইকে বিলোতে হবে, তাহলে সবাই জানবে আমার ছেলে হয়েছে।'

চার

পরের দিন রোজকার মতই ওলান্ উঠল, রান্না করল, অন্যান্য গৃহকাজ করল, কেবল মাঠে গেল না। একাই ক্ষেতের কাজ সেরে নীল চাপকানটা গায়ে চড়িয়ে ওয়াং সহরের দিকে চলল। বাজারে গিয়ে পয়সা-পয়সা হিসেবে পঞ্চাশটা ডিম কিনল, সঙ্গে কিনল ডিম রং করার জন্য লাল রঙের কাগজ। কাগজগুলো সেদ্ধ করলেই রং বেরুবে। তারপর মুদীর দোকানে কিনল লাল চিনি। দোকানী কাগজ দিয়ে পোট্‌লাটা বেঁধে সুতোর নীচে একটা লাল কাগজের ফালি গুঁজে দিল হাসতে হাসতে।

'ছেলে হয়েছে বুঝি?'

'হাঁ প্রথম ছেলে, ভাই।' ওয়াং বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়।

'বেশ বেশ, বেঁচে বর্তে থাকুক ভালোয় ভালোয়।' নির্লিপ্ত ভাবে বলে দোকানী। সে ঐ কথা বহুবার বহুজনকে, হয়তো রোজই বলে কাউকে না কাউকে। ওয়াঙের কাছে ওর এ বলার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। মাথা নত করে প্রসন্ন স্মিত হাস্যে ও সৌজন্য স্বীকার করে। দোকান থেকে বের হবার সময় আর-একবার দোকানীকে মাথা নীচু করে সৌজন্য জানিয়ে আসে।

প্রখর রোদ মাথার ওপর নিয়ে, ধুলিসঙ্কুল পথ বেয়ে চলতে চলতে ওয়াঙের মনে হয় ওর মত এত বড় ভাগ্যবান কে আছে?

কিন্তু পরক্ষণেই আশঙ্কায় ওর বুক কেঁপে ওঠে। এত সৌভাগ্য কি সইবে ওর কপালে! আকাশে বাতাসে আত্মগোপন করে আছে পর-সুখাসহিষ্ণু অশরীরী প্রেতের দল। বিশেষ ক'রে দরিদ্রের সুখ যে ওদের সয় না।

মনে হ'তেই ফিরে গিয়ে বাড়ীর প্রত্যেকের নামে নামে একটি করে চারটি ধূপকাঠি কিনল। তারপর, পথে ক্ষেত্র-দেবতার মন্দির, সেখানে গেল। ক'দিন আগেই ওয়াং আর ওলান্ মিলে এইখানেই ধূপ জ্বেলেছিল, আজও সেই ছাই রয়েছে জমে। সেই ছাইয়ের মধ্যে কাঠিগুলো গুঁজে দিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও ঘরে ফিরে চলল।

ওয়াঙকে কিছু বুঝবারও অবকাশ না দিয়ে হঠাৎ একদিন আবার তার

কাজের খেই হাতে তুলে নিয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল ওলান। ফসল কাটা সারা হয়েছে, বাড়ীর অঙ্গনে তখন চলেছে শস্য মাড়াই। দু'জনে মুগুর নিয়ে অবিশ্রাম পিটে চলে। তারপর বড় বড় বাঁশের ঝুড়িতে করে মাড়ান শস্য ওপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে ঢেলে তুষ খড় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে ঘরে তোলে। এর পর আসে শীতের ফসলের জন্য চাষের পালা। ওয়াং লাঙ্গল চালায়, ওলান্ পিছন পিছন কোদাল নিয়ে মাটির ঢেলা ভাঙ্গে।

দিনমান ওলান্এর কাজের চাকা ঘোরে। শিশু ছেলেটা মাটিতে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ঘুমোয়। কেঁদে উঠলে মাটিতে ব'সে পড়ে শিশুকে স্তন দেয় ওলান। অবসান-প্রায় শরতের বিমুখ রোদ গ্রীষ্মের উত্তাপকে জড়িয়ে ধ'রে ঝ'রে পড়ে মা ও ছেলের ওপর। মাটির ধূসরতা লাগে ওদের মনে। মাটির বুকে মাটির প্রতিমার মতই দেখায় ওদের। মাটির ধূলি জড়িয়ে থাকে ওলান্এর চুলে, শিশুর কোমল কালো মাথায়।

মায়ের পীন স্তন-যুগল থেকে শিশুর জন্য তুষার-শুভ্র পীযুষ-ধারা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। এক স্তন শিশুর অধরে ঢালে সুধা-ধারা, আর এক স্তন ঝরণার মত উছলে পড়ে আপন অজস্রতায়। ওলান্ বাধা দেয় না। লোভী শিশুর প্রচুর প্রয়োজন মিটিয়েও ওরই মত বহু শিশুর দাবী মেটান চলে ওর অজস্র বক্ষ-ধারায়, এ খবর ওলান্ রাখে; নিরর্থক প্রাচুর্যকে অবহেলা করতে ওর বাধে না। কিন্তু অফুরন্ত উৎস—আপনাকে ঢেলে ঢেলে কেবলি বেড়ে ওঠে। কাপড় বাঁচাবার জন্য কখনও স্তন একটু তুলে ধরে। মাটিতে ঝ'রে পড়ে দুধ—ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে বাইরে রেখে যায় কালো কোমল নিটোল·একটা চিহ্ন।

শীত আসে। ওয়াংদের ভাবনা নেই। ফসলও হ'য়েছে এবার বিস্তর। ছোট বাড়ীখানায় যেন আর ধরে না। কড়িকাট থেকে ঝোলে অসংখ্য শিকে, তাতে আছে পেঁয়াজ রসুন। পিঁপের আকারের বড় বড় বাঁশের ঝুড়িতে ভরা ধান আর গমে তিনটে ঘরই ঠাসা। এগুলো প্রায় সবই বিক্রীর জন্য। জুয়ার খেয়াল বা রসনা-বিলাসের অপব্যয় ওয়াঙের নাই, ওয়াং হিসেবী। কাজেই শস্য তুলেই তাড়াতাড়ি যথালাভে বিক্রী ক'রে দেবার প্রয়োজন ওর হয় না; ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখে। শীতের মৌসুমে এবং নতুন বছরে সহরে লোকদের কাছ থেকে বেশ চড়া দাম পাওয়া যায়।

অত রয়ে বসে দাম পাবার জন্য হাঁ ক'রে বসে থাকা ওয়াঙের কাকার

পোষায় না। ভাল ক'রে ফসল পাকারও সবুর সয়না, তার আগেই বেচে দেয়। এমনকি হাতে কাঁচা পয়সা পাবার লোভে ফসল মাঠে থাকতেই দাম সেরে ফেলে—যা দাম পাওয়া যায় তাতেই। সুবিধেও আছে—কাটা, মাড়াই, ঝাড়া, তোলার ঝামেলা বাঁচে। বাড়ীর গিন্নী অর্থাৎ ওয়াঙের খুড়ী স্থুল দেহ তদনুপাতিক স্থুল বুদ্ধি ও আলস্যে ত্রিগুণাত্মিক। ভাল আহার ও সজ্জা ছাড়া এই প্রাণীটির জগতে প্রণিধেয় আর কিছু নাই। আজ এ জিনিস চাই, কাল ও খাবার না হ'লে চলবে না—চাই সহুরে জুতো, এমনি নানা ধারার দাবীর নিরন্তর কলহ ও কোলাহল লেগেই আছে। এবং এইটের তার স্বভাবের সব চাইতে বেশী অংশ জুরে আছে। আর দেখোগে ওয়াঙের বাড়ী, ওর বৌএর হাতের তৈরী জুতো, ওদের বাড়ীর সবাই পরে—বাবা, ও নিজে। ওলান্ যদি ওর খুড়ীর মত হ'তো ওয়াং যে কি করত ও ভেবেই পায় না।

কাকার বাড়ীখানা কতকালের জরাজীর্ণ, প্রায় অন্তিম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। চালের পুরোনো ঘুণে-ধরা কাঠ গুলো শূন্য, তাতে না ঝোলে একটা শিকে, না কিছু। ওয়াঙের বাড়ীতে চালের বাতায় ঝোলান কত শিকেয় কত জিনিষ—শুটকী শূয়রের একটা ঠ্যাংও রয়েছে। ওদের প্রতিবেশী চিং তার শূয়রটা রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখে কেটে ফেলেছিল, সেখান থেকেই ঠ্যাংটা কিনে এনেছিল ওয়াং। বেশ মস্ত বড় ঠ্যাংটা—ওলান্ নুন দিয়ে বেশ করে জারিয়ে রেখে দিয়েছে, সময়ে অসময়ে চলবে। নিজেদের দুটো মুরগীও পালক টালক সুদ্ধ পেটের ভেতর নুন মসলা পুরে সুট্‌কী করে ঝুলিয়ে রেখেছে।

শীত এল। উত্তর-পূবের মরুভূমি থেকে এল কন্‌কনে হাওয়া। অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে ওয়াং নিঃশঙ্ক নিরাপদ আরামে বাড়ীর মধ্যে থাকে, বাইরে যেতে হয় না। খোকা বসতে শিখেছে। ওর যেদিন একমাস পুরো হল, সেদিন ওয়াং ওদের বিয়ের দিন যারা এসেছিল তাদের একটা হালুয়ার ভোজ দিয়েছিল। এ নাকি দীর্ঘায়ুর প্রতীক। আর দিয়েছিল দশটা ক'রে রঙীন সেদ্ধ ডিম। অন্য যারা খোকাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিল, তাদের দিয়েছিল দুটো করে।

বেশ নাদুস্ নুদুস্ বড় সড়টি হ'য়েছে খোকা। মুখখানা পূর্ণচন্দ্রের মত ভরা-গোলগাল; চোঁয়াল মায়ের মত উঁচু। সকলের হিংসে হয় দেখে।

শীতের দরুণ, এখন মাঠের বদলে ঘরের মেজেই হয়েছে ওর বিচরণ-ভূমি। দক্ষিণের খোলা জানালার পথে আলো আর বাতাসের দাক্ষিণ্য ঘরখানার মধ্যে; উত্তরের হিমেল হাওয়া বৃথাই প্রাচীরের গায়ে কেঁদে কেঁদে যায়।

দোর গোড়ার খেজুর গাছটার পাতা ফালি ফালি হয়ে ছিঁড়ে গেছে। মাঠের ধারের উইলো আর পিচ্ গাছে নিষ্পত্র শূন্যতা। বাড়ীর পুবদিকের বাঁশের ঝাড়েই কেবল পাতাগুলি বাতাসের বিপুলা শক্তিকে চোখ ঠার দিয়ে গোমড়ান মোচড়ান বাঁশের গায়ে লেগে রইল। শুক্‌ন হাওয়ায় গমের অঙ্কুর জাগলোনা। ওয়ান্ লাঙ আকুল প্রতীক্ষায় বৃষ্টির পথ চেয়ে থাকে। তারপর একদিন শীতান্তের ধূসরতার উপর নামল বৃষ্টি। বাতাসের উন্মত্ত তাণ্ডব কোমল উষ্ণতায় পর্যুষিত হল। ওরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—কেমন ক'রে বৃষ্টিধারা, পরিপূর্ণ ঋজু নিটোল রেখায় রেখায় ধরণীতে নেমে এসে, মাটিতে অণুতে পরমাণুতে আপনাকে মিশিয়ে দেয়। চাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। শুভ-সূচনার উপলব্ধি সকলের মনে। শিশুর চোখে প্রথম দেখার বিস্ময়। সে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টিধারার রূপলি রেখা ধরতে গিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। সাথে মা হাসে, হাসে বাবা। বুড়ো মাটিতে থপ্ করে বসে প'ড়ে বলে, 'হবে না বাবা। আমার নাতি যে লাখে এক। দেখ তো তোর কাকাটার প্যাচা-মুখো ছানাগুলো—হাঁটার আগে চোখের মাথা খেয়ে কিছুর দিকেই কি আর তাকায় ?'

অঙ্কুরিত গমের সবুজ ভেজা মাটি ঠেলে মাথা তোলে। প্রকৃতির এ উৎসবের মৌসুমে চাষীদের ঘরেও উৎসব—দেখা-শোনা, মেলা-মেশা, হাসি গান, খাওয়া-দাওয়ার ধুম প'ড়ে যায়। কাজ নেই কোনো, চাষ নেই, পিঠ ভেঙ্গে বাঁকে ক'রে জল বয়ে মাঠে ঢালা নেই—প্রসন্ন আকাশ ক্ষেতে জল সেচনের ভার নিয়েছে। ভোর হতেই ঘরে ঘরে জটলা, কলহাস্য, চায়ের মজলিস, মাঠের আল ভেঙ্গে ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই পাড়াপড়শীর বাড়ী যাওয়া। মেয়েরা বাড়ীতেই থাকে, জুতো তৈরী করে, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে; আর যারা একটু গোছান গিন্নী, তারা আগে থাকতেই নূতন বছরের উৎসবের আয়োজনে লেগে যায়।

ওয়াং আর তার বৌ অত মেলামেশা ভালবাসে না। গ্রামে বেশী হ'লে আঠার কুড়ি ঘর লোকের বাস। তার মধ্যে ওয়াঙের উপরেই লক্ষীর কৃপা বেশী। তাই ওয়াং ভাবে মেলামেশার ঘনিষ্ঠতার পথ বেয়ে ঋণ হয়ে বেরিয়ে যাবে ওর ঘরের শ্রী। নূতন বছর এল প্রায়। তার মত উৎসবের জন্য সঞ্চিত সম্বল তো নাই প্রায় কারো ঘরেই।

কাজেই মেশামেশি বাঁচিয়ে ঘরে থাকাই ভাল। ওর বৌ সেলাই করে,

ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগায়। ও চাষের যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখে, ভাঙ্গা-চোরা থাকলে মেরামত করে। ও করে চাষের খবরদারী, বৌ করে ঘরের। মাটির হাঁড়িটা ফুটো হ'য়ে গেলেও ওলান্ ফেলে না, মাটি আর বালি মিশিয়ে ফুটোটা বন্ধ ক'রে ধীরে ধীরে পুড়িয়ে নেয়।

ঘরের অপ্রচুর পরিসরের মধ্যে ওদের সুখ-কোমল অন্তরঙ্গতা দানা বেঁধে ওঠে। কথা বিশেষ হয় না, নিতান্ত দু'একটা খাপছাড়া আকস্মিক কথা ছাড়া। যেমন 'বড় স্কোয়াশটার বীজগুলো ফেলোনিতো?' বা, 'এবারে খড়গুলো বেচে ফেলব, জ্বালাবার জন্য মটর গাছগুলো না হয় থাক।' বা : ওয়াং কখনও বলে, 'বাঃ আটার হালুয়াটা বেশ হয়েছে তো!' ওলান্ও নির্বিকার ভাবে উত্তর দেয় 'এবার গমটা খুব ভালো হয়েছে কিনা তাই আটাগুলোও হয়েছে ভালো।' এমনি ধারা।

খরচ শেষ হ'য়ে উদ্বৃত্ত এবার রইল কিছু ওয়াঙের হাতে। কোমরে রাখতে ভয়, বৌ ছাড়া আর কাউকে জানাতেও ভয়। কোথায় রাখে। ওলান্ বুদ্ধি খাটায়। শোবার ঘরে খাটের পিছনে গর্ত খুঁড়ে টাকাগুলো রেখে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। ওলান্-ওয়াঙের কাছে পরম সম্পদ ঐ টাকা কটি—যেন বহু সাধনায় অর্জিত কোন সুগোপন ঐশ্বর্য।

ওয়াঙের প্রতি স্নায়ুতে এই কথাটাই জেগে থাকে—ওর সঞ্চয় আছে, ব্যয়ের উদ্বৃত্ত আছে। তাই নিঃশঙ্ক স্বাচ্ছন্দ্যে ওর দিন কাটে।

পাঁচ

নূতন বছর এল। চারিদিকে উৎসবের সাড়া। ওয়াঙ লাঙ সহরে গিয়ে কিনে আন্‌ল মেলাই 'মঙ্গল-পত্রী'—অর্থাৎ সোনার জলে কল্যাণ-মন্ত্র লেখা লাল কাগজের লম্বা সব ফালি; লাঙল, জোয়াল, কোদাল ইত্যাদি সবগুলো চাষের যন্ত্রপাতিতে একটা একটা ক'রে লাগিয়ে দিল আঠা দিয়ে, ভাবী বছরের

নব সৌভাগ্যোদয়ের আশায়। সার বইবার বালতী দুটো অবধি বাদ গেল না। দরজার চৌকাঠেও ঝুলিয়ে দিল মঙ্গল-পাত্রীর লম্বা লম্বা ফালি। এগুলোতে আবার চমৎকার সূক্ষ্ম ফুল-লতা-পাতা কাটা। ক্ষেত্র দেবতার পোশাকের জন্যও লাল কাগজ এসেছে। ওয়াঙের বাবা তার কম্পমান শিথিল হাতে নিপুণ ভাবে পোশাক তৈরী করল। ওয়াং গিয়ে পরিয়ে এল, ধূপ জ্বালিয়ে দিল বেদীর ওপর। বাড়ীর জন্যও দুটো লাল মোমবাতি কিনে এনেছিল, মাঝের ঘরে ঠাকুরের ছবির তলায় জ্বলবে বলে।

ওয়াং আবার সহরে গিয়ে খানিকটা শূয়রের চর্বি নিয়ে এল। বাড়ীতে যাঁতা তো রয়েইছে, বলদ দু'টো যু:তে দিলেই হল, দিব্যি চাল গুঁড়ো হয়ে যাবে। চালের গু:ড়া, চর্বি, আর চিনি দিয়ে ঠিক বাবুদের বাড়ীর মত ক'রে চমৎকার চন্দ্রপুলি গড়ল ওলান্। তখনও সেঁকা হয়নি, পিঠেগুলো থরে থরে সাজান র'য়েছে টেবিলের ওপর। কতকগুলোর ওপর লাল বাদামের আর সবুজ রং‌এর শুক্‌ন প্লামের কুচি দিয়ে চমৎকার ফুল-লতা-পাতায় বাহার ক'রে দিয়েছে। দেখে দশহাত ফুলে ও:ঠ ওয়াঙের বুক। গাঁয়ে আর কেউ এসব তৈরী ক'রতে পারে না, এসব শুধু জমিদার বাবুদের বাড়ীতে ভোজ-টোজের বেলা তৈরী হয়। ওয়াং বলে: 'এমন চমৎকার জিনিস খেয়ে ফুরিয়ে ফেলতে মায়া হয়।'

বৃদ্ধ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রং বেরং‌এর পিঠের বাহার দেখে ছোট ছেলের মত খুসী হয়ে ওঠে। আনন্দে ব'লে ওঠে: 'তোর কাকা আর ওর ছানা-পোনাগুলোকে একটিবার ডেকে দেখিয়ে দেনা, চোখটি সার্থক করে যাক্।'

ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে ওয়াং সাবধানী হ'য়ে গেছে। এ অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে, যে যাদের জঠরে ক্ষুধার আগুন তাদের কেবল খাদ্যবস্তুর রচনা-লালিত্য দেখাবার জন্যই ডাকা চলে না। তাই সে তাড়াতাড়ি বাবাকে জানিয়ে দেয়: 'সেই পয়লার আগে ওসব পিঠে-টিঠে দেখাতে নেই।' ওলান্ও তার ময়দা-চর্বি-চর্চিত হাতে ব'লে উঠ্ল: 'এগুলো আমাদের খাবার জন্য নয়, বাবা। গোটাকয়েক সাদা পিঠে খালি রাখব, এই বাইরের লোক যারা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসবে তাদের জন্য। আমরা চাষা-ভূষো গরীব মানুষ। আমাদের কি এসব খাওয়া পোষায়? নতুন বছরে খোকাকে নিয়ে যাব জমিদার বাবুদের বাড়ী গিন্নীমাকে দেখাতে, খালি হাতে যাওয়া তো ভাল দেখায় না—সেই সাথে এই ক'খানা পিঠে নিয়ে যাব।'

সেই মুহূর্তটি থেকে পিঠেগুলোর গৌরব ও মর্যাদা যেন অত্যন্ত বেড়ে গেল ওয়াঙের বুকও স্ফীত হয়ে উঠল—যে-গৃহের দ্বারে দরিদ্রের দীনতা ভীরুতা নিয়ে গিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল কম্পিত পদে, সেখানেই যাবে ওর স্ত্রী রিক্ততার দৈন্য বহন ক'রে নয়, পুত্র বক্ষে নিয়ে, মহার্ঘ্য উপকরণে তৈরী উপহার নিয়ে।

নব-বৎসরের উৎসবের এই মহা-আঙ্গিকটি স্ব-মহিমায় আর সব কিছুকে ম্লান ক'রে দেয়। ওলানের তৈরী কালো কোটটা গায়ে দিতে দিতে ওয়াং ঠিক করে, এই কোটটাই প'রে বৌ-ছেলেকে নিয়ে বাবুদের বাড়ী যাবে।

বছরের শেষের দিন শুভকামনা জানাতে প্রতিবেশীরা আসে। কাকাও আসে। খাওয়া দাওয়া কোলাহল সবকিছুতেই যোগ দিতে হয় ওয়াংকে। কিন্তু তার সারা চেতনা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে এই কোলাহল-মুখর দিনের ভিড় ঠেলে পরের দিনটির জন্য। চন্দ্রপুলিগুলো নিজহাতেই একটু সরিয়ে রাখে ওয়াং, কি জানি কার কখন চোখে পড়ে যায়। সাদা পুলিগুলো খেয়েই অতিথিরা যে পরিমাণ প্রশংসা-মুখর হয়ে উঠেছে, তাতে এক একবার ওর ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে ক'রে : 'ওতেই এত! লাল সবুজের ফুলকাটা পিঠে দেখলে, হুঁ!—"কিন্তু অতিকষ্টে আত্মদমন ক'রে নিতে হয়। আগামী কালের অতবড় অনুষ্ঠানটির গৌরব ও ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না কোনো মতে।

দ্বিতীয় দিন, মেয়েদের মেলামেশার দিন। ভোরে উঠেই ওলান্ ছেলেকে সেই লাল কোট, বাঘমুখো জুতো আর সত্যমুণ্ডিত মাথায় বুদ্ধের মূর্তি সেলাই করা টুপী পরিয়ে সাজিয়ে দিল। বছরের শেষের দিন ওয়াং নিজ হাতে খোকার মাথাটা কামিয়ে দিয়েছিল। ওয়াঙেরও তৈরী হ'য়ে নিতে বেশী দেরী হ'লোনা। ওলান্ তার দীর্ঘায়িত কালো চুলের রাশ আঁচড়ে গিলটি-করা পেতলের কাঁটা গুঁজে খোঁপা বেঁধে নিল। পরল কালো কোট, ওয়াঙের কোট যে কাপড়ে তৈরী হয়েছে সেই কাপড়ের।

ওয়াং খোকাকে কোলে তুলে নেয়, ওলান্ নেয় পিঠের ঝুড়ি। শীতের পত্রহীন ধূসর মাঠের পথে তারা বেরিয়ে পড়ে।

জমিদার বাড়ী পৌঁছুতে বেশী সময় লাগে না। ওলানের ডাকে গেট খুলে দিয়ে দারোয়ান ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে আঁচিলের চুল তিনটে পাকাতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে যেন সম্বিৎ পেয়ে বলে ওঠে : 'আরে ওয়াং ভায়া যে! একা নয়, একেবারে তিন!' তারপর ওদের নূতন কাপড়, সুস্থ সুন্দর ছেলে

এসব দেখে বলল : 'বেঁচে থাকো ভাই, সুখে থাকো। দিন দিন তোমার পয় হোক।'

আর একদিন ওয়াং এসে এখানেই দাঁড়িয়ে ভয়ে কেঁপেছিল, দীনতায় সঙ্কুচিত হ'য়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। আজের ওয়াং যেন সে ওয়াং নয়। আজ সে তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয়, তার মাটির পয়েই সব হয়েছে। দারোয়ান লোকটা যেন ওর সামনে দাঁড়াবারই যোগ্য নয় এমনি একখানা ভাব ওর স্বরে হাবে-ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপেক্ষারও যেন কোন প্রয়োজন নেই, সুদৃঢ় নিঃসংশয়তায় ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে দেয় ওয়াং।

দারোয়ান ওয়াঙের বেশে-বাসে, আকারে প্রকারে সুস্পষ্ট সৌভাগ্যের পরিচয়ে একটু অভিভূত হয়ে পড়ে। একটু বিনীত ভাবেই ওয়াংকে থামিয়ে সে বলে: 'এই গরীবের ঘরেই একটু বস ভাই, আমি তোমার বৌ আর ছেলেকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।'

ওয়াং অভিভূতের মত তাকিয়ে থাকে। ওর বৌ ছেলে চলেছে খোদ জমিদার-গিন্নীর কাছে ভেট নিয়ে। একি একটুখানি কথা? এ গৌরব ওর, সম্পূর্ণ ওর নিজের, এতে আর কারো অংশ নেই। ওলান্, ছেলে কোলে নিয়ে দারোয়ানের সাথে শতমহলা বাড়ীর মহলের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, ওয়াং হৃষ্টমনে ধীরে ধীরে দারোয়ানের ঘরে বসে।

বসন্তের দাগ-চিহ্নিত-মুখ দারোয়ান-গৃহিনীর। সে এসে মাঝের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওয়াংকে টেবিলের বাঁ দিকের সম্মানের আসনে বসায়। ওয়াং অকুণ্ঠ নির্লিপ্ততার ভাব দেখিয়ে এই স্বাগত গ্রহণ করে,—যেন এ ওর ন্যায্য প্রাপ্য, এর মধ্যে বিশেষত্ব কিছু যেন নেই। দারোয়ান গৃহিনী চা এনে দেয়। ওয়াং মাথাটা একটু নেড়ে চা-টুকু হাতে নিয়ে রেখে দেয়, খায় না, যেন ওর যোগ্য হয়নি চা-টুকু।

অল্পক্ষণ পরেই দারোয়ান ওলান্ আর খোকাকে নিয়ে ফিরে এল। ওয়াঙের মনে হ'ল এই কয়টি মুহূর্তের মধ্যে যেন কালের একটা বিপুল ব্যবধান কেটে গেছে। ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওলান্এর মুখ দেখে তার মনখানাকে পড়তে চেষ্টা করে। ঐ উদাসী, ভাবহীন, চ্যাপ্টা মুখখানার সূক্ষ্মতম রেখাও ওয়াঙের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে আজকাল।

ওলানএর মুখে সুগভীর পরিতৃপ্তির আলো। ওয়াং আশ্বস্ত হয়। কিন্তু সব কিছু সবিস্তারে শুনবার জন্ত ব্যাগ্র হ'য়ে ওঠে সে। সপত্নীক দারোয়ানকে

সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানিয়ে তাড়াতাড়ি ওলানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওলান্‌এর কোল থেকে সে ,তাকে নিজের কোলে তুলে নেয়।

পেছন পেছন আসছে ওলান্। ওয়াং ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। ওলানএর অত ধীরে চলায় ওয়াং অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। হঠাৎ ওলান্ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওয়াঙের কাণে কাণে বলে : 'এবার বাবুদের অবস্থা যেন একটু কাহিল কাহিল মনে হ'ল।' ওলান্‌এর স্বরে ভীতি যেন কোনও ক্ষুধার্ত অপদেবতার কথাই বা সে কইছে।

'তার মানে ?'—ওয়াং অসহিষ্ণু হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, শুনবার জন্ম ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, একমুহূর্ত দেরী ওর সইছে না।

কিন্তু ওলানএর কথা কওয়া অতি কষ্টের ব্যাপার। একটি একটি ক'রে শব্দ অনেকক্ষণ ধরে অতি আয়াসে বের হয় ওর মুখ থেকে : 'কর্ত্রীঠাকুরুণের পরণে সেই গত বছরের পুরোনো কোটটাই তো দেখলাম। এমন তো কখনও আগে দেখিনি। ও বাড়ীর দাসী-চাকররাও নতুন বছরে পুরোনো কাপড় পরেনি কখনও।' খানিক থেমে আবার বলে : 'একটাও ঝি-চাকরের গায়ে আমার মত অমন কোট দেখলাম না।' আবার থেমে কয়েক মিনিট পর আবার বলে: 'ঐ একপাল কাচ্চা বাচ্চা দাসীদের—মানে কর্তারই, তাছাড়া আরও আছে— কৈ, একটারও আমাদের খোকার মত অমন সুন্দর চেহারা আর অমন পোশাক দেখলাম না কিন্তু—'

বল্‌তে বল্‌তে ওলান এর মুখ ধীর মন্থর তৃপ্তিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওয়াং খোকাকে আস্তে বুকে চেপে জোরে হেসে ওঠে। বিশ্বজয়ী ওর খোকা। আজ দিগ্বিজয় ক'রে এল।

বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে হঠাৎ ওয়াঙের মন ত্রস্ত হয়ে ওঠে; কি সর্বনাশ। এই নিরাবরণ আকাশের নীচে অমন সুন্দর সুপুষ্ট ছেলে নিয়ে চলেছে। কে জানে কোথা দিয়ে কোন অপদেবতার দৃষ্টি লাগে। তাড়াতাড়ি বোতাম খুলে খোকাকে কোটের নীচে বুকের মধ্যে লুকিয়ে জোরে জোরে বলে : 'এত সাধ্যি সাধনা ক'রে যাওবা হ'ল, হ'ল একটা মেয়ে। যেমন মেয়ে, তার তেমনি ছিরি। মুখময় বসন্তের দাগ, আহা! রূপ নয়তো রূপের বালাই। কপাল, কপাল, পোড়া কপাল! এখন এটাকে যমে নিলেই আপদ যায়।' ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে বুঝতে পেরে ওলান্ ও সায় দেয়। তারপর একটু

নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওয়াং আবার জিজ্ঞাসা করে ওলানকে : 'ওবাড়ীর ব্যাপার কিছু আঁচ পেলে ?'

হ্যাঁ, বাবুর্চিটার সাথে একটুখানির জন্য কথা বলতে পেরেছিলাম। তার কাছ থেকেই জেনেছি কিছু। কর্তার পাঁচ ছেলে। তারা সব বিদেশে। ওদের কেবল টাকা আর মেয়েমানুষ। দুই হাতে টাকা ফোঁকেন বাবুরা। আর মেয়েমানুষ ? একটার ওপর সাধ মিটে গেলেই তাকে এ বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। কর্তাও ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেন—ফী বছর তার মহলে একটা দুটো নতুন মেয়ে মানুষ আমদানী হচ্ছেই। ওদিকে কর্ত্রীঠাকুরুণএরও খরচ কম নয় —তাঁর আফিংএও মুঠো মুঠো টাকা যায়। এমনি করলে সংসারের লক্ষ্মী থাকে আর কদিন ?'

'সত্যি !'—ওয়াং বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যায়।

'এদিকে আবার কর্তার সেজ মেয়ের বিয়ে এসে পড়েছে। বিয়ের যৌতুকই তো একটা আস্ত রাজ্যি। মেয়েও তেমনি বাবা! তিনি সুচাও আর হ্যাংচাওএর তৈরী বুটি দার সাটিন ছাড়া আর কোন কাপড়ের জামা পরবেন না। তার পোশাক করতেই সাংহাই থেকে দলবল নিয়ে দরজী এসেছে, ফ্যাসানের যদি একচুল এদিকে ওদিক হয় ত' রক্ষে আছে !'

'বাবা! এত খরচ! বিয়ে হ'চ্ছে কোথায় ?' এত জলের মত টাকা ওড়ায় ওরা! টাকার ওপর কি এতটুকু দরদ নেই! ভেবে ওয়াং ভয়ে বিস্ময়ে কেমন অভিভূত হ'য়ে যায়।

'সাংহাই-এর কে এক ম্যাজিষ্টর না কি বলে—তারই ছেলে,' একটা সুদীর্ঘ ছেদ টেনে ওলান্ আবার বলে : 'তা, আমারও সত্যি মনে হয়, ওদের অবস্থা পড়ে এসেছে। গিন্নীঠাকুরুণ আমায় নিজ মুখেই বল্লেন, বাড়ীর দক্ষিণ ধারের ধেনো জমিটা বেচতে চান। চমৎকার জমিটা! বিলটা পাশেই, জলটলের সুবিধে খুব আছে।'

'জমি বেচবে ? বলো কি ?' এবারে ওয়াং ব্যাপারটা যেন তলিয়ে বুঝতে পারে। তাহ'লে সত্যিতো ওদের অবস্থা বড় খারাপ হ'য়ে পড়েছে—নইলে, জমি যে দেহের রক্ত মাংস।

ওয়াং ভাবতে লাগল। হঠাৎ ওর মাথায় কি যেন মতলব খেলে গেল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু উচ্চস্বরে বলল : 'দেখ, আমি ঠিক করেছি, জমিটা আমরা কিনব। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা—ওয়াং আনন্দে, ওলান্

বিমূঢ় বিস্ময়ে। 'কিন্তু ঐ জমিটা,—ওটা যে—'অস্পষ্ট ভাবে ওলান্ কি যেন বলতে যায়।

কর্তৃত্বের স্বরে ওয়াং বলে: 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বাবুদের বাড়ীর ঐ জমিটাই গো—ওটাই কিনব আমি।'

বিহ্বল ওলান্ জবাব দেয়: 'বড় দূরে যে জমিটা। ওখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তো সাতপ'র বেলা হয়ে যাবে।'

'তা হোক। কিনবই ওটা আমি।' ওয়াঙের কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে ওঠে একটু।

ওলান্ শান্তভাবে জবাব দেয়: 'তা জমি কিনবে, সেতো ভালো কথা। মাটির তলায় টাকা পুঁতে রাখার চাইতে জমি কেনাই ভাল। তা, তোমার কাকার জমিটা কেনোনা কেন? আমাদের পশ্চিমের মাঠের গা ঘেঁসে তার যে জমিটা রয়েছে, সেটা তো বেচবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন।'

ওয়াং অসহিষ্ণুভাবে চীৎকার করে ওঠে: 'ছোঃ। ও বুড়োর জমি কিনবে কোন শালা। ওতে কি আর মাটি আছে? কেড়ে-খিম্‌ছে এই বিশ্‌টা বছর জমিটা শুষেছে বুড়ো এক ফোঁটা সার দিয়েছে কখনও ওতে? ও জমিতে মাটি নেই, কেবল ছাই ছাই—ও আমি কিনছিনে, ওই জমিদার বাবুদের, ওই হোয়াং-দের জমিই কিনব। আলবৎ কিনব।'

'হোয়াংদের জমি' কথাটা এমন অবলীলায় বলল ওয়াং, ঠিক যেমন ক'রে ও বলতে পারত, প্রতিবেশী চিংএর নাম। ঐ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বাড়ীর নির্বোধ মানুষগুলোর চাইতে আজ যেন ও বহু পর্যায় ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। টাকা হাতে নিয়ে ও সোজা গিয়ে বলবে: 'টাকা নিয়ে এসেছি, বলো তোমাদের জমির দাম।'

সেই মুহূর্তেই ও যেন শুনতে পেল ঐ কথাগুলো ও বলছে খোদ কর্তাকে। আর ম্যানেজারকে বলছে: 'ঠিক্-ঠাক্ দামটা ব'লে টাকাগুলো গুণে গেঁথে তুলুন মশাই। ওসব হাতে হাতেই চুকিয়ে দেব। বাকীর কারবার নেই আমার কাছে।'

ওর স্ত্রী, যে এই গর্বোদ্ধত পরিবারের রন্ধন-শালার পরিচারিকা ছিল একদিন—সে আজ ওরই গৃহলক্ষ্মী। হোয়াং পরিবারের বংশানুক্রমিক শ্রেষ্ঠত্বের মূলে যে মাটি তারই একাংশের অধিকারী হবে ওয়াং।

ওলান্ যেন মুহূর্তে স্বামীর মন বুঝতে পারে। ধীরে বলে: 'তাই হোক,

জমিটা কেনই তাহলে। ধেনো জমিই ভালো, আর বিলটার কাছেই জমি—তেমন জলের কষ্ট হবে না।'

আবার ওলান্‌এর মুখে ফুটে ওঠে সেই মন্থর ম্লান হাসি যে হাসিখানি তার অনায়ত, নিষ্প্রভ চোখদুটির ভাবহীন নির্বিকারত্বে এতটুকু রেখাপাত করেনি কখনও। বহুক্ষণের স্তব্ধতার পর সে বলে :

'গত বছর এমনি দিনে আমি ছিলাম ও বাড়ীর দাসী।'

মহা সম্ভাবনার স্বপ্নে আত্মহারা দম্পতীর মুখে কোনো ভাষা যোগায় না। অন্তরের ভাষায় বাইরের মৌনতা বাংময়ী হয়ে ওঠে

ওরা এগিয়ে চলে নীরবে।

ছয়

নূতন কেনা জমিটা ওয়াঙের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রাচীরের কোকর থেকে টাকা তুলে নিয়ে জমিদার বাড়ী গিয়ে, দামদস্তর করে জমি কেনে ওয়াং, তারপর কেমন যেন একটা বিমর্ষ ভাব তাকে ঘিরে ধরে।

প্রাচীরে ঐ কোকরটা এতদিন ভরা ছিল তাদেরই সঞ্চিত অর্থে, যে অর্থে প্রয়োজনের তাগিদ ছিলনা এতদিন। গর্তটা আজ শূন্য হয়ে গেল। অর্থগুলো আবার ফিরে আসুক, আবার গর্ত ভ'রে উঠুক ওয়াঙের সমস্ত মন কেঁদে ওঠে এই কামনায়। জমিটার পেছনেও' আবার কত পরিশ্রমের দরকার হবে। ঠিকই বলেছিল ওলান্, বড় দূর, সত্যি। তারপর এই জমি কেনার ব্যাপারটা যেমন জমকালো হবে ভেবেছিল, তাই বা কই হ'ল? ও একটু বেশী তাড়াতাড়ি এসে প'ড়েছিল জমিদার বাড়ীর দোরে। অবশ্যি তখন দুপুর গড়িয়ে প'ড়েছিল অপরাহ্নে। কিন্তু কর্তার ঘুম ভাঙেনি তখনও। ওয়াং একটু হেঁকে ব'লল দারোয়ানকে : 'হুজুরকে বল, আমি একটু বিশেষ কাজে এসেছি—টাকা-কড়ির ব্যাপার।' দারোয়ান জবাব দিল : 'ওরে বাবা। বাঘের গোঁফে হাত দেওয়া।

কর্তা তাঁর হালে-আনা মেয়েমানুষকে নিয়ে শুয়ে নাক ডাকছেন। এখন তাকে জাগাব আমি ? নিজের জানটাকে খরচের খাতায় আগে লিখে নিতে হবে তবে। অত বেহিসেবী আমি নই।' তারপর খানিকটা অবজ্ঞা মেশান স্বরে —কতকটা আপন মনেই বলে গেল : 'টাকার লোভে জাগবে ঐ মানুষ। — এই এতটুকু বয়স থেকে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যার হাতে কড়া পড়ে গেল। হুঁ। টাকা এদের কাছে খোলামকুচির সামিল হে।'

শেষটায় ম্যানেজারের সাথেই কথাবার্তা কইতে হয়। লোকটা পাকা ঘুঘু। নাদুস নুদুস তেল চকচকে নধর দেহ। হাতদুটোতে যেন আঠা লাগান। প্রত্যেকটি লেনদেনের কারবারে ওর হাতে কিছু-না-কিছু আটকে থাকবেই। ওয়াঙের তাই মনে হয়—জমির চাইতে টাকারই বাস্তব-মূল্য বেশী। টাকা-গুলো কেমন চোখের সামনে ঝলমল করে। কিন্তু তবু এই জমিটা তো আজ থেকে ওর—সম্পূর্ণ ওরই। এর উপর ওর পুরো স্বত্ব।

একটা ভালো দিন দেখে জমিটা দেখতে বেরিয়ে পড়ে ওয়াং একাই।

কালো মাটির জমি, বিলের ধার ঘেঁষে আপনাকে বিস্তার ক'রে দিয়েছে। ওর এই নূতন অর্জিত সম্পদের কথা এখনও জানে না কেউ। পা পা ক'রে মেপে দেখল কতটা হবে। জমিদারের নাম বুকে নিয়ে চারকোণে চারটি পাথরের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে সীমা-নির্দেশ ক'রে। এগুলো বদলাতে হবে, নিজের নাম লিখে দিতে হবে ওখানে। কিন্তু এখনই না, আরও ক'দিন পরে। বাবুদের জমি কেনার দুঃসাহস হবার মত ওর যে টাকার বাড় হয়েছে, তা এখনও জানান চলে না কাউকে। অবশ্যি টাকা পয়সা আরো বাড়লে তখন ও তোয়াক্কাই রাখবে না কারো। জমিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও ভাবে : 'জমিদারের কাছে এ জমি একমুঠো মাটি মাত্র—কিন্তু আমার কাছে এ যে অমূল্য।'

হঠাৎ ওর নিজের ওপর রাগ হয়। ঐ তো টুকরো মাটি—তার জন্য ওয়াং সব বিকিয়ে দিয়ে এল! সারা বছরের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমানো অতগুলো টাকা ও একটি একটি ক'রে গুণে দিয়ে এল। গুণে দেবার সময় যেন একটু গর্বও মনে এসেছিল। আর ম্যানেজার ব্যাটা বললে কিনা কর্ত্রীর কদিনের আফিংএর খরচা মাত্র হবে ওতে!

ওর আর ওই বাবুদের বাড়ীর মাঝখানের ব্যবধানটা আজ যেন বিস্তৃতি পেয়ে দুস্তর হয়ে ওঠে—সামনের ঐ জল-ভরা খাতটার মত ; যুগযুগান্তের ধূসরতা গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে প্রাচীর, তারই মত দুর্লঙ্ঘ্য। ওর

মনে এসে জমতে থাকে একটা ক্রোধ। পণ ক'রে বসে হঠাৎ, 'বার বার মাটির তলার শূন্য গর্তটা ভরে তুলব টাকায়,—জমি কিনব—আরও জমি কিনব। আমার জমির সীমা ছাড়িয়ে যাবে ঐ দূরে, ঐ সুদূরে।'

এই ক্ষুদ্রায়তন জমিটুকুতেই ওয়াঙের জীবনের অনাগত কালের ইতিহাসের সূচনা হ'ল।

বসন্ত এল। বাতাস হল উদ্বেল। আকাশে উড়ল জল-ভরা মেঘের ছিন্ন টুকরো। শীতের কর্মহীন অলসতা, বসন্তের ফসল-ফলানোর বেহিসেবী ব্যস্ততার তলায় হারিয়ে গেল। বুড়ো বসে ছেলে আগলায়, আর ওয়াং ওলান্ উদয়াস্ত মাঠে কাজ করে।

এর মধ্যে আবার ভাবী জীবনের সূচনা ওলানের শরীরে ফুটে ওঠে। ওয়াং চেয়ে চেয়ে দেখে, কেমন বিরক্তি এসে যায় তার। ফসল কাটার সময়েই ফী বছর মানুষটা অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। ক্লান্তিতে বিরক্তিতে ধৈর্য হারিয়ে ওয়াং চীৎকার ক'রে ওঠে: 'বিয়োবার আর সময় পেলে না। যত—'

ওলান্ একটুও ব্যস্ত হয় না, ধীরে জবাব দেয়: 'এবারে আর কি, প্রথমবারেই যা একটু কষ্ট।'

আর কোনও কথাই হ'লনা এ ছাড়া।

ধীরে ধীরে ওলান্এর জঠর স্ফীত হ'তে থাকে, তারপর এক শরতের ভোরে সে কাঁধ থেকে কোদাল নামিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। ওয়াং সেদিন ঘরে ফেরে না, দুপুর বেলা খেতেও না। আকাশে সেদিন মেঘের ঘনঘটা। ধান একেবারে পেকে গেছে সব, আজ না কাটলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সূর্য ডুববার আগেই ওলান্ ফিরে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়ায়; দেহের স্ফীতি একেবারে মিলিয়ে গেছে। মুখে নিবিড় নীরবতা। ওয়াং বলতে চাইল: 'আজ অনেক কষ্ট গেছে তোমার, এখন একটু শোও গিয়ে।' কিন্তু আপনার শ্রমখিন্ন দেহের যাতনা ওকে কঠোর ক'রে তোলে। মনে মনে হিসেব করে সে, কষ্ট হয়েছে দুজনের সমান। প্রসবে ওলান্এর যা হয়েছে, ক্ষেতের কাজে ওর নিজের কিছু কম হয়নি।...আর কিছু না ব'লে ধান কাটার ফাঁকে একবার শুধু সে জিজ্ঞাসা করে: 'ছেলে হ'য়েছে না মেয়ে?'

'ছেলে।'

আর কোনও কথা নেই। প্রসন্ন ওয়াঙের অনবরত ঝুঁকে থাকার ক্লান্তি

মোলায়েম হ'য়ে আসে। সন্ধ্যা হয়। একরাশ রক্তিম মেঘের কোণে চাঁদ ওঠে। কাজ সমাপন ক'রে ওরা ঘরের পথে ফেরে।

স্নান খাওয়ার পর একবাটি চা খেয়ে ওয়াং ছেলে দেখতে এল। ওলান্ রান্না সেরে শুয়েছিল, পাশে শুয়ে সদ্যোজাত শিশু, বেশ হৃষ্টপুষ্ট শান্ত। কিন্তু বড় খোকার মত অতটা বড়-সড় হয়নি যেন। ছেলে···ছেলে···একটি···আর একটি—প্রতিবছর একটি। প্রতিবারই তা' বলে লাল ডিম বিলোন যায়না কিছু। প্রথমবার দিয়েছে সেই যথেষ্ট। ওর ঘরে লক্ষ্মী প্রসন্ন দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ওলান্এর পয় আছে—দুই হাতে শ্রী আর সম্পদ্ নিয়ে এল এই রূপহীনা নারী। বাবাকে ডেকে বলে ওয়াং: 'বাবা নাতির হিসেব যে তোমার বেড়ে গেল। এবার বড় নাতিকে তোমার কাছে শোয়াতে হচ্ছে।'

বৃদ্ধ তো এই একান্ত ক'রে চেয়ে এসেছে এতদিন। ওই তো ওর সুখ। কত সুদীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা ওর—নাতি হবে, তাকে পাশে নিয়ে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকবে। কচি নরম মাংসের উত্তাপে উষ্ণ হয়ে উঠবে ওর স্থবির হিমদেহ। কিন্তু দুষ্টু ছেলেটা মাকে ছাড়তে রাজী হয়নি কিছুতে এতদিন। আজ সে নরম ক্ষুদ্র পা দু'খানিতে ভর ক'রে উঁচু হয়ে দেখল মার পাশে তার রাজ্যে নূতন রাজাকে। গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখে সে বুঝে নিল সে স্থানচ্যুত। বিনা প্রতিবাদে আজ সে গিয়ে দাদুর পাশে শুয়ে পড়ল।

এবছরও ফসল হ'য়েছে খুব। টাকাও হ'ল, প্রাচীরের গায়ের সেই গর্তটির শূন্যতা আবার ভরে উঠল। জমিদার বাড়ীর জমিটায় দ্বিগুন ধান হয়েছে। উর্বর রসাল মাটি এ জমিটার। আগাছার মত অবাঞ্ছিত প্রাচুর্যে হ'য়েছে ধান।

এবারে সবাই জানল জমিটা ওয়াঙের। তাকে গ্রামের মোড়ল করবার কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল।

সাত

কাকা সম্বন্ধে ওয়াং যে ভয় করেছিল প্রথম থেকে তাই সত্য হ'ল। এ লোকটার ধারণা তার নিজের ঘরে অভাব হ'লে আত্মীয়তার ন্যায়সঙ্গত দাবী নিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘাড়ে চাপা চলে। ওয়াঙের সংসারে যতদিন স্বচ্ছলতা ছিলনা ততদিন এ লোকটাও যাই হোক ক'রে ক্ষেত থেকে খুঁটে পিটে সাত ছেলে মেয়ে, তাদের মা আর নিজের এই গুষ্টির পিণ্ডির জোগাড় ক'রে নিয়েছে। পেট ভরলেই অবশ্য পরম নিশ্চিন্ততায় হাত গুটিয়ে বসেছে। ওয়াঙের খুড়ী নড়ে-চড়ে বসে না, বাড়ীখানায় ঝাঁট পড়েনা সাতজন্মে। ছেলেমেয়েগুলোও তেমনি, খেয়ে মুখ ধোবার কষ্টটুকুও ওরা করে না। মেয়েরা বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে কিন্তু ধিঙ্গীর মত মাথাটায়·কাকের বাসা ক'রে তারা এখনও রাস্তায় ছুটোছুটি ক'রে, ড্যাং ড্যাং ক'রে নির্লজ্জের মত পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করে। ওয়াং একদিন তার কাকার বড় মেয়েটাকে ঐ অবস্থায় রাস্তায় দেখে ফেলল। ওর মাথাটা হেঁট হয়ে গেল সেদিন অপমানে। রেগে আগুন হয়ে খুড়ীর কাছে গিয়ে তাকে কড়া কথা শুনিয়ে দিল: 'এমনি ক'রে যার তার সাথে ঢলাঢলি ক'রলে কোনো ব্যাটা ও মেয়েকে বিয়ে করবেনা। বুড়োধাড়ী মেয়ে বিয়ের বয়েস হয়েছে কবে, এখনও ভাবেন যেন কচি খুকীটি। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছেন ড্যাং ড্যাং করে। আজ স্বচক্ষে দেখলাম গাঁয়েরই একটা পাজী বদমাস ছোঁড়া ওর হাত ধরে টানছে, আর বেহায়া মেয়ে দাঁত বের ক'রে হাসছেন। ছি ছি, কি লজ্জা!'

ওয়াঙের খুড়ীর অচল দেহের একটি অঙ্গ কেবল সচল ছিল, সেটি তার রসনা। ওয়াঙের কথা শুনে এই ক্ষুদে অঙ্গটি গা ঝাড়া দিয়ে পুরো মাত্রায়, সচল হয়ে উঠল: 'ওঃ জমিদারের জমিদারী কিনে জমিদার হ'য়ে বসেছেন আর কি। ওই যাকে বলে আঙুল ফুলে কলা গাছ। অত গুমোর ভালো নয়। বিয় নেই তার কুলোপানা চক্কর। আমাদের ওপর চোখ রাঙাতে এয়েছেন। বিয়ে— বিয়ে বললেই হুট্ ক'রে বিয়ে হয়ে যায়রে ছোখখেগো। দেখতে পাসনা চোখে।

বলে, খেতে গেলে পরতে কুলোয়না তায় বিয়ে। পণের কড়ি, ঘটক বিদায় এসব আসে কোত্থেকে। আমাদের ঐ গতরখেকো মিনসের কপাল নয়তো যেন বালির চড়া। কোন পাপ করেছিলাম গো আর জন্মে কে জানে, কোন পাপে অমন পোড়া ভাগ্য। সব ওপরওলার ইচ্ছে। নইলে কারো মাঠে সোনা ফলে আর মিনসে হাত দিলেই যেন মাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সব এক চোখো। অদৃষ্ট। অদৃষ্ট।' কোঁদল অবশেষে বিলাপে যেয়ে দাঁড়ায়। চুল ছিঁড়ে, অজস্র চীৎকার ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে সে বলে গেল তাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। অন্যদের ক্ষেতে কেমন সুন্দর পাকা সোনা রংএর ধান গম, আর ওদের ক্ষেতে সেই একই বীজ থেকে জন্মায় যত রাজ্যের আগাছা। সকলের বাড়ীগুলো যুগ যুগ নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো হাড় নিয়েও, আর ভূমিকম্প হবি তো হ' ওদের বাড়ীর মাটিতেই ঠিক মাপসই। তাইতো ওদের বাড়ী নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। আর সব পোড়ারমুখীরা কেমন বছর বছর ছেলে বিয়োয়। ওর নিজের পেটেই কি ছেলে আসেনা। এলে কি হবে—ভুঁয়ে পড়বার সময় পড়বে ঠিক আঁটিকুড়ীর বেটী আঁটকুড়ী মেয়ে। এমনি পোড়া কপাল।

বিলাপ শুনে পাড়ার লোক দৌড়ে আসে। ওয়াং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যা বলতে এসেছে শেষ ক'রে তবে যাবে। মরীয়া হয়ে ও বলে: 'অবশ্য কাকা গুরুজন তাকে আমার উপদেশ দেওয়া সাজেনা, তবে বলি, মুখে চুণ কালি পড়ার আগেই মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেলা ভাল।'

সোজাসুজি কথাকটা বলে ফেলে ও বাড়ী চলে এল। ওয়াং ভেবেছিল এবারও হোয়াংদের কাছ থেকে কিছুটা জমি কিনবে, এবং সাধ্যমত প্রতিবছরই কিছুটা কিনবে। বাড়ীতে আর একটা ঘর তোলার স্বপ্নও ছিল মনে মনে। মনশ্চক্ষে ও দেখছিল ও আর ওর বংশধরেরা এমনি করে শ্রীর দাক্ষিণ্যে কৃষকের খোলস ছেড়ে অদূর অনাগত কালে বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু ওই কাকার ছেলেগুলো—একই রক্ত বইছে ওদেরও ধমনীতে, ওরা অমন ছন্নছাড়া হা-ভাতের মত ঘুড়ে বেড়ায়। ভয়ানক রাগ হয় আজ ওয়াঙের।

পরদিন। মাঠে যথারীতি কাজ করছিল ওয়াং। কদিন হ'ল ওলান্ মাঠে আসছে না। মেজখোকা হবার পর প্রায় দশমাস গেছে এরই মধ্যে সে আবার আসন্ন-প্রসবা। শরীরটাও ওর এবারে তেমন ভালো নেই। কাজেই ওয়াং একাই ছিল।

এমন সময় ওর কাকার আবির্ভাব। ঢিলেঢালা বিপর্য্যস্ত কাপড়-জামা।

বোতাম নেই একটাও। কোনোমতে ·কোমর বন্ধের শ্লথ বন্ধনে বন্দী হয়ে আছে—একটু বাতাস এলেই বুঝি খুলে পড়বে। ওয়াঙের কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ। ওয়াং হাত না নামিয়ে, মাথা না তুলেই একটু শ্লেষের সুরে বলে: 'হাতটা থামাতে পারছি না কাকা, কিছু মনে কারানো। ফুল ধরেছে এই ফলবে, তার আগেই বীন্‌গুলোর গোড়া একটু খুঁচিয়ে দিতে হবে। তোমার নিশ্চয় সারা হয়ে গেছে। আমি একটা কুঁড়ের বাদশা, কোন কাজ আমায় দিয়ে যদি ঠিক সময়ে হয় কোনোদিন—'

বৃদ্ধ ওয়াঙের বিদ্রূপ বুঝতে পারে। কিন্তু চেপে গিয়ে মোলায়েম সুরে জবাব দেয়: 'আমার পোড়া অদৃষ্টের কথা আর বলিস কেন বাপ। কতগুলো বীন্‌এর বীজ পুঁতেছিলাম, হ'ল মাত্র একটা। তারও হাল এমনি যে গোড়া টোড়া খুঁড়ে আর কিছু হবে না। বীন্ এবার কিনেই খেতে হবে।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃদ্ধ।

ওয়াং নিজেকে কঠিন ক'রে নিল। ও বেশ বুঝেছে কিছু চাওয়াই হচ্ছে এ লোকটার শুভাগমনের উদ্দেশ্য। অত্যন্ত সহজ ভাবে তৈরী জমিটার ক্ষুদ্রতম মাটির ঢেলাগুলো ও নিবিষ্ট মনে গুঁড়ো ক'রে চলল। বীনের চারাগুলো বেশ সবল ঋজু হ'য়ে উঠেছে। পায়ের কাছে তাদের ছায়ায় ছোট ছোট রেখা পড়েছে।

কাকা আবার বলে: 'তোর খুড়ী বলছিল বড় মেয়েটার বিয়ের জন্ত নাকি তুই ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্। তা হবারই কথা। যা বলেছিস্ সবই সত্যি। বয়েস কম হলে কি হবে, তোর বাপ-খুড়োর চাইতে তোর বুদ্ধি ঢের বেশী। মেয়েটার বিয়ের বয়েস হ'ল বৈকি। বিয়ে হ'লে এতদিন ক'ছেলের মা হ'য়ে বসতো। ও আমার গলার কাঁটা হয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন কোন কুকুরের পো মেয়েটাকে নষ্ট ক'রে দেয়। তাহলে কি আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারব। আর আমাদের মান গেলে তোদেরও তো অপমান। তা তুই ব্যস্ত হবি বৈকি।"

ওয়াং শক্ত ক'রে কোদালটা মাটিতে বসায়। ওর সাফ সাফ বলে দিতে ইচ্ছে করে: 'মেয়েকে একটু শাসন করলে আর বাড়ীতে রেখে একটু কাজ-কর্ম রান্না সেলাই ফোঁড়াই শেখালেই তো আর সব হয় না।' কিন্তু হাজার হোক কাকা গুরুজন, তার মুখের ওপর এসব কথা বলা যায় না। অগত্যা চুপ ক'রে ও একটা গাছের গোড়া খোঁচাতে থাকে। কাকা প্রায় কান্নার সুরে বলে:

'আমার কপাল সব রকমে ভাঙ্গা। তোর খুড়িবেটি যদি তোর মার মত হ'ত তা হ'লে কি আমার আর ভাবনা ছিল! তোর মা ছিল লক্ষ্মী—যেমন ছিল কাজের হাত, তেমন বছরে বছরে বিয়োতো ছেলে। আর এ মাগী দিন দিন মুটিয়ে হাতী হচ্ছে আর পালে পালে জন্মাচ্ছে কতগুলো বাঁদর। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে একটা মাত্র ছেলে। ব্যাটা নবাব পুত্তুর, কুটোটি ভেঙ্গে দু'খান করবে না। নইলে আমার কি আর এ হাল থাকতো আমার ঘরেও তোর মত লক্ষ্মী বাঁধা থাকতো। তখন কি আর তোদের না দিয়ে খেতাম! তোর মেয়েদের বিয়ে, ছেলেগুলোকে মানুষ টানুষ ক'রে আমিই দিতাম। ওসবের জন্য না তোকে মাথা ঘামাতে হ'তো, না তোর গাঁটের কড়ি খসাতে হ'ত।

ওয়াং কড়া জাব দিল: 'তুমি জান কাকা, আমি বড়লোক নই। পাঁচ পাঁচটা পেট আমায় পুষতে হয়। বাবা বুড়ো তাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না। তাই ব'লে খাওয়া তো আর বাদ যায় না। তারপর আর একটাও জুটল ব'লে।'

'বড়লোক নই। নই বললেই হ'ল। মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে বাবুদের জমিদারী তো দিব্যি কেনা হ'চ্ছে—তার বেলা তো পয়সার কমতি দেখিনা।' —চেঁচিয়ে ওঠে বৃদ্ধ।

ওয়াঙের আর সহ্য হয়না। কোদালটা দেয় ছুঁড়ে ফেলে। কাকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে জবাব দেয়: 'আমার যদি দুটো পয়সা হ'য়ে থাকে, অন্যের তাতে চোখ টাটায় কেন, কারো ঘরে কিছু আর সিঁদ কাটতে যাইনি। পয়সা করেছি রীতিমত গতর খাটিয়ে; আমি খাটি, আমার বৌ খাটে। ওদিকে তো দেখি ছেলে-বৌ এর পেটে নেই ভাত, পরনে নেংটি, ক্ষেতে জমছে জঙ্গল—আর জোয়ান মরদ জুয়োর টেবিলে উবু হয়ে বসে আছেন। কেউ বা বাসি ঘরের দুয়োরে বসে পরের মুখের ঝাল খাচ্ছেন। আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ, ওসব আমিরী আমাদের পোষায় না।'

কাকার বাদামী মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, ছুটে এসে কষে মারে ওয়াঙের মুখে দুই চড়: 'পাজী বেল্লীক, গুরুজনের মুখে মুখে কথা! গোল্লায় গেছো। দুটো পয়সা হয়েছে বলে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।'

ওয়াং নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাকা জাতীয় এই জীবটির মুণ্ডপাত করতে থাকে মনে মনে। 'দাঁড়া, বের করে দিচ্ছি

তোর সব কীর্তি,' কাকা বলে : 'কাল বাড়ী ব'য়ে যা না তাই বলে এসেছিস্। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে দুনিয়ার লোককে শুনিয়েছিস্ আমার মেয়ে নষ্ট। মেয়ে আমার নষ্ট হোক আর যাই হোক্ গুরুজনের মুখের ওপর অমন কথা বলার সাহস তোর হ'তনা কখনও।' ভাঙ্গা গলায় চীৎকার ক'রে ওয়াংকে শাসায় বার বার : 'গাঁয়ে তোর সব গুণ জাহির ক'রে দেবো।'

ওয়াং অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ব'লে ফেলে : 'আমায় কি করতে হবে এখন ?' ওর অহমিকায় একটু ঘা লাগছে—পাছে গাঁয়ের লোকে সত্যি জানতে পারে যে ওয়াং গুরুজনকে মান্তি-মাননা করে না।

কাকা যেন যাদুমন্ত্রে এক লহমায় একেবারে জল হয়ে গেল। মুখে হাসি টেনে ওয়াঙের কাঁধে হাত রেখে বলল : 'আহাহা তোকে কি আর এ বুড়ো চেনে নারে বাপ! সোনার চাঁদ ছেলে আমার তুই। তা দেখ বাপ্, কিছু টাকা, এই ধর গোটা দশেক ডলার, কিছু কম হ'লেও চলবে অবশ্য। তা'হলেই বড়টার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। ঠিকই বলেছিস্ মেয়েটা ধাড়ী হ'য়ে উঠেছে, বিয়েটা না দিলে আর চলে না।' ব'লে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে ভক্তিগদগদ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায়। ওয়াং কোদালটা তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয় অসহায় ক্রোধে।

'চলো বাড়ী' ওয়াং বলে প্রচণ্ড উষ্মার সাথে—'টাকার থলি বয়ে তো আর বেড়াই না।' তারপর বড় বড় পা ফেলে আগে চলে। মনের তিক্ততা তীব্র অসহনীয় হ'য়ে ওঠে। শ্রমার্জিত অতগুলো টাকা, জমি কিনবে বলে রেখেছিল সঞ্চয় ক'রে—আজ তা ওকে তুলে দিতে হবে এই জুয়াড়ীর হাতে। সন্ধ্যের আগেই হয়ত' ও আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে টাকাগুলো জুয়োর টেবিলে পড়বে।

উঠানের রোদে ওয়াঙের ছেলে দুটি খেলা করছিল। ধাক্কা দিয়ে তাদের সরিয়ে ওয়াং দুম্‌দাম্ ক'রে বাড়ী ঢুকল। ওর কাকা সহজ ভাল মানুষটির মত —যেন কিছুই হয়নি—তার শতছিন্ন মলিন বস্ত্রের গোপন গুহা থেকে দুটি পোন বের ক'রে ছেলে দুটির হাতে দিয়ে তাদের কোলে তুলে নিল। সুপুষ্ট, মসৃণ কচি দেহগুলি বুকে চেপে ধরে আদর ক'রে ঘাড়ের কচি মাংসের কোমল ভাঁজে নাক ডুবিয়ে প্রাণ ভরে ঘ্রাণ গ্রহণ করল।

ওয়াং সোজা যেয়ে শোবার ঘরে ঢোকে। বাইরের রোদ থেকে আসার জন্য অন্ধকার ঘর আরও বেশী অন্ধকার লাগে। ছোট একটা ফাঁক দিয়ে সরু এক

ফালি আলো আসছে—তা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না আর। সারা ঘর জুড়ে একটা গন্ধ, অতি পরিচিত গন্ধ—গরম, কাঁচা রক্তের।

'তোমার আর সময় অসময় নেই—' স্বরে ঝাঁঝ মিশিয়ে ওয়াং বলে। অতি ক্ষীণ স্বরে বিছানা থেকে ওলান্ জবাব দেয়। ওয়াং চম্‌কে ওঠে। ওলান্‌এর স্বরে এত ক্ষীণতার সাথে তো ওর পরিচয় নেই।

'একটা মেয়ে হ'ল।'

ওয়াং স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা অশুভের আকস্মিক অনুভূতি ওকে যেন হঠাৎ চাবুক মারে। মেয়ে! এই মেয়ে নিয়েই কাকার বাড়ীতে অত দুর্গতি। এখন ওর ঘরেও মেয়ে!

কোনো কথা না ব'লে দেওয়ালের কাছে সরে এসে হাতড়ে হাতড়ে এবড়ো খেবড়ো জায়গাটা খুঁজে নিল ওয়াং। তারপর মাটির তলটা সরিয়ে হাত দিয়ে টাকাগুলো আঁচ ক'রে ন'টা ডলার গুণে নিল।

'টাকা বের করছ কেন ওখান থেকে।' ওলান্‌এর তীক্ষ্ণ স্বর যেন তীরের ফলার মত অন্ধকার ভেদ ক'রে ওয়াঙের মর্মে যেয়ে বেঁধে।

'কাকাকে ধার দিতে হবে।'

প্রথমটা কিছু বলল না ওলান্। তারপর ওর স্বাভাবিক নির্বিকার স্বরে গাম্ভীর্যের সাথে বলল: 'ধার না হাতো। ধার ব'লো না, বলো—দিচ্ছ।'

'তা আমি জানি ভাল করেই'—ওয়াং তিক্ততাভাবে জবাব দেয়: 'এতো টাকা দেওয়া নয়,—ছুরি দিয়ে নিজের গা থেকে মাংস কেটে দেওয়া। নেহাৎ আপনার লোক, এক রক্তের, তাই—নইলে বয়ে গেছে দিতে।'

বাইরে এসে ডলার ক'টা কাকার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হন্ হন্ করে ওয়াং সোজা চলে গেল মাঠে। একটা প্রবল হিংস্রতা নিয়ে যেন কাজে ডুব দিল। মাটি আজ ও টেনে উপড়ে ফেলবে মূলের বন্ধন হ'তে। খানিকক্ষণ ভাবল খালি টাকার কথা। যেন চোখের সামনে দেখতে পেল—ডলারগুলো জলধারার মত অবলীলায় ঝর্ ঝর্ ক'রে জুয়োর টেবিলে পড়েছে। একটা নিষ্কর্মা হাত কুড়িয়ে তুলে নিল সব। ওরই টাকা, ওরই প্রাণপাত শ্রমের মূল্যে জমান টাকা। ঐ টাকাই তো ফিরে আবার আসত মাটিরই রূপে।

জ্বলে জ্বলে অন্তরের দাহ যখন নিঃশেষে নিবে গেল, তখন প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। এইবার পিঠটা একটু সোজা ক'রে ওয়াং দাঁড়ায়, মনে পড়ে ঘরের কথা—মনে পড়ল ক্ষিদে পেয়েছে।

বাড়ীতে নূতন ভাগীদার জুটল আর একজন—মেয়ে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। ওর ঘরেও আমদানী হ'ল মেয়ে—যে মেয়ে বাপের নয়, মায়েরও নয়; তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাপ মা বড় করবে শুধু অন্তকে বিলিয়ে দেবার জন্ত। কাকার ওপর রাগ ক'রে নবাগত শিশুর ছোট কচি মুখখানাও একবার দেখে আসতে ভুলে গেছে।

কোদালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে কেমন একটা বিষাদের সাগরে ডুবে গেল ওয়াং। ঐ জমির পাশের জমিটা কিনতে এখন আরও এক বছর ঘুরে যাবে। সেই আবার শস্য উঠলে পর। খাবার লোকও আবার একটা বাড়ল।

সন্ধ্যার ধুসর আকাশ বেয়ে এক ঝাঁক নিকষ কালো কাক ওয়াঙের মাথার ওপর ঘুরে কর্কশ ভাবে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ওয়াং তাকিয়ে দেখল। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘের মত কতগুলো কাক ওদের বাড়ীর পেছনকার গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কোদাল নিয়ে ওয়াং তাড়া করল। ওরা আবার দৃশ্যমান হ'য়ে ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ওয়াঙের মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে যেন ওকে ব্যঙ্গ ক'রতে লাগল। তারপর ঘনায়মান অন্ধকার আকাশের প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

অলক্ষণ।

ওয়াঙের ভেতর হ'তে একটা ব্যথাহত করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

আট

সারা বর্ষা এক ফোঁটাও বৃষ্টি হ'ল না। আকাশের বুকে নিত্য-উপচীয়মান জ্বালা, নীচের ওই বিদীর্ণ-বক্ষ ধরিত্রীর মূক যাচ্ঞাকে যেন ব্যঙ্গ ক'রে চলেছে। প্রভাতী আকাশে মেঘের ছবি সোনার লেখায় আর বিচিত্র হ'য়ে ওঠে না। রাতের আকাশে হেম নক্ষত্রের নিষ্ঠুর সৌন্দর্য, সেই স্নিগ্ধ দ্যুতি নাই।

ওয়াঙের চষা ক্ষেতগুলো শুকিয়ে ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। বসন্ত-বাতাসের ছোঁয়ায় তরুণ গমের অঙ্কুর সাহস ক'রে মাথা তুলেছিল,—ভাবী কালের স্বপ্নও বুকে বাসা বেঁধেছিল; কিন্তু না পেল আকাশের দাক্ষিণ্য, না পেল মাটির

রস। মাথা তুলতে আর পারল না তারা। নিস্পন্দ হ'য়ে সূর্যের অবারিত জ্বালার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পাণ্ডুর হ'য়ে ঢ'লে পড়ল নিস্ফল তৃণত্বে। মাটির পটভূমির ধুসরত্বে কচি ধানের শ্যাম লেখা জেগেছিল। গমের আশা যখন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, ওয়াং বাঁশের বাঁকের মাথায় দুটো কাঠের বালতি বেঁধে ভরে ভরে জল এনে ধানক্ষেতে ঢেলেছে। ওর কাঁধে মাংসের মধ্যে গর্ত হয়ে গেছে, বাটির মত মস্ত এ কটা কড়াও পড়েছে। কিন্তু সে জল রাক্ষুসী মাটি যেন তার যুগসঞ্চিত তৃষায় শতমুখে শুষে নিয়েছে।

পুকুরের জল শুকিয়ে তলার মাটি ফেটে গেল। কুয়োর জলও এত নীচে চ'লে গেল যে ওলান্ ভয়ে স্বামীকে বল্ল: 'শুকোতে দাও তোমার ক্ষেত, নইলে ছেলেপুলে আর বাবা গলা শুকিয়ে মরে যাবে যে—'

ওয়াং রেগে উঠল: 'কিন্তু গাছে জল না পড়লে পেট শুকিয়ে মরমে—' ওর রাগটা ভেঙ্গে পড়ল একটা বুক-ভাঙ্গা ফোঁপান কান্নায়।

মাটির সাথেই ওদের জীবন মরণ বাঁধা। কেবল খাতের ধারের জমিটায় কিছু ফসল হ'ল। কারণও ছিল। যখন গরম চলে যাবার পরও বৃষ্টি হ'লনা, তখন আর সব ফেলে, সারাদিন ধ'রে জল তুলে এই লোভী মাটির বুকে ঢেলেছিল ওয়াং। জীবনে এই প্রথম, এবছর ফসল কাটা হ'তেই ওয়াং বেচে ফেলল। রূপোর ঝক্‌ঝকে ডলারগুলো হাতে আসতেই শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরল একটা প্রবল অবজ্ঞায়। হোক দেবতারা বিরোধী, হোক অনাবৃষ্টি, ওয়াং সংকল্পচ্যুত হবেনা কিছুতেই। এই কটা ডলারের জন্য ও শরীর পাত ক'রেছে খেটে খেটে। যা খুসী ওর, তা ও এ দিয়ে করবে। ওখান থেকে সোজা জমিদার বাড়ী গিয়ে ম্যানেজারকে বলল বিনা ভূমিকায়:

'খাতের ধারে আমার জমির পাশেই আপনাদের যে জমিটা আছে সেটা আমি কিনতে চাই. টাকা হাতে ক'রেই এসেছি।'

এদিক সেদিক থেকে ওয়াং শুনেছিল হোয়াং পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে পড়েছে।

সংসারের ফুটো নৌকাখানি ভেসে আছে এখনও কোনমতে। বহুদিন থেকেই কর্ত্রীর আফিঙের পুরো মাত্রা জুটছেনা; কাজেই ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর মত হয়েছে তার ভীষণতা। প্রতিদিন ম্যানেজারকে ডেকে গালাগালি, মাঝে মাঝে হাতের পাখাটার দু'চার ঘাও বেচারার ভাগ্যে জোটে। নিষ্কর্মা ম্যানেজার কি জমিগুলোও সব খেয়েছে? জমিদারী বেচে পারে না কড়ি

জোগাতে? জমি থাকে কি করতে তা'হলে? সে বেচারা নিরুপায়। লেন-দেনে নিজের মুনাফার ভাগও ইদানীং তাকে ছাড়তে হয়েছে।

অন্যদিকে বুড়ো কর্তা বাড়ীর একজন দাসী-কন্যাকে নূতন ক'রে অন্তঃপুর-পোষিতাদের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এই দাসীটি কর্তার যৌবনের অনুগৃহীতা ছিল! সে এখন এ বাড়ীরই একজন ভৃত্যের বিবাহিতা পত্নী। এরই ষোড়শী কন্যা বৃদ্ধের স্থবির দেহের রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিল নূতন ক'রে। এই জরাগ্রস্তের ক্রমবর্ধমান মেদপিণ্ডের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত রক্তস্রোতে তখনও যৌবন-সুলভ কামনার ফেনিল আবর্ত। যে কোনো অল্পবয়সের তনু-দেহা মেয়ে,—হোক সে শিশু, হোক বালিকা, হোক যুবতী, সেই আবর্তে ডুবে যায়।

এর উপর কর্তার প্রেয়সীদের হাতে সোনার অলঙ্কার, কানে জেড্-এর কর্ণাভরণ জোটাবার মত সম্বল ঘরে নেই, একথা তাকে বোঝান অসম্ভব। যাকে আজীবন কেবল হাত বাড়াবার কষ্টটুকুই স্বীকার ক'রতে হয়েছে, বাড়ালেই মুঠো ভরা টাকা পেয়েছে, আজ সেই মানুষকে 'টাকা নেই' বোঝান সম্ভব নয়। কর্তার নারী ও গিন্নীর আফিং, দু'জনের এই দুই মস্ত নেশার ক্রমান্বয়ে আঘাত ওদের সম্পদের ভাণ্ডার সইতে পারে না।

তার ওপর দেশ জোড়া অনাবৃষ্টির ফলে জমিদারের ক্ষেতও শস্যহীন। কাজেই ওয়াং লাঙের প্রস্তাব যেন বুভুক্ষিতের কাছে নিয়ে আসা আহারের পাত্র। ম্যানেজারও হাতে শীকার পেল। দর কষাকষি হলো না, বিলম্বিত সময় অপহরণের জন্য চা খাওয়া প্রয়োজন হ'ল না, কেবল দুইটি প্রাণীর ক্ষুদ্র ক্ষণের ব্যগ্র অনুচ্চার দু'চারটি কথা। কাগজে নাম সই হ'ল, পড়ল সীল, টাকাগুলো এক হাত হ'তে আর এক হাতে চলে গেল এক লহমায়, জমিদারের নাম বুক থেকে মুছে ফেলে জমি ওয়াং লাঙের হয়ে গেল।

এবারও ওয়াং গণ্য করল না অতগুলো টাকার বিচ্ছেদ—ওর অত কষ্টের টাকা, দেহ জল করা টাকা, দেহের রক্ত-মাংসের সামিল। ঐ অর্থের মূল্যে ও নিজের অন্তর-পোষিত কামনা পূর্ণ ক'রেছে। এখন এই বিপুল সু-উর্বর ভূখণ্ডের অধিকারী সে। নূতন জমিটার পরিমাণ আগেরটার দ্বিগুণ। ঐ পরাক্রান্ত জমিদার-গোষ্ঠীর একদা-স্বাধিকার-ভুক্ত এই ভূখণ্ডের স্বত্ব আজ ওর, ওয়াঙের। এ মহা-গৌরব, জমিটার উর্বরতার প্রশ্নকে বহু পেছনে ফেলে গেছে।

জমি কেনার কথা এবারে ওয়াং একেবারে চেপে গেল, ওলান্-এর কাছেও।

মাসের পর মাস গেল। বৃষ্টি হ'ল না। শরৎ এল, হালকা মেঘের ছোট ছোট টুক্‌রো মন্থর গতিতে আকাশের গায়ে ভেসে উঠল, নেহাৎ যেন অনিচ্ছায়। গ্রামের রাস্তায় কর্মহীন উদ্বিগ্ন লোকের জটলা। আকাশের দিকে ব্যগ্র চোখ তুলে গভীর অভিনিবেশে মেঘগুলি নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ওরা, আলোচনা করে কোনোটাতে জলের আভাস আছে কিনা।

কিন্তু বর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট মেঘ-সঞ্চার হবার অবকাশ আর হ'ল না। উত্তর পশ্চিমের মরুভূমি থেকে এক দুরন্ত বাতাস এসে যেন ঝেঁটিয়ে সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। আকাশ তার মমতাহীন অসীম শূন্যতা নিয়ে ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক দৃষ্টিতে। প্রতি উষায় যথা নিয়মে সূর্য ওঠে রাজ সমারোহে; রোজকার একলা পথে চলা সারা ক'রে রাতের আঁধারে একলা যায় ডুবে। নির্মেঘ দীপ্তির প্রখরতায় চাঁদ হয়ে ওঠে ছোটখাট একটা সূর্য।

ফসলের মধ্যে পাওয়া গেল কিছু বীন্। আর ধানের চারা উঠিয়ে লাগাবার আগেই হল্‌দে হ'য়ে শুকিয়ে যাওয়াতে মরীয়া হ'য়ে ভুট্টা লাগিয়েছিল ওয়াং, তারই কটা অপুষ্ট খোপ্‌না। ঝাড়বার সময় একটা দানাও এদিক ওদিক যেতে পে'লনা। খামারের আঙ্গিনায় বসে পিটিয়ে পিটিয়ে ভুট্টার দানা ছাড়ান হ'লে ওয়াং ছেলেদের লাগিয়ে দিল তুষগুলো খুঁজে দেখতে ওর মধ্যে ভুট্টার কোনো দানা চলে গিয়েছে কিনা। দানা-ছাড়ান ভুট্টার খোপ্‌নাগুলো জ্বালাবার জন্য সরিয়ে রাখতে ওলান্ বলল :

'এগুলো পোড়াব না। আমার মনে আছে সেই সেবারে শানটুং-এ দুর্ভিক্ষের বছর, অবিশ্যি খুব ছোট ছিলাম তখন, এগুলো শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে কত খেয়েছি তখন আমরা। ঘাসের চাইতে বরং ভালোই লাগে খেতে।'

ওলানএর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই,—ছেলেরা অবধি। ভয়ে কারো মুখে কথা ফুটল না। এই অদ্ভুত জ্বালাময় দিনগুলো যেন একটা ভাবী অকল্যাণের বিভীষিকায় থম্ থম্ করে। শুধু কোলের অবুঝ শিশুটি ভয়-ভাবনার ঊর্ধ্বে। ওর দাবী মেটাবার মত অজস্র সম্বল তখনও তার মায়ের বক্ষে প্রচুর রয়েছে। ওলান্ মেয়েকে স্তন দিতে দিতে আপন মনে বলে :

'নে নে খেয়ে নে, যতক্ষণ আছে, প্রাণ ভরে খেয়ে নে।'

শিশুর এ সুখ বেশী দিন রইল না। ওলান্‌এর আবার সন্তান সম্ভাবনা হ'ল, স্তনের দুধ গেল শুকিয়ে। বুভুক্ষু শিশুর অসহায় আর্ত, বিরতিহীন কান্নায় আতঙ্কিত বাড়ীখানার ভয়াল পরিবেশ আরো বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে।

যতদিন পেরেছে ওয়াং বলদটার যত্ন করেছে প্রাণপণে, ত্রুটি হ'তে দেয়নি। খুঁটে-পিটে যতদিন পেরেছে শুকনো ঘাস লতা-পাতা খড় ওকে যতটুকু হোক জুগিয়েছে; বাইরে গিয়ে গাছ থেকে পাতাও পেড়ে এনে দিয়েছে। কিন্তু শীত এলে গাছের পাতাও ফুরিয়ে গেল। কর্মহীন জীবন—চাষ নেই, বীজ বোনা নেই, বুনলেও শুকিয়ে যায়। আর বীজই বা কোথায়। ওতো সব পোড়া পেটে ঢেলেছে। বলদটাকে এখন ছেড়ে দেয় নিজেই চরে খাবার জন্য। বড় খোকা দিনমান ওর নাকের দড়ি ধরে পিঠে বসে থাকে, পাছে কেউ চুরি করে। তারপর তাও বন্ধ করতে হ'ল। সারা গাঁয়ের যা হাল হয়েছে, কে জানে, কোন্‌দিন ছেলেটাকে মেরে ধরে বলদটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে খাবে ওরা। সুতরাং অনাহারে দরজার কাছে বাঁধা থেকে থেকে একেবারে কঙ্কাল সার হ'য়ে গেল অমন সুপুষ্ট বলদটা।

টেনেটুনে চলল কোনো মতে। তারপর এমন দিন এল যেদিন উনুনে আর হাঁড়ি চড়ল না। ঘরে না আছে একদানা চাল, না একদানা গম। থাকবার মধ্যে আছে কয়েকটা বীন্ আর ক'দানা ভুট্টা। বলদটা ক্ষিদের জ্বালায় ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেল। ওয়াঙের বাবা বলল: 'এর পর বলদই মেরে খেতে হবে আমাদের।' ওয়াঙের ভেতর থেকে একটা আর্ত চীৎকার বেরিয়ে আসে, যেন কেউ ওকে বলেছে: 'এরপর মানুষ খেতে হবে।'

এই বলদটা ওর কৃষি জীবনের আজীবন সাথী। প্রতি ঊষার আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে মাঠের পথে সে চলেছে আগে ও পেছনে; প্রসন্ন ঔদার্যে কখনও ওকে আদরে ভরে দিয়েছে; বিরক্তিতে কখনও করেছে গালাগালি। এই এতটুকু যখন ছিল তখন কেনা হয়েছিল; সেই থেকে ওয়াঙের সাথে ওর জীবন একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। একে খাবে? কেমন ক'রে? তা ছাড়া এরপর চাষ চলবেই বা কেমন ক'রে?

বাবা শান্ত স্বরে বলে: 'প্রাণটা বড় হ'ল কার রে! তোর, না ওই বোবা জানোয়ারটার। তোর ছেলেদের, না ঐ বলদটার? প্রাণ গেলে ফিরে পাওয়ার সাধ্যি থাকে না বাপ্, একটা বলদ গেলে আর একটা কেনা যায়।'

পারলনা—ওয়াং কিছুতেই সেদিন ওটাকে মারতে পারল না। পরের দিন গেল, তার পরের দিনও। অনাহারী শিশুদের অশ্রান্ত কান্না মিথ্যা আশ্বাসে আর ত' ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ওলান্ স্বামীর দিকে চায়, দৃষ্টিতে ওর করুণ অসহায় মিনতি। ওয়াং ও-দৃষ্টির ভাষা পড়ে নেয়, বোঝে, যা এড়াতে চেয়েছিল

প্রাণপণ ক'রে আজ আর তা ঠেকান যাবে না, যাবে না—। নিরুপায় ওয়াং ক্ষুধার যূপকাষ্ঠে ও নিজেই আজ বলির পশু। ক্ষুধা, ক্ষুধা…রাক্ষসী ক্ষুধা…। শেষ পর্যন্ত রুক্ষ স্বরে সম্মতি জানিয়ে দেয়: 'মারতে চাও মারোগে—কিন্তু আমার দ্বারা হবে না, আমার দ্বারা হবে না।'

ওয়াং ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে আপাদমস্তক লেপ-মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকে। ওর আজীবনের সাথী ওই মরণাহত মূক প্রাণীর শেষ করুণ আহ্বান ওর কাণে যেন না পৌঁছায়, কিছুতেই না পৌঁছায়।

রান্না ঘর থেকে বড় ছোরাখানা হাতে নিয়ে ওলান্ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। বেশী নয়, গলায় একটি সবল কোপ। দুর্বল প্রাণ—বড় সহজেই দেহটা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। একটা বাটিতে রক্তটুকু ওলান্ ধরে নিল, এক ফোঁটা মাটিতে পড়তে দিল না। স্যুপ্ ক'রে দেবে। তারপর ছাল ছাড়িয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলে বিশাল দেহটাকে। সব শেষ হয়ে রান্না পর্যন্ত শেষ হবার আগে ওয়াং কিছুতে ঘর থেকে বেরুতে পারল না। ও চেষ্টা করল মাংস খেতে, কিন্তু ভেতর থেকে ওর সবকিছু যেন উল্টে বেরিয়ে আসতে চায়। খালি একচুমুক স্যুপ্ গিলল কোনো মতে চোখ মুখ বুজে।

'এত দুঃখ করছ কেন,' ওলান্ সান্ত্বনা দেয়: 'ওটা তো বুড়োই হ'য়েছিল। দু'দিন বাদে অমনি মরে যেত। আর দিন কি এমনিই থাকবে আবার সুদিন আসবে, তখন এর চাইতে আরো ভাল বলদ কিনতে পারবে।'

সান্ত্বনার প্রলেপ ওয়াঙের বেদনার তীব্রতা অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে। একটু একটু ক'রে মাংসও সে খেল শেষটায়।

ক'দিন পরে মাংস ফুরোল। হাড়গুলো চিবিয়ে চিবিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। তারপর কিছুই রইল না। রইল শুধু শুকনো চামড়াটা।

প্রথমদিকে প্রতিবেশীদের ধারণা ছিল, ওয়াং মেলাই টাকা মেলাই খাবার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। ওয়াঙের কাকার ঘরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল সকলের আগে। সাত ছেলে মেয়ে, নিজে, স্ত্রী—এই নয় প্রাণীর সংসার, আর শূন্য ভাণ্ডার। ওয়াঙের দ্বারে এসে অগত্যা সে আঁচল পেতে দাঁড়িয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও খানিকটা বীন্ আর ভুট্টা কাকার কাপড়ে ঢেলে দিয়ে ওয়াং তাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছিল এই তার শেষ সম্বল। বুড়ো বাপ আর অবুঝ শিশুগুলোর দিকে তো ওকে চাইতে হবে।

কাকা আর একবার এসেছিল—কিন্তু ফিরে গেল ব্যর্থ হয়ে।

সেদিন পদাহত কুকুরের মত সে ওয়াঙের ওপর ক্ষেপে গেল। গাঁয়ের চারদিকে অমুচ্চারে সে বলে বেড়াতে লাগল: 'ওয়াঙের ঘরে টাকা, খাবার মেলাই আছে। কিন্তু এমনি কঞ্জুস সে কাউকে একমুঠো দেয় না। নিজের খুড়োটা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পেট শুকিয়ে মরছে, তাকে দু'মুঠো দে—তাও না। চোখে সে দেখছে তো সবই।'

ঘরে ঘরে অনটন। অনাহারের হাহাকার প্রেতের অট্টহাসির মত বাতাসে বাতাসে হা হা ক'রে বেড়ায়। কারো ঘরে একটি কপর্দক নেই—একদানা আহার্য নেই। কঙ্কাল মূর্তির দল রূপ নিয়েছে গাঁয়ের ঘরে ঘরে, যেখানে দু'দিন আগেও ছিল সুস্থ-সবল পরিতৃপ্ত সুন্দর মানুষ। এরপর এল মরুভূমির বক্ষ-মন্থন-করা-শীতের হাওয়া, শাণিত ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ। একদিকে আপন জঠরের অনির্বাণ ক্ষুধার আগুন, আর একদিকে বস্ত্রহীন, উপবাসী, মৃত্যুপথ-যাত্রী প্রিয়জনের কাতর আর্তনাদ।...কিষাণেরা মরীয়া হ'য়ে ওঠে। আর এরই মধ্যে ওয়াঙের কাকা বিশীর্ণ খেঁকী কুকুরের মত শীতে হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তা দিয়ে তার অনাহার-শীর্ণ হিমে-নীল ঠোঁটে বলতে বলতে যায়:

'যাও সব, যেয়ে দেখো অমুকের ঘরে মেলাই খাবার রয়েছে গো। নইলে ওর ছেলেদের হাড়ের গায়ে এখনও মাস লেগে আছে অমনি অমনি।'

এমনি অবস্থায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রতিবেশীর পক্ষে মনুষ্যত্বের সীমার হিসাব রাখা সম্ভব হয় না। লম্বা লম্বা লাঠি নিয়ে তারা একদিন রাতে ওয়াঙের বাড়ীতে হানা দেয়। তাদের গলা শুনে দরজা খুলে দিতেই হিংস্র পশুর মত সবাই লাফিয়ে ওয়াঙের ওপর পড়ে। ধাক্কা দিয়ে ওকে দেয় বাইরে ঠেলে, ভয়ার্ত ছেলেগুলোকে দেয় দূরে সরিয়ে। তারপর বন্য উন্মত্ততায় সন্ধান ক'রতে থাকে যেন কোন মহারত্নের। প্রতি কোণ তারা খুঁজল, ভেঙ্গে চুরে, তচ্‌নচ্‌ ক'রে, প্রতি জায়গা, আনাচ-কানাচ, হাতড়ে দেখল স্পর্শে ক্ষুদ্রতম কিছু ঠেকে কিনা। কিন্তু বৃথাই হল শ্রম, বেরুল শুকন কয়েকটি বীন্‌ আর পোয়াখানেক ভুট্টার দানা—ওয়াঙের সারা পুঁজির ভাণ্ডার। নিষ্ঠুর আশা-ভঙ্গে নিদারুণ আর্তনাদ ক'রে ওঠে ওরা, মরীয়া হ'য়ে ওঠে। ওদের রক্তে আজ জেগেছে আদিম ক্ষুধার উন্মত্ত প্রচণ্ডতা। খাবার না পেয়েছে, আজ এখানকার কিছু ওরা রেখে যাবে না। ওরা এসেছে লুটে নিতে, লুটের মুখ্য বস্তু ওরা পে'লনা—যা হাতের কাছে পাবে, তাই নিয়ে যাবে, বৃথা হ'তে দেবে না ওদের শ্রম। বেঞ্চ,

টেবিল, এমন কি যে-বিছানায় শুয়ে ওয়াঙের বাপ, ভয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিল আর শিশুর মত অসহায় হ'য়ে কাঁদছিল—যা পেল সব তুলে নিল।

এমন সময় ওলান্ এসে মাঝে দাঁড়াল। তার চির অনাড়ম্বর, ভাব-ব্যঞ্জনা-হীন মন্থর কণ্ঠ কিষাণদের উন্মত্ত চীৎকার ছাপিয়ে ওপরে উঠল: 'সাবধান, একটি জিনিষে হাত দিওনা। এখনও না—আমাদের বাড়ীর আসবাব নেবার পালা এখনও আসেনি। নিজেদেরগুলো বেচেছ? সেগুলো আগে বেচে খাও, তারপর এখানে এস। এখন ছাড় আমাদের জিনিষ। আমাদের বাঁচতে হবেনা! তোমাদের যা আছে তার চাইতে একদানাও বেশী আমাদের ঘরে নেই। বরঞ্চ তোমাদেরই বেশী আছে, আমাদেরটাও তোমরা কেড়ে নিয়েছ। আর যদি কিছুতে হাত দাও দেবতার দিব্যি রইল। তার চাইতে চল, সবাই মিলে একসাথে বেরিয়ে পড়ি, ঘাস পাতা যা পাই কুড়িয়ে আনিগে যার যার বাড়ীর জন্য—হা ভগবান! আর একটা হতভাগা দুর্দিনে না এসে পারল না—' বলতে বলতে পেট চেপে বসে পড়ল ওলান্।

ওলান্এর সামনে লজ্জিত হয়ে প্রতিবেশীরা এক এক ক'রে চলে যায় মাথা হেঁট ক'রে।

এদের স্বভাবে পাপ নেই। সহজ সরল খেটে-খাওয়া মানুষ এরা। কিন্তু ক্ষুধা এদের পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছে।

একজন পেছনে রয়ে গেল। চিং। ছোটখাট নিস্তব্ধ পিঙ্গল বর্ণের মানুষটি, মুখের আকৃতি অনেকটা বানরের মত। চোখ গর্তে, গাল গর্তে, মুখে উদ্বেগের আকুঞ্চন, হয়ত' কিছু বলবে, হয়ত' ক্ষমা চাইবে, কৃত অন্যায়ের জন্য কুণ্ঠা প্রকাশ করবে। চিং ছিল অকলঙ্ক চরিত্র; কিন্তু একমাত্র সন্তানের ক্ষুধার কান্না ওকে আজ এই পথে বের ক'রেছে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল চিং, মুখ খুলল না, বুঝি পারল না। ওর বুকের মধ্যে ছিল এক মুঠো বীন্, ওয়াঙের ঘর থেকে হরণ করা। পাছে ওগুলো ফিরিয়ে দিতে হয়, সেই ভয়ে মুখ খুলল না। ওয়াঙের দিকে ক্লিষ্ট, নীরব, বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেল।

ওয়াং দাঁড়িয়ে রইল আঙিনায়, যেখানে বছরের পর বছর ফসল মাড়াই ক'রে ঘরে তুলেছে। আজ শূন্য আঙিনা, নেই ফসল, নেই ফসল-মাড়াইয়ের আনন্দোচ্ছল কলগুঞ্জন, নেই সে স্পন্দন—শূন্য অঙ্গন মৃতের মত পড়ে আছে সামনে। কণামাত্র খাবারও নেই ঘরে। অসহায় বৃদ্ধ, অবোধ শিশুগুলির মুখে

আজ কি তুলে দেবে ওয়াং? কি দিয়ে ওলান্‌এর দেহ-পুষ্টি হবে। ওলান্‌এর দেহান্তরলীন সৃষ্টির সম্ভাবনাটিকে পুষ্ট ক'রে তোলার দায়িত্বও যে ওরই। নইলে বাঁচবে না ওলান্—নূতন এই সৃষ্টির বীজ তার জীব-ধর্মে নিষ্ঠুর ভাবে মাতৃদেহ হ'তে রস শোষণ ক'রে বর্ধমান জীবনের দাবী মেটাচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে ওর সমস্ত রক্ত হিম হ'য়ে যেন জমাট বেঁধে গেল মুহূর্তের জন্য, তার পরক্ষণেই কোমল সুধার মত সান্ত্বনার স্নিগ্ধ ধারা ওর ভয়-কুঞ্চিত ধমনীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যেন ব'য়ে গেল। সব গেছে যাক। কিন্তু ওর মাটি কে কেড়ে নেবে? ওর দেহের শ্রম আর মাটির ফল ও এমন জায়গায় রেখেছে যা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। অর্থ থাকলে এখনি ওরা লুটে-পুটে নিত। অর্থের বিনিময়ে পাওয়া আর কোনো বস্তু ঘরে থাকলেও আজ ওদের হাতে পড়তই। আজ ওয়াঙের আর কিছু নেই, কিন্তু সব গিয়েও রইল ওর মাটি—সর্ব-পালিকা, ধাত্রী-ধরিত্রী যা একান্ত ক'রে ওর আপনার, ওর লালিকা, ওর পালিকা।

নয়

দাওয়ায় বসে ওয়াং ভাবে—কিছু একটা করা দরকার। এমন নিষ্ঠুর শূন্যতার মধ্যে কেবল মরণকে আঁকড়ে পড়ে থাকা চলে না। ওর কঙ্কালীভূত দেহের মধ্যেকার ধুকধুকে প্রাণটুকুতে বেঁচে থাকার দুর্বার বাসনা। জামাটার দিকে তাকিয়ে দেখে ওয়াং. ক্রমেই ঢিল হয়ে যাচ্ছে। যে মুহূর্তে ও সবে বৃহত্তর জীবনের দোরগোড়ায় পা দিয়েছে, সেই মুহূর্তে জীবনটাই খ'সে প'ড়ে যাবে এমনি অর্থহীন ভাবে ভাগ্যের ক্রূরতায়! এ হবেনা কিছুতে, হবেনা, না-না—। ক্রূর ভাগ্যটার প্রতি একটা ভাষাহীন ক্রোধ উদ্দাম হয়ে ওর চিত্তকে মথিত বিপর্যস্ত করে তোলে প্রায়ই। ওয়াং থাকতে পারেনা। ছুটে বেরিয়ে আসে শূন্য আঙিনায়—বদ্ধ মুষ্টি ছুঁড়ে মারে আকাশের দিকে, আকাশ তার মেঘহীন জ্বালাময় নীলের বিস্তার নিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে বোকার মত। পাগলের মত চীৎকার ক'রে ওঠে ওয়াং: 'শয়তান, শয়তান! শয়তান তুমি বুড়ো—ওপরে বসে মজা দেখছ।'

নিজের কথায় নিজেই হয়ত' শিউরে ওঠে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই গুমরে ওঠে: 'আর কি করবে, বলো বাকী কি রেখেছ—সবতো নিয়েছ, রাক্ষস।'

একদিন দুর্বল পা দুটো টেনে নিয়ে গেল ক্ষেত্রদেবতার মন্দিরে। থুথু ফেল্‌ল দেবতার গায়ে। আজ জ্বলছে না দীপ—হয়ত বহুকাল জ্বলেনি। মূর্তির কাগজের পোষাক ছিঁড়ে গেছে, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মাটি। কিন্তু এত দৈন্যের মধ্যেও দেবতা বিকারহীন। অবিচলিত তার ঔদাস্য। ওয়াং রাগে দাঁত কড়্‌মড়্‌ ক'রতে ক'রতে বাড়ী ফেরে। চাপা ব্যথায় গোঙরাতে গোঙরাতে শুয়ে পড়ে গিয়ে।

এখন কেউ আর বিছানা ছেড়ে ওঠেনা বড় একটা। ওঠার প্রয়োজনও নেই। শুয়ে থাকলো বিকারগ্রস্ত তন্দ্রার ঘোরে অচেতনের মত—ক্ষুধার জ্বালা তবু খানিকক্ষণ মনে থাকেনা। শুকনো ভুট্টার খোপ্‌নাগুলোও ফুরিয়েছে, গাছের ছাল ফুরিয়েছে—শীতের স্পর্শহীন পাহাড়ের গায়ে যা দু' একটা ঘাস আছে তাই এখন মানুষের সম্বল। চারদিক নিঝুম—যেন গোটা গ্রামখানা মরে গেছে। মাঠ ঘাট পথ সব শূন্য—কুকুর মুরগীও দেখবে না কোথাও একটা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শূন্য পেট বাতাসে ফুলে ঢোল হয়েছে। ওদের কাউকে আর গাঁয়ের রাস্তায় ছুটোছুটি ক'রে খেলা করতে দেখা যায় না। ওয়াঙের ছেলে দুটি হামা দিয়ে কোনোমতে দোরগোড়ায় এসে একটু রোদে বসে। নিষ্ঠুর রোদ, তার নিষ্ঠুর এ দাহের যেন আর অবসান নেই। বেচারাদের সেই সুডৌল হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ আর নেই—কয়েকখানি জীবন্ত কঙ্কাল মাত্র। কেবল এক ফুলো পেটটি ছাড়া, সারা শরীরময় জেগে উঠেছে খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট হাড়।

বসার বয়স পার হ'য়ে যায়, মেয়েটা বসতে পারে না। ছেঁড়া কাঁথাখানায় শুয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নালিশ করে না। প্রথমটা সারা দিন রাত কাঁদত' —রাগের কান্না, ক্ষিদের কান্না, সারা বাড়ীটা ওর কান্নায় ঘোলাটে হ'য়ে থাকত। এখন আর ও কাঁদে না। মুখে যা পড়ে, দুর্বল ভাবে চোষে। বিশীর্ণ, গর্তসংকুল মুখখানা বাড়িয়ে সকলের দিকে চায়। ছোট ঠোঁট দুখানি শুকিয়ে নীল হ'য়ে দন্তহীন বৃদ্ধের ঠোঁটের মত বসে গেছে। কোটরে বসে-যাওয়া কালো চোখ দুটির সে কি করুণ দৃষ্টি! ক্ষুদ্র ক্ষীণ ওই প্রাণের অণুটুকুর পৃথিবীকে আঁকড়ে থাকার কি করুণ প্রয়াস। ওতেই তো ওয়াং মেয়েটার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। ও যদি ওই বয়সের সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত হ'তো, অমনি চোখ মুখ ভরা হাসি, দেহ ভরা স্বাস্থ্যের লাবণ্য, তাহ'লে হয়ত' ওয়াং ওদিকে ফিরেও চাইতো না—কেননা, ও যে মেয়ে! কিন্তু এখন ওয়াং বার বার ফিরে ফিরে

দেখে ওই অভাগা মেয়েটাকে, স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সর্বাঙ্গ ওর অভিষিক্ত ক'রে দেয়, কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সহস্র আদরের নামে ডাকে।

দন্তহীন মুখে সেদিন হাসির একটু করুণ প্রচেষ্টা ফুটে উঠল মেয়েটির। দেখে ওয়াং ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। নিজের অস্থি-সার পরুষ হাতে মেয়ের শীর্ণ কচি হাতখানা আলতো ক'রে তুলে নেয়। ওয়াঙের তর্জনটা ওর ছোট্ট মুঠোখানির মধ্যে এলিয়ে পড়ে থাকে। সেই থেকে মাঝে মাঝেই শিশুর নগ্ন দেহটা নিজের কোটের মধ্যে বুকের ক্ষীণ উষ্ণতার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় পুরে নিয়ে বসে থাকে দাওয়ায় শুকন মাঠগুলির নিস্ফল বিস্তৃতির দিক চেয়ে।

ওয়াঙের বাবার অবস্থাই যা হোক ওর মধ্যে একটু ভালো আছে, কেননা, খাবার যা জোটে—তাকেই আগে দেওয়া হয়। নিজের পিতৃনিষ্ঠায় ওয়াং নিজেই মনে মনে গর্ব বোধ করে। কেউ বলতে পারবে না দুর্দিনেও সে বুড়ো বাপকে ঠেলেছে। যে করেই হোক বাপকে ও খাওয়াবেই। গায়ের মাংস কেটে হ'লেও খাওয়াবে।

বুড়োরও কোনো চিন্তা নেই। যা পায় খেয়ে রাত দিন সে বসে বসে ঝিমোয়। দুপুরে চৌকাঠের কাছে একটু রোদে এসে বসে হামাগুড়ি দিয়ে। ওটুকু শক্তিই কেবল আছে এখনও। সেদিন ভাঙ্গা গলায় বুড়ো বলল :

'এ আর কি আকাল দেখছিস্। আকাল হ'লো সেবারে। বাপ মা পেটের জ্বালায় নিজের ব্যাটাকে কামড়ে খেলে। নিজের চোখে দেখেছি।' ওর গলার স্বর কেঁপে ওঠে, ফাটল ধরা বাঁশের মধ্যে বাতাস যেমন কেঁপে কেঁপে যায়।

'ব'লোনা, ব'লোনা—' ওয়াং আতঙ্কে চীৎকার ক'রে ওঠে—'আর ব'লোনা, —ওসব রাক্ষুসে ব্যাপার এ বাড়ী হ'তে দেব না, জান থাকতে কক্‌খনও দেব না, দেখে নিও।'

একদিন চিং এসে উপস্থিত। চেনা যায় না—এমন হ'য়েছে তার। এ যেন মানুষ নয়,—মানুষের একটা ক্ষীণ ছায়া মাত্র। শুকনো ঠোঁট দু'খানিতে মাটির কালো ছায়া। ওয়াঙের কাণে কাণে সে বলে :

'সহরে তো লোকে কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, পাখী, যা হাতের কাছে পাচ্ছে খাচ্ছে। আমরাও তো এদিকে ঘাস, পাতা, মায় গাছের ছাল অবধি উজাড় করেছি। হালের বলদ সুদ্ধ পোড়া পেটে গেছে। এখন কি খাবো বলতে পারো ?'

কি বলবে ওয়াং ? বলার মত ও কিছু খুঁজে পায়না ; নিদারুণ অসহায়তায়

কেবল মাথা নাড়ে। বুকের মধ্যে র'য়েছে মেয়েটার কঙ্কাল-সার শরীরটা। ওয়াং ওর শীর্ণ কালো মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখে। বিষাদ-গম্ভীর তীক্ষ্ণ চোখ দুটির পলক-হীন চাওয়া যেন ওয়াঙের সারা মুখ জুড়ে আছে। চোখে চোখ পড়লেই মেয়েটার ঠোঁটের কোণে হাসির একটু আভাস কেঁপে উঠেই মিলিয়ে যায়। ওয়াঙের পাঁজরটা কে যেন ভেঙ্গে মুচ্‌ড়িয়ে দিয়ে যায়।

চিং গলা বাড়িয়ে আনে কাছে, আরো কাছে।—'আমাদের গাঁয়েই মানুষের মাংস খাচ্ছে কতজনে,' চিং বলে : 'শুনছি তোমার কাকা খুড়ীও তাই করছে। নইলে ওরা এতদিন টিকে আছে কি ক'রে? শুধু টিকে আছে? দিব্যি চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে। এমনিতেই লোকটার দুবেলা খাওয়া জুটতোনা জানতাম।'

কথা ব'লতে ব'লতে চিং আরো এগিয়ে আসে; মূর্ত মৃত্যুর মত মাথাটা যেন তার। ওয়াং চম্‌কে পেছনে সরে যায়। পাছে, মেয়েটার একেবারে কাছে চিংএর চোখ দুটো এসে পড়ে। কি বীভৎস দেখায় লোকটাকে। একটা অজানা আতঙ্কে ওয়াঙের সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। হঠাৎ উঠে পড়ে, যেন কোন বিপদ সামনে এসে পড়েছে।

চীৎকার ক'রে বলে: 'আমরা এ গাঁ ছেড়ে দক্ষিণ দেশে চ'লে যাব। এতবড়ো জায়গাটায় যেদিকে চাও খালি উপোসী মুখ। কিন্তু ভগবান কি এত নিষ্ঠুর? সব মানুষকে একেবারে মারবেন।'

ধীর ভাবে ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত স্বরে চিং বলে: 'তোমার কাঁচা বয়স ভাই। আমার বয়স অনেক বেশী। আমরা স্ত্রী পুরুষ দুজনেই বুড়ো হ'য়েছি। সবই তো গেছে আমাদের। থাকার মধ্যে একটা মেয়ে—আমরা ম'রে গেলে কারো কিছু যাবে আসবে না।' 'আমার চাইতে তোমার কপাল অনেক ভালো', ওয়াং বলে: তিন তিনটে বাচ্চা, বুড়ো বাপ, নিজেরা দু'জন, এতগুলো পুষ্যি আমার। তায় আবার আর একটা বাড়ল বলে। আমার না বেরিয়ে উপায় নেই, যেতেই হবে, নইলে কোনদিন হয়তো পেটের জ্বালায় স্বভাব ভুলে বুনো কুকুরের মত নিজেদেরই খেয়ে বসব।'

৮ ওয়াঙের মনে হ'ল ও খুব ঠিক কথাই বলেছে। চীৎকার ক'রে ডাকে ওলান্‌কে। ওলান্ আজকাল বিছানা ছেড়ে বড় একটা ওঠে না। উঠে করবেই বা কি—ঘরে খাবার মত একটা দানাও নেই, কাঠও নেই, কাজেই না আছে উনুন ধরানো, না আছে রান্না বান্না।

'চলো আমরা দক্ষিণে চলে যাই।' হেঁকে বলে ওয়াং।

ওয়াঙের স্বরে অমন খুসির সুর অনেক দিন শোনা যায়নি। ছেলেরা আগ্রহ ভরে ওর দিকে তাকায়; বুড়ো হামা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ওলান্ তার অসীম দুর্বল দেহটাকে টেনে এনে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। বলে: 'তাই চলো, অন্ততঃ চলতে চলতে মরতে পারব।'

ওলান্‌এর জঠরস্থ সন্তান একটা গ্রন্থিল ফলের মত ঝুলে আছে। বেচারার সারা মুখে একতিলও মাংস নাই, চামড়ার নীচে হাড়গুলো পাহাড়ের চূড়ার মত মাথা উঁচিয়ে আছে। ওলান্ বলে: আচ্ছা, কাল পর্যন্ত সবুর কর। কালের মধ্যেই খালাস হ'য়ে যাব, পেটের মধ্যে নড়া চড়া দেখে বেশ বুঝতে পারছি!'

'বেশ তাই হবে।'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বড় মায়া হয়। বেচারী! আবার আর একটা প্রাণীর বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হচ্ছে!

চিং তখনও দুয়ারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ব'লতে মুখে সরে না, জোর ক'রে ওয়াং ওকে বলে: 'এতটুকু খাবার দিয়ে বৌটার জান বাঁচাও ভাই, দোহাই তোমার। আমার বাড়ী ডাকাতি ক'রতে এসেছিলে সে সব কথা ভুলে যাব—ভুলে যাব।',

লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে যায় চিং। ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে বলে: সেদিনকার ব্যাপারের পর থেকে তোমার কথা মনে আনতে লজ্জা পাই। কিন্তু তোমার কাকা ব্যাটাই তো লোভ দেখালে। সারা গাঁয়ে ব'লে বেড়িয়েছে, তুমি নাকি মেলাই ধান গম সব লুকিয়ে জমা ক'রে রেখেছ। এই আকাশ সাক্ষী, তোমায় বলছি আমার বেশী নেই, ক'মুঠো লাল ধানের দানা আছে। দুয়ারের কাছে পাথরটার তলায় পুঁতে রেখেছি। শেষ সময়ের জন্য রেখেছিলাম। মরবার সময় পেটটা যেন একেবারে খালি না থাকে, যা হোক একটু কিছু পেটে নিয়ে যেন মরি। ও থেকেই ক'দানা তোমায় এনে দিচ্ছি। আর থেকোনো ভাই এখানে, পারতো কালই বেরিয়ে পড়। আমি ভিটে কামড়েই পড়ে থাকব। একটা ছেলেও নেই, কার জন্য আর পেছু টান? আমি বাঁচলেই বা কি, আর মরলেই বা কি?'

চিং চ'লে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ফিরে এল, রুমালে বাঁধা মাটি মাখা কয়েকটা বীন্ হাতে। খাবারের গন্ধ পেয়ে ছেলেরা কোলাহল জুড়ে দেয়। কিন্তু ওয়াং তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বীন্ ওলান্‌এর কাছে নিয়ে

যায়। খাওয়ার একটুও ইচ্ছা নেই, কিন্তু জোর ক'রে কয়েকটা দানা একটু একটু ক'রে চিবিয়ে খায় ওলান্। খেতে হ'ল ওকে। ও বুঝতে পেরেছে প্রসবের সময় এগিয়ে এসেছে, কিছু না খেলে প্রসবের কষ্ট ও সইতে পারবেনা।

কয়েকটি বীন্ ওয়াং হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে লুকিয়ে। চিবিয়ে চিবিয়ে লালা দিয়ে নরম ক'রে মেয়েটার ঠোঁট ঠোঁটে রেখে জিভ দিয়ে একটু একটু ক'রে ঠেলে মুখের মধ্যে দিতে লাগল ছোট ঠোঁট দুটি একটু একটু ক'রে নড়ে— ওয়াং তাকিয়ে দেখে। ওর নিজেরই যেন পেট ভ'রে ওঠে।

রাতে ওয়াং মাঝের ঘরে রইল। খোকারা তাদের ঠাকুর্দার কাছে। ওলান্ আঁতুড়ে একাই রয়েছে বরাবরের মত। প্রথমবারের মত উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বসে আছে ওয়াং। এমন সঙ্কটের সময়টাতেও ওলান্ ওকে কাছে থাকতে দেবে না। পুরোণো বালতিটার মধ্যে ওর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। তারপর ও হামা দিয়ে অতবড় ব্যাপারটার ক্ষুদ্রতম চিহ্নও অবলুপ্ত ক'রে দেবে, পশুরা যেমন ক'রে চেটে চেটে শাবকের গা হ'তে প্রসবের সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছে দেয়।

উদগ্রীব প্রতীক্ষা। এই বুঝি কচি গলার তীক্ষ্ণ কান্না আসে। এ কান্নার সাথে ওয়াঙের কত কালের পরিচয়। ও চেনে এ কান্না। কিন্তু আজ এ প্রতীক্ষায় আনন্দ নেই, আজ গভীর নৈরাশ্যে ওর হৃদয় ছেয়ে আছে। ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক্ কিইবা এমন তফাৎ, যাই হোক্ না কেন, একটা পেট বাড়বে, তারও আহার জোটাতে হবে। ওয়াং মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকে: 'মরা যেন হয় হে ঠাকুর—'

সেই মুহূর্তেই একটা অতি ক্ষীণ কান্নার স্বর কাণে আসে,—ওঃ কি ভয়ানক ক্ষীণ! ক্ষণিকের জন্য শব্দটা যেন ঘরের নিস্তব্ধতার গায়ে ঝুলে থাকে।

প্রবল তিক্ততায় ওয়াং মনে মনে বলে: 'না সংসারে দয়া মায়া নেই কারো একফোঁটা—'

শব্দটা একবার হ'য়েই একেবারে থেমে গেল। তারপর আবার দুঃসহ, জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা থম্ থম্ ক'রে ওঠে। কিন্তু এমনি নিথর নিস্তব্ধতা তো কতদিন থেকেই বাড়ীটার বুক চেপে আছে। তবুও হঠাৎ আজ ওয়াঙের কেমন অসহ্য বীভৎস মনে হয়। বড় ভয় করে।

উঠে ওলান্‌এর দরজায় মুখ রেখে ডাকে: 'ভালো আছতো?' নিজের গলার স্বরে একটু সাহস ফিরে যেন পায়।

কাণ পেতে থাকে উত্তরের প্রত্যাশায়। আচ্ছা ওয়াং তো এখানে বসে আছে, ওলান্ যদি ওঘরে ম'রে গিয়ে থাকে। না,—ঐ তো খস্ খস্ আওয়াজ আসছে। ঐ তো ওলান্ নড়া চড়া ক'রছে।

'এস।' ওলান্ শুয়ে, একেবারে বিছানার সাথে মিশে গেছে। কিন্তু পাশে শিশু কই। ওলান্ একা কেন ? ওয়াং জিজ্ঞাসা করে।

হাতের অতি দুর্বল সঞ্চালনে ওলান্ দেখায়—মেজের উপর শিশুর মৃতদেহ।

'মরে গেছে ?' চীৎকার ক'রে ওঠে ওয়াং।

'হ্যাঁ।' ফিস্ ফিস্ ক'রে ওলান্ জবাব দেয়।

ওয়াং নীচ হ'য়ে দেহটা পরীক্ষা করে—শুকন চামড়ায় আঁটা কখানা হাড় মাত্র, এই একমুঠো, এতটুকু একটু শরীর।

মেয়ে।

ওয়াঙের মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসে : 'এই মাত্র যে কান্না শুনলাম।' কিন্তু সাম্‌লে যায়। ওলান্‌এর মুখের দিকে চায়—মড়ার মত প'ড়ে আছে মেয়েটা, চোখ বন্ধ, মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই, ছাইয়ের মত সাদা। চাম্‌ড়ার তলা হ'তে খোঁচা খোঁচা হাড় বেরিয়ে আছে। মুখে এতটুকু শব্দ নেই, অবসাদে মড়ার মত এলিয়ে পড়ে আছে ওলান্। ওয়াং কিছু ব'লতে পারে না, স্তব্ধ হ'য়ে যায়। ও তো কেবল নিজের দেহের বোঝাই বয়। কিন্তু এই মেয়েটা। এই ক'মাস কি অপরিসীম দুঃখই না সয়েছে। দিনের পর দিন অনাহার, তার ওপর জঠরের ঐ বুভুক্ষু প্রাণীটা বেঁচে থাকার দুর্দম প্রয়াসে ওকে কুরে কুরে খেয়েছে—!

কিছু বলতে পারে না ওয়াং। নিঃশব্দে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। খুঁজে পেতে একটা ছেঁড়া মাদুরের টুকরো বের ক'রে তাতেই ওটা জড়িয়ে নেয়—মাথাটা ওদিক এলিয়ে পড়ে। হঠাৎ ওয়াঙের চোখে পড়ে—শিশুর গলায় দুটো নীল দাগ। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্তব্যে মন দেয় ওয়াং।

বেশী দূর যেতে পারে না, পা চলে না। পশ্চিমের মাঠের শেষে পাহাড়টার গায়ে কতগুলো পুরোণো ভাঙ্গা ধ্বসা কবর র'য়েছে—পূজাহীন, অপরিচয়ের গ্লানি অঙ্গে মাখা সেগুলোর। তারি মধ্যে একটা ধ্বসে যাওয়া কবরের গর্তের মধ্যে শবটা ওয়াং ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়। সেই মুহূর্তেই কোত্থেকে একটা প্রকাণ্ড বাঘের মত উপোসী কুকুর পেছনে এসে দাঁড়ায়। ওয়াং একটা ঢিল

ছুঁড়ে মারে। কুকুরটার অস্থি-সার গায় ঠন্ করে এসে লাগে ঢিলটা। কিন্তু ক্ষুধায় ওটা মরীয়া হ'য়ে উঠেছে, ঢিল খেয়ে একটু নড়ে বস্‌ল মাত্র।

ওয়াঙের পা যেন অবশ হ'য়ে আসে, দেহের ভার ,আর বুঝি বইবে না। মুখ ঢেকে বাড়ীর দিকেই পা বাড়ায়। নিজের মনে বলে: 'এই ভালো, এই ভালো—' আজই প্রথম নিরাশা ওর সবখানি মন পরিব্যাপ্ত করে, ও যেন ভেঙ্গে পড়ে একেবারে।

নীলের পালিশ লাগানো আকাশে রোজকার মতই সূর্য ওঠে পরের দিন। কাল ও ভেবেছিল ঘর ছেড়ে চলে যাবে সবাইকে নিয়ে,—এই এতগুলি অসহায় শিশু, অক্ষম বৃদ্ধ আর ওই বীত-শক্তি নারী।···আজ মনে হয়, স্বপ্ন, সব স্বপ্ন—কাল ও স্বপ্ন দেখেছিল···

শ'খানেক মাইলেরও বেশী পথ। ···হয়তো পথের পারে রয়েছে সব পেয়েছিরই দেশ। কিন্তু এই নিঃশেষিত-শক্তি দেহগুলোকে কেমন ক'রে অতদূর টেনে নিয়ে যাবে? তারপর সেই অজানা দক্ষিণ দেশ, সেখানে যে খাবার মিলবে, সেখানেও যে এমনতরো দুর্ভিক্ষ নেই, তাই বা কে বলবে? আকাশের দিকে তাকালে তো মনে হয়, ওই জ্বালাময় পিঙ্গল বিস্তারের বুঝিবা শেষ নেই,···চলে গেছে পৃথিবীর প্রান্তরেখা পর্যন্ত···সব শক্তি ক্ষয় ক'রে তো যাব—হয়তো পড়ব গিয়ে আরো বেশী দুর্ভিক্ষের দেশে, হয়তো দেখব, চারদিকে আরো বেশী উপবাসীর ভীড়···

না, না, তার চেয়ে এই ভালো.···যেমন আছি তেমন,—অন্ততঃ বিছানায় শুয়ে আরাম ক'রে তো মরতে পারব।

দাওয়ায় ব'সে এমনি কথাই ভাবে ওয়াং।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুক্‌ন উষর ক্ষেতগুলির দিকে, একটা বিচিত্র কাঠিন্যে ধূ ধূ করে ক্ষেত-গুলো। একটি তৃণও নেই কোথাও,—কেড়ে খুঁড়ে তুলে নেওয়া হয়েছে সব···যা কিছু খাদ্য ব'লে অন্ততঃ মুখে পোরা চলে, যা কিছু উনুনে দিয়ে জ্বালানো চলে,···সব, সব—।

পুঁজিও শূন্য—শেষ কপর্দকটিও এই ক'দিন আগে গেছে। আর থাকলেই বা লাভ কি ছিল? অর্থ দিয়েই কি আহার মিলবে? ওয়াং শুনেছে সহরে বড় লোকেরা খাবার জিনিস পুঁজি করে রাখে—কতক নিজেদের জন্য, কতক বেশী দামে বেচবে বলে। এককালে ওর রাগ হত। আজ আর হয় না।

পারবে না ওয়াং, কোনো মতেই হেঁটে সহরে যেতে পারবেনা—। বিনা পয়সায় পেট ভ'রে খেতে পাবার লোভেও না।··· তাছাড়া সত্যি ক্ষিদেও আজ তেমন নেই।

প্রথমটায় ওর মনে হতো—পেটের মধ্যে অহর্নিশি কি যেন কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। এখন সে-সব থেমে গেছে। এখন ও মাঠ থেকে মাটি খুঁড়ে এনে সম্পূর্ণ নির্লোভ হ'য়ে জল দিয়ে গুলে ছেলেদের মুখের কাছে ধরতে পারে। মাটি—কদিন ধরে ওরা ওই মাটিই খাচ্ছে জল দিয়ে গুলে—মাটি নয় করুণাময়ী জগদ্ধাত্রী। মাটিই খেতে হচ্ছে, কিছুটা অন্ততঃ পুষ্টির শক্তি আছে মাটির—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত' প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তা ছাড়া জল দিয়ে গুলে খানিকটা মাটি খেয়ে ছেলে দুটো ক্ষিদের জ্বালাও তো ভুলে থাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণ—আর হাওয়ায় ফুলো শূন্য পেটগুলোতে যা হোক্ কিছুতো পড়ে।

ওলান্‌এর হাতে বীন্‌এর কটা দানা এখনও রয়েছে, ওয়াং কিছুতেই ওর একটাও ছোঁবে না নিজে। অনেকক্ষণ পরে পরে ওলান্ একটি একটি দানা নিয়ে আস্তে আস্তে চিবোয়। চিবুনর শব্দ ওয়াঙের কাণে আসে। বেশ লাগে,··· ওয়াং যেন সান্ত্বনা পায়।

দাওয়ায় ব'সে থাকে ওয়াং, চার পাশে নিরাশার রক্তহীন আঁধার, আশার এতটুকু রশ্মি চোখে পড়ে না।···সেই ভালো, সেই ভালো···বিছানায়ই শুয়ে থাকবে ওয়াং, ঘুমিয়ে পড়বে,···সুপ্তির পথ বেয়ে মরণ আসবে চুপি চুপি···।

কেমন যেন ভালো লাগে একথা ভাবতেও। স্বপ্নময় আবেশে ওর মন ছেয়ে যায়।

মাঠ পেরিয়ে কারা যেন ওর দিকেই আসে। কাছে এলে ওয়াং চিনতে পারে—একজন ওর কাকা, অন্যদের ও চেনে না। যেমন ছিল তেমনি ব'সে থাকে। স্বরে জোর ক'রে খুসীর সুর টেনে ওয়াঙের কাকা বকে: 'ওঃ কতদিন দেখিনি তোদের। বেশ ভালোই তো আছিস্ দেখছি। কই, দাদা কই? কেমন আছে?' ওয়াং তাকিয়ে দেখে কাকা একটু রোগা হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু উপোসী চেহারা নয়। ওয়াঙের খিন্ন বিশীর্ণ দেহের ক্ষয়িত শক্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল আজও, সংহারিণী মূর্তি ধ'রে ভেঙ্গে পড়তে চায় এই লোকটার ওপর। কিন্তু উপায় নেই—নিজের মনে গোঁ গোঁ ক'রে বলে: 'তোমরা খাও, পেট ভরে খেতে পাও—।' অন্য লোকগুলোর দিকে ও তাকিয়েও দেখে না—ও খালি দেখে, কাকার হাড়ের ওপর মাংস লেগে আছে তখনও।

—'হুঁঃ খাওয়া। খাচ্ছি বৈকি।' চোখ দুটো বড় বড় ক'রে আকাশের

দিকে দুই হাত ছুঁড়ে কাকা চাৎকার করে : 'যা না, গিয়ে দেখ্ একবার আমার ওখানে। একটা চড়াই পাখীও দানাটা খুঁটে পাবে না। তোর খুড়ী—মনে আছে তো কেমন মোটা ধুম্সো গতরখানা ছিল তার! কেমন চেক্নাই ছিল চেহারার। আর এখন চাম্ড়াখানা ঝুল্ ঝুল্ করছে, যেন খোঁটার গায়ে একটা জামা ঝোলান। নড়লে চড়লে চামড়ার খোলের মধ্যে হাড্ডিগুলো খট্ খট্ ক'রে বাজে। সাত সাতটা ছেলে মেয়ে ছিল, ছোট তিনটেই পটল তুলেছে। আমার হাল তো চোখেই দেখছিস্।' ব'লে জামার আস্তিনে চোখদুটি সাবধানে মুছে নিল।

'খাও, খাও, তোমরা খেতে খাও।' নিষ্প্রাণ ভাবে ওয়াং বলে।

ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে কাকা বলে : 'তোর আর দাদার কথা ছাড়া আর কি আমার মনে কোনো চিন্তা ছিল! বিশ্বাস তো করবিনে। কিন্তু আজ সেইটেই প্রমাণ করব। আজকাল কে-ই বা খেতে দেয়! এই এরা লোক ভালো তাই খাবার ধার দিলে তবু। এরা লোক খুব ভালো, সহরেই থাকে। খেয়ে দেয়ে গায়ে একটু বল হ'লে আমাদের এ গাঁ থেকে এদের কিছু জমি যোগাড় ক'রে দেব বলেছি। আমার প্রথমেই মনে হ'ল তোর কথা। তোর তো মেলাই ভালো ভালো জমি আছে। এখন আর ও রেখেই বা কি হবে? মাটি খেয়ে তো আর জান বাঁচেনা। ট্যাঁকে পয়সা থাকলে তবু কাজ দেয়। আমি বলি কি জমিগুলো তুই ছেড়ে দে, এরা লোক ভালো, ভালো দামই দেবে। টাকা পেলে খেয়ে প্রাণ বাঁচবে, বুঝলি?'

ওয়াং একটুও নড়ল না, এক ভাবেই বসে রইল। আগন্তুকদের যে দেখেছে তা ওর ভাবে মনে হ'ল না। একবার কেবল চোখ তুলল, এরা সহর থেকেই এসেছে বটে। পরণে সিল্কের ঝোলা পোষাক, একটু ময়লা। নরম তুলতুলে হাত, হাতে লম্বা নখ, স্বচ্ছন্দ-ভোজন-পরিপুষ্ট চেহারা, স্নায়ুতে তাজা রক্তের বেগমান প্রবাহ। হঠাৎ এই লোকগুলির ওপর ওয়াঙের মনে প্রবল ঘৃণা জেগে ওঠে। সুপ্রচুর পান-ভোজন-পুষ্ট সহরের কীটগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে, আর ওর সন্তানেরা ক্ষেতের মাটি খুঁড়ে খেয়ে পেটের আগুনকে চাপা দিচ্ছে। নিদারুণ দুর্গতির সুযোগ নিয়ে এ মানুষগুলো এসেছে ওর জমি কেড়ে নিতে। ওয়াঙের দৃষ্টিতে ক্রোধের বহ্নি শিখা জ্বলে ওঠে। কঙ্কালীভূত মুখের মধ্যে গভীর কোটর-প্রবিষ্ট চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসিতে চায়। 'জমি বেচবনা আমি'—দৃঢ়ভাবে ওয়াং বলে।

কাকা দু'পা এগিয়ে আসে। এর মধ্যে ওয়াঙের মেজ ছেলেটি হামা দিয়ে দরজার কাছে এসে বসেছে কখন। হাঁটবার শক্তি নেই, দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে গেছে যেন আবার।

বৃদ্ধ ওকে দেখে বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে ও'ঠে: 'এমনি হাল হয়েছে? সেই নাদুস্ নুদুস সুন্দর ছেলেটা? একেই তো সেবার একটা পেনি দিয়েছিলাম না?'

সকলের দৃষ্টি পড়ল ছেলেটার দিকে। এতদিন ওয়াঙের চোখে জল আসেনি—আজ হঠাৎ ওর এতদিনকার রুদ্ধ বেদনা পাকিয়ে পাকিয়ে গলার কাছে উঠে এসে গলে গলে আঁখির পথে নেমে এসে বক্ষ প্লাবিত ক'রে দিল। ধীরে ধীরে চাপা স্বরে ওয়াং জিজ্ঞাসা করে: 'কি দাম দেবে তোমরা?'

তিন তিনটে অসহায় শিশু, এদের খাইয়ে বাঁচাতেই হবে। ওর নিজের আর ওলান্‌এর ভাবনা নেই। ওরা নিজেদের ক্ষেতে আপন হাতে কবর খুঁড়ে তার মধ্যে শুয়ে পড়বে, ধীরে ধীরে মরণের কোলে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু এদের তো একটা ব্যবস্থা করা চাই।

আগন্তুকদের মধ্যে চোখ-কাণা লোকটি বলে: 'তা এ ছেলেটার মুখচেয়ে এ সময়কার সাধারণ বাজার দরের চাইতে কিছু বেশীই দোব তোমায়। এই ধর', কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে: 'ধর, একর প্রতি একশ' পেনি দেব।'

ওয়াং তিক্তভাবে হেসে জবাব দেয়: 'তার চেয়ে জমিগুলো ভিক্ষে চাও বলেই হাত পাতনা কেন? ওর বিশগুণ দামে যে কিনেছি হে।'

'তা, হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। তবে কি জানো? দুর্ভিক্ষ লাগলে মানুষ যখন না খেতে-পায় ধুক্‌পুক্ করে তখন অন্য রকম কথা হয় বৈকি...' বেঁটে উঁচু নাক-ওয়ালা লোকটা বলে। ওর স্বরে কেমন একটা অস্বাভাবিক স্পষ্টতা ও প্রাখর্য।

ওয়াং তিনজনের দিকেই তাকায়। হুঁ! এরা ভেবেছে ওয়াং দায়ে ঠেকেছে, সুতরাং ওকে এরা বাগে পেয়েছে। বুড়ো বাপ ছেলেরা না খেয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে—কাজেই সব কিছুতেই রাজি হবে ওয়াং? তাই না? পরাভবের অসহায়তা উবে গিয়ে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ ওর সারা মন পরিব্যাপ্ত ক'রে দিল। ও লাফিয়ে উঠে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত আগন্তুকদের দিকে ধেয়ে গেল।

'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, জমি বেচবো না আমি। মাটি খুঁড়ে খাওয়াব ছেলেদের, হ্যাঁ, তাই খাওয়াব। ওরা মরলে এই মাটিতেই কবর দেব। আমরা সব—বৌ, বাবা, আমি, সব এ মাটিতে শুয়েই চোখ বুজব। এ মাটির কোলেই জন্মেছি—এখানেই মরব·

প্রবল কান্নায় ওর সমস্ত শরীর মথিত হয়ে ওঠে। সমস্ত ক্রোধ যেন হঠাৎ দমকা বাতাসে উড়ে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকুলভাবে কাঁদে, সমস্ত শরীর প্রবল ভাবে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে—লোকগুলো আর কাকা মুচকি মুচকি হাসে; ওদের মনে কোন ছাপই পড়ে না। ওদের চোখে এসব নেহাৎ পাগলামো, ভাবালুতা, এক্ষুণি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হঠাৎ ওলান্ দরজা ঠেলে বাইরে এসে লোকগুলোকে লক্ষ্য ক'রে বলে—সেই সাধারণ ব্যঞ্জনাহীন স্বর, এ যেন রোজকার ব্যাপার, তার বেশী কিছু নয়—: 'জমি আমরা বেচব না গো, বেচলে এখন নয় কড়ি হবে, তারপর—ফিরে এসে খাব কি? আসবাবগুলো বেচতে পারি, টেবিল আছে একটা, দুটো চৌকি, বিছানাটা, চারটে বেঞ্চি, বড় কড়াটা, এই সব নিতে চাও ত' দিতে পারি। হালের যন্ত্রপাতি, বা জমি কিছুই বেচবনা। নিতে হয় নাও, নয় চলে যাও বাপু, ঝামেলা করো না।'

ওলান্এর ভঙ্গিতে এমন একটা শান্ত গাম্ভীর্য ফোটে যার প্রচণ্ড শক্তির সামনে ওয়াঙের খুড়ো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল:

'সত্যি যাচ্ছ?'

এক-চোখো লোকটা আর তার সঙ্গীদের মধ্যে অস্ফুটস্বরে কি যেন কথাবার্তা হ'ল। তারপর সে বলল: 'ভালো জিনিস তো একটাও নেই, যত সব বাজে জিনিস, পোড়ান ছাড়া আর কোনো কাজে আসবে না। দু'ডলারের বেশী দিতে পারব না। দিতে হয় দাও, নয় থাক।' বলেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওলান্ খুব শান্তভাবে তাদের জানিয়ে দিল: 'ওতো জলের দাম। দু'ডলারে একটা চৌকিও হয় না। তবে দামটা হাতে হাতে পেলে ঐ দামেই জিনিষ ছাড়ব।'

তাই হ'ল। দু'টি ডলার ওলানের হাতে এসে পড়ল। ওরা তিনজনে মিলে ঘরে ঢুকে সব জিনিসপত্র বের ক'রে নিয়ে গেল, মায় উনুনের ওপর থেকে কড়াটা পর্যন্ত। ওয়াঙের কাকা তার দাদার চোখের সামনে আর গেল না। তা ছাড়া শত হ'লেও ভাই তো; তাকে হিঁচড়ে টেনে মাটিতে শুইয়ে বিছানা কেড়ে নেবে এ অপ্রীতিকর দৃশ্যটা নিজের চোখে দেখার সাহসও ছিল না।

খাঁ খাঁ করা শূন্যতার মধ্যে মাঝের ঘরের এক কোণে লাঙলটা আর এক কোণে দুটো কোদাল পড়ে রইল কেবল। ওলান্ স্বামীকে বলল: 'ডলার দুটো হাতে থাকতে থাকতে চলো বেরিয়ে পড়ি—নইলে এরপর ঘরের খুঁটি

বেচতে হবে। ফিরে আসার পর মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না তা'হলে।'

'তাই চলো'—ওয়াং বলে। মাঠের ওপর দিয়ে অপসৃয়মান প্রেতমূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে ওয়াং মনে বার বার বলে : 'আমার মাটিতো রইল—মাটি—।'

দশ

উদ্যোগ নেই, আয়োজন নেই, কেবল ঘরের দরজাটা টেনে, শিকলটা তুলে দেওয়া। কাপড় যা তা পরনেই। দু' ছেলের হাতে দুটো বাটি আর দুজোড়া কাঠি তুলে দিল ওলান্। ওরা পরম আগ্রহে ওগুলো শক্ত ক'রে চেপে ধরে—যেন আহারের সুনিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতীক এরা।

তারপর মাঠের বুক বেয়ে ওরা চলে—প্রেতমূর্তির ছোট একটি শোভাযাত্রা। ধীরে, অতি ধীরে ওরা চলে ; এত ধীরে মনে হয় এই দুর্ভাগারা নগরের প্রাচীর পর্যন্তও পৌঁছুতে পারবে না।

মেয়েটিকে ওয়াং বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। হঠাৎ হুমড়ী খেয়ে পড়ে গেল দেখে, তাড়াতাড়ি খুকীকে ওলান্‌এর কাছে দিয়ে ওয়াং বাপকে কাঁধে তুলে নিল। হাওয়ার মত হাল্কা, বৃদ্ধের শীর্ণ দেহটা। তার ভারেও ওর পা থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে।

কারো মুখে একটি কথা নেই। মন্দিরের পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে। চির-বিকার-হীন দেবতার তেমনি নির্বিকার ঔদাস্য—চলমান জগতের কোনো তরঙ্গ সে ঔদাস্যের কুল ছুঁয়ে যায় না। অত শীতেও দৌর্বল্যের আতিশয্যে ওয়াং কেবলি ঘামছে। হু হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস বয়. শীতে ছেলেরা কাঁদে। ওয়াং ভোলায় : 'কত বড় হয়েছিস তোরা, শীতে কাঁদবি কিরে। চল্, কত নতুন দেশ দেখব, কি চমৎকার জায়গা, কত খাবার। শীত টীত কিচ্ছু নেই সেখানে। সাদা ধব্‌ধবে ভাত আমরা রোজ কেমন সবাই পেট ভরে খাব। কি খোসবাই সে ভাতের!'

একদমে হাঁটা সম্ভব হয় না। হাঁটে—আবার বসে, আবার হাঁটে। সহরের প্রাচীর এসে যায়। গেটের সুরংটার মধ্যেও কন্‌কনে হাওয়ার বেগবান স্রোত, যেন দুই দিকে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বরফের নদী বয়ে চলেছে। এখানে বসে একদিন ওয়াং আতপ্ত দেহ শীতল ক[illegible]—আর আজ তীব্র শীতে ওর

হাড় পর্যন্ত জমে উঠেছে। পায়ের তলায় বরফের কণা মেশান কাদা, তীক্ষ্ণাগ্র কণাগুলো স্থঁচের মত পায়ে ফোঁটে। ছেলেদের খালি পা, এক পা-ও চলতে পারে না তারা।

ওয়াং টল্‌তে টল্‌তে কোনো মতে বাবাকে পার করে আনে। এক এক ক'রে দুই ছেলেকেও তুলে আনে। তারপর একেবারে অবসন্ন হ'য়ে ব'সে পড়ে। সারা গায়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে ঘাম ঝরে। স্যাঁৎস্যাঁতে দেওয়ালের গায়ে দেহ এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে প'ড়ে প'ড়ে হাঁপায় অনেকক্ষণ ধরে। সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। ওর মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপে।

জমিদার বাড়ীর অতি কাছে এসে পড়েছে ওরা। গেট তালা বন্ধ। দু'পাশের ধূসর রংএর সিংহ দু'টোর ওপর কত ঝড় বাতাসের পদচিহ্ন পড়েছে। সিঁড়ির ধাপের ওপর গুড়ি মেরে পড়ে আছে কতকগুলো নর-নারীর ছায়া-প্রায় মূর্তি। তাদের বুভুক্ষা-তীব্র লোভাতুর দৃষ্টি যেন বন্ধ দরজার গায়ে ছোবল মারছে। ওয়াং পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে শোনে, কে একজন বলছে ভাঙ্গা হেঁড়ে গলায়:

'এই বড় মানুষেরা পাষাণ গো পাষাণ। এদের ঘরে কত ভাত, খায়, দু'হাতে ফেলে ছড়ায়, মদ বানায়। আর আমরা না খেয়ে খেয়ে ধুকে ধুকে মরি।'

আর একটা স্বর, যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে: 'হেই ভগবান, দাও, এক লহমার জন্য হাত দু'খানায় একটু শক্তি দাও, আগুন ধরিয়ে দি এই পিশাচ-পুরীতে। পিশাচ। পিশাচ হোয়াং পিশাচ,—বড়লোকেরা সব পিশাচ। চোখের সামনে দেখি মহলগুলো দাউ দাউ ক'রে জলে উঠুক। ছারখার হ'য়ে যাক্ সব। নিজে মরি ক্ষতি নেই।...আর ঐ মাগীরা, হোয়াংএর মত ছেলে যারা পেটে ধরেছে,—মরুক মরুক, ওরাও এই আগুনে পুড়ে মরুক। ওদের নরকেও ঠাঁই হবে না।'

ওয়াং নীরবে এগিয়ে চলে।

সহর পেরিয়ে ওরা যখন দক্ষিণের গেটে আসে, তখন সন্ধ্যা, অন্ধকার নেমে এসেছে। একদল লোকের সাথে দেখা হ'ল। দক্ষিণের যাত্রী তারাও। ওয়াং সবে মাত্র ভাবতে সুরু ক'রেছে রাতটা কোথায় মাথা গুঁজে কাটাবে।

এমন সময়ে হঠাৎ দেখল, ওরা একটা দারুণ ভিড়ের আবর্তে ওলট্ পালট্ খাচ্ছে। একটা লোক এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে ওর ওপর পড়ল। ওয়াং করে জিজ্ঞাসা তাকে: 'এরা সব চলেছে কোথায় বলতে পার?'

লোকটা জবাব দেয়: 'অকাল পড়েছে গো দেশে। আমরা সব না খেয়ে ম'লাম। তাই সব চলেছি দক্ষিণে। ঐ হোথা, সামনের ওই বাড়ীটা থেকে 'আগুন-গাড়ী' ছাড়ে, তাতেই সব যাব। ভাড়া বেশী নয়, এক ডলারেরও কম।

'আগুন-গাড়ী!' চায়ের দোকানে ওয়াং শুনেছে বটে নামটা লোকের মুখে। একটা গাড়ীর সাথে নাকি আর একটা শেকল দিয়ে বাঁধা থাকে। না টানে মানুষে, না গরু ঘোড়ায়। কল না কিসে নাকি চলে। ড্র্যাগনের নিঃশ্বাসের মত কলটা থেকেও নাকি আগুন আর জল বেরয় হুস্ হুস্ ক'রে। অনেকবার ভেবেছে ওয়াং একবার গিয়ে একটু দেখে আসবে। তা ওর কি আর ছাই ছুটি মিলল ক্ষেতের কাজ থেকে! আর দূরও তো কম নয়—সেই উত্তরে ওদের বাড়ী। তারপর অচেনা অজানা, এই বস্তুটার ওপর ওর সন্দেহও ছিল যথেষ্ট।... কাজ কর খাও, বাস তার চাইতে বেশী জানবারই বা আর দরকার কি!

একটু সন্দিগ্ধভাবেই ওলান্‌এর দিকে ফিরে ওয়াং লোকটাকে শুধায়:

'আমরাও যেতে পারবো ওতে?'

ও আর ওলান্ দুজনায় মিলে বুড়ো আর ছেলেদের ভিড়ের চাপ থেকে একটু ফাঁকায় নিয়ে আসে। ভয়ে বিস্ময়ে ওরা কেবল পরস্পরের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়। বৃদ্ধ মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে প'ড়ে গেল। ছেলেরা ধূলায় লুটিয়ে পড়ে,—ওরা আর পারে না। চারপাশে অসংখ্য মানুষের পা, কখন ওদের ওপর এসে পড়ে বা! মেয়েটা ওলান্‌এর বুকে জড়ান, কিন্তু ওর মাথা এলিয়ে পড়েছে, স্তিমিত চোখে পড়েছে মৃত্যুর কালো ছায়া। সব ভুলে ওয়াং ডুকরে কেঁদে ওঠে—একেবারে চলে গেল! ওলান্ মাথা নেড়ে জানায়:

'না, এখনও যায়নি। বুকের কাছে এখনও একটু শ্বাস ধুক্ ধুক্ ক'রছে। তবে রাতটা আর কাটবে না। তা এভাবে থাকলে এটা কেন, সকলেই—'

আর বলতে পারে না। কণ্ঠ-রোধ হয়ে আসে। নিরুপায় দৃষ্টি তুলে ধরে স্বামীর দিকে। শীর্ণ মুখখানা ক্লান্তির গভীর রেখায় বড় করুণ হয়ে ওঠে। ওয়াং কিছু বলার ভাষা খুঁজে পায় না। তাইতো—আর একটা দিন এমনি ক'রে চললে,—ওদেরও আর যে রাত পার হবে না।

কিন্তু তবু স্বরে জোর ক'রে উৎসাহ টেনে এনে বলে ছেলেদের:

'ওরে ওঠ্ তোরা, লক্ষ্মী সোনারা, দাদুকে তোল, এই মজার গাড়ী চড়ে আমরা যাব যে এখন।'

অন্ধকারের বুক চিরে ড্র্যাগনের মত গর্জাতে গর্জাতে কি একটা ছুটে এ'ল। চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। চারদিকে একটা হুঁড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, চীৎকার পড়ে গেল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। ধাক্কাধাক্কিতে ওয়াংরা প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে লাগল, কিন্তু অতি কষ্টে পরস্পরকে তারা আঁকড়ে ধরে রইল। সহস্র উন্মত্ত-কণ্ঠের এলোমেলো চীৎকার মথিত ঘন অন্ধকারের মধ্যে ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে ওরা একটা ছোট দরজা দিয়ে বাক্সর মত একটা ঘরে ছিট্‌কে পড়ল। আপনার জঠরে এতগুলো মানুষকে পুরে নিয়ে তমোময়ী যবনিকা নির্মম হাতে ছিঁড়ে ফেলে দৈত্যটা আবার অজস্র গর্জনে ছুটে চল্‌ল।

এগার

একশ মাইল পথ। ভাড়ার জন্য দুটো ডলার ওয়াং কণ্ডাক্টারের হাতে দিল। কণ্ডাক্টার ফিরিয়ে দিল এক মুঠো পেনি।

গাড়ীটা একজায়গায় এসে থামতেই একটা ফেরীওয়ালা গাড়ীর জানালা দিয়ে নিজের পসরা বাড়িয়ে ধরে। কয়েকটা পেনি দিয়ে ওয়াং চারখানা রুটি আর খুকীর জন্য একবাটি নরম ভাত কিনল। বহুদিন অত খাবার ওরা একসঙ্গে চোখে দেখেনি। পেটে জলন্ত ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মুখে দিতেই খাবার ইচ্ছা উবে গেল। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলেদের সামান্য একটু খাওয়ান গেল। কিন্তু বৃদ্ধকে ভোলাতে হ'ল না। সে তার দন্তহীন মাড়ী দিয়ে পরিপূর্ণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে একটা রুটি নিয়ে চুষতে লাগল। গাড়ীর এলোমেলো গতিতে ভেতরকার মানুষগুলো গড়াচ্ছিল, হুম্‌ড়ি খেয়ে পরছিল এর ওর ওপর। স্বরে আত্মীয়তার সুর লাগিয়ে ওয়াঙের বাবা সবাইকে উপদেশ দেয়: 'না খেলে চল্‌বে কেন? আমি বুড়ো মানুষ কেমন খাচ্ছি দেখছ না। তবে আমার ভুঁড়িটি ক'দিন কাজ না ক'রে একটু কুড়ে হ'য়ে পড়েছেন দেখছি। কিন্তু তাই বলে আমি ছাড়ছিনে। উনি কাজ করতে চাইবেন না বলে আমি শিঙ্গে ফুঁকি আর কি। হুঁ শর্মার কাছে সে সব চালাকী খাটবে না। খাইয়ে তবে ছাড়ব, দেখনা।' এই বিরল শ্মশ্রু, অস্থি-সার, ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধের কথায় সবাই হেসে ওঠে।

ওয়াং খাবারের জন্ত সব পয়সা খরচ করেনি, কিছু রেখে দিয়েছে। অচিন্ জায়গায় একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই ক'রে নিতে হবে তো। তার তো খরচ-পত্র আছে। গাড়ীতে বহু যাত্রী ছিল যারা এর আগে বহুবার দক্ষিণে এসেছে। কেউ কেউ প্রতিবার আসে কাজের খোঁজে। কাজ ক'রে এবং ভিক্ষে খাবার ক'রে খরচাটা বাঁচায়। ক্রমে নূতন স্থানের বিস্ময় কেটে যায় ওয়াঙের। প্রথম প্রথম চলন্ত গাড়ী থেকে ঘুলঘুলির ফাঁকে ও অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখত মাটি কেমন ক'রে ঘুরপাক খায়। এখন এও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন ও সকলের কথাবার্তা শোনার অবকাশ পায়। লোকগুলি এমন পণ্ডিতের মত কথা বলে যেন ওদের চারদিকে কেবল মুখ্যুর দল। হাসি পায় ওয়াঙের।

'ন্ক্কলে প্রথম যেয়েই খানকয়েক চাটাই কিনে ফেলবে,' উটমুখো লোকটা বলে উঁচু গলায়। 'দু দু পেনি ক'রে একটা চাটাই। দরদস্তর ঠিকমত ক'রতে না পারতো তিন পেনি চেয়ে বসবে ঠিক জোচ্চোর ব্যাটারা। আমায় দক্ষিণী কোনো শর্মা ঠকাতে পারে না যত টাকার গুমরই থাক না তার।' ব'লে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বাহবার আশায় সকলের মুখের দিকে তাকায়।

ওয়াং খুব ব্যগ্র কৌতূহলে শোনে। গাড়ীর মেজের ওপর শক্ত হ'য়ে বসে ও জিজ্ঞাসা করে: 'তারপর?'

লৌহচক্রের ঘর্ঘর নির্ঘোষের ওপর নিজের কণ্ঠ তুলে লোকটা বলে: 'তারপর আর কি? চাটাইগুলো বেঁধে ছেঁধে একটা যাহোক ক'রে আশ্রয় খাড়া করে নাও। তারপর বেশ ক'রে গায়ে কাদাটাদা মাখো খানিক, চেহারা খানা বেশ যুৎসই ক'রে নাও যেন দেখলেই লোকের মন ভিজে যায়, শেষে বেরিয়ে পড়ো ভিক্ষেয়।'

'ভিক্ষেয়?' ওয়াং চম্কে চিৎকার ক'রে ওঠে। জীবনে কখনও তো ও ভিক্ষে করেনি। দক্ষিণ দেশ সম্পূর্ণ অজানা। অজানা দেশের অচেনা লোকের কাছে ভিক্ষে করার কথাটা ওর মোটে ভালো লাগে না।

উটমুখো লোকটা জবাব দেয়: 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কিছু না খেয়ে বেরিও না। ভোর বেলা উঠে চলে যেও লঙ্গরখানায়। দাও একটা পেনি ফেলে আর দিব্যি পেট ঠুসে খাও ধব্‌ধবে সাদা ভাতের মণ্ড। তারপর আরামসে ধীরে আস্তে বেরোও ভিক্ষে ক'রতে। দেখবে ও দেশের লোকের কেমন পয়সা। ভিক্ষে ক'রে যা পাবে, তা দিয়ে তরকারী কেনো, রসুন কেনো, বীন্‌এর চাটনি কেনো—যা খুশী।'

ওয়াং একটু আড়ালে সরে গিয়ে হাত দিয়ে কোমরে বাঁধা গেজের পয়সা গোনে। খান ছয় চাটাই, প্রত্যেকের এক বাটী ক'রে ভাত বেশ হবে। হয়েও পেনি তিনেক বাঁচবে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওয়াং—জীবনের নূতন অধ্যায়ের সুরু এ মূলধনেই বেশ হবে।

কিন্তু ভিক্ষে! পথচারীদের সামনে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরা? কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ওয়াঙের মন পীড়িত হতে থাকে। ছেলেরা না হয় পারতে পারে, বাবাও পারে। ওলান্এর পক্ষেও হয়ত সম্ভব, কিন্তু ওর তো দুটো সমর্থ হাত রয়েছে, ও ভিক্ষে কেমন ক'রে চাইবে? আবার ওয়াং জিজ্ঞাসা করে: 'কাজটাজ মেলেনা সেখানে?'

খানিকটা থুথু ফেলে ঘৃণার সাথে লোকটা বলে: 'পাবে না! আলবৎ পাবে। হলদে রংএর রিক্‌শ ক'রে রোদ্দুরে দৌড়ে দৌড়ে বড় লোকদের টানতে পারবে। শরীরের মধ্যে যে ক'ফোঁটা রক্ত আছে দিব্যি গলে গলে ঘাম হয়ে বেরুবে দর্ দর্ ক'রে। আবার ভাড়ার জন্যে যখন হা পিত্যেশ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন আবার ঘামগুলো জমে বরফ হবে। ওরে বাপ্! উনি ভিক্ষে ক'রতে পারবেন না।—ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম। তারপর এমন সুমধুর ভাষা প্রয়োগ করল ওয়াংকে লক্ষ্য ক'রে যে বেচারার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস রইল না।

এসব কথা শুনে ভালই হ'ল ওয়াঙের। ও মনে মনে সব হিসেব ঠিক করে নিল। গাড়ীটা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে ওদের ঢেলে ফেলতেই ওয়াং কাছেরই একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সুদূর বিসারী ধূসর রংএর প্রাচীরের কাছে ওলান্এর জিম্মায় সবাইকে রেখে চলে গেল বাজারে চাটাই কিনতে। বাজারের পথ ও চেনে না, জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে হয়। আর এক ফ্যাসাদ। ওয়াং এদের কথা বোঝে না। এদের উচ্চারণ কেমন যেন তীক্ষ্ণ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা; ওর কথাও এদেশী লোক বোঝে না। ওয়াং বার বার জিজ্ঞাসা করে, ওরা বোঝে না আর ও দাঁত খিঁচুনি খায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই মানুষের মুখ দেখে তাদের মেজাজের বিচার করার একটা অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়ে গেল ওর। মুখ দেখলেই এখন ও ঠিক বুঝে নেয় কার কাছে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলে ও সদুত্তর পাবে। কাজেই বুঝে শুঝেই জিজ্ঞাসা করে। বাপস্ যা রগ-চটা লোক সব এরা।

চাটাইএর দোকানের সন্ধান মিলল সহরের প্রায় প্রান্তে এসে। যেন দাম

ও ভালো ক'রেই জানে এমনি ভাবে দরদস্তুর না করেই সোজা ন্যায্য দামটা দোকানীকে হাতে তুলে দিয়ে চাটাই নিয়ে এল।

ওর ফিরতে দেরী দেখে ভাবছিল সবাই—বিদেশে বিভুঁই। ওয়াংকে ফিরতে দেখে সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একমাত্র বৃদ্ধের মনে কোনো ভাবনা ছিল না এতক্ষণ। সে আনন্দে বিস্ময়ে তার নূতন জগৎ পর্যবেক্ষণ করছিল। ওয়াং আসতেই সে বলে উঠল: 'দেখছিস কি মোটা এ দেশে মানুষগুলো—কেমন পালিশ-চকচকে চেহারা, নিশ্চয় রোজ মাংস খায়।

পথচারীদের কেউ ফিরে চায়না ওয়াঙদের দিকে। বড় রাস্তাটা দিয়ে কত লোকই বা আনাগোনা করে। সবাই ব্যস্ত। আশেপাশের দরিদ্র ভিখারীদের একটু দৃষ্টি ভিক্ষা দেবে সে সময় কোথায় ওদের। অল্পক্ষণ পরেই ভারবাহী গর্দভের ছোট ছোট দল খুট খুট ক'রতে ক'রতে আসে যায়। ওদের ছোট ছোট খুরগুলো রাস্তার পাথরের খাঁজে যেন মাপে মাপে বসে যায়। কোন গর্দভেরা পিঠে ইটের বস্তা, কোনটার পিঠে বড় বড় শস্যের বস্তা আড় করে রাখা, সব চাইতে পেছনের গাধার পিঠে চাবুক হাতে চালক। তার উচ্চ কণ্ঠের বিশিষ্ট অভিব্যক্তির সাথে হাতের চাবুক শপাং শপাং শব্দে নিরীহ প্রাণীগুলোর পিঠে নেমে আসে বার বার। ওয়াঙদের পাশ দিয়ে যাবার সময় রাজপথের ধারের এই বিস্ময়াভিভূত ভাগ্যহীনদের দিকে তাকিয়ে এদের চোখে-মুখে তাচ্ছিল্য ও রূঢ়তার কুঞ্চন ফুটে ওঠে। ওয়াঙদের বিচিত্র বেশে বাসে ওদের ভারী মজা লাগে। দেখলেই ওদের লক্ষ্য ক'রে চাবুক আস্ফালন করে। শব্দে চমকে সরল বেচারীরা লাফিয়ে ওঠে। আর ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। দু' তিনবার এরকম হ'তেই ওয়াং চটে গিয়ে জায়গা বদলাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ওদের ঠিক পেছনটায়, প্রাচীরের গা ঘেসে ঠিক ঐরকম আরো কতগুলো কুঁড়ে ছিল। প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে কি আছে কেউ জানে না, জানার কোন পথও নেই। দূর-বিসারী ধূসর বিস্তৃতি নিয়ে আকাশের বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরটা। চালাগুলো প্রাচীরের গায়ে ঠিক কুকুরের গায়ে এটুলির মত লেগে আছে। ওয়াং অন্যদের চালাগুলো দেখে নিজেরটাও অমনি ক'রে ক'রতে চেষ্টা করে। কিন্তু চেরা নল ঘাস দিয়ে তৈরী চাটাই মুড়তে চায় না, শক্ত হয়ে থাকে। ওয়াং হাল ছেড়ে দেয়। ওলান্ বলে:

'দাও আমায় দাও, ছোট বেলায় করতে দেখেছি, বেশ মনে আছে।'

মেয়েকে মাটিতে শুইয়ে ওয়াং চাটাইগুলো নৌকার ছই-এর মত ক'রে মুড়ে গোল ক'রে মাটির ওপর খাড়া করে ইট কুড়িয়ে এনে ধারগুলো চাপা দিয়ে দিল। ভিতরে একটা মানুষ বেশ বসতে পারে, মাথা ঠেকে না। একটা চাটাই বেঁচেছিল সেটা মাটিতে পেতে নিল।

ব্যবস্থা এক রকম হ'য়ে গেল। এবার মুখ চাওয়া চাওয়ির পালা। ওদের যেন সব ব্যাপারটা কেমন অসম্ভব মনে হয়। কেবলমাত্র কালই বাড়ী ছেড়েছে। একটা দিনেই কি দূরত্বের ব্যবধান, একশ মাইল। হেঁটে আসতে কতদিন লাগত, কতদিন কত সপ্তাহ; হয়ত ক'জন পথ শেষ হবার আগে নিজেরাই শেষ হ'য়ে যেত। তারপর মনে হয়, কত প্রাচুর্য এদেশে। চারিদিকে কত লোকের ভিড়; কিন্তু অনাহারের ক্ষুদ্রতম ছায়াও তো কোনো মুখে নেই। ওরাও তাহলে খেতে পাবে, না খেয়ে পড়ে পড়ে ধুকতে আর হবে না। এমনি একটা নিশ্চিন্ততার অনুভূতিতে সকলেরই মন মেতে ওঠে। ওয়াং বলে:

'চলো তো, দেখি এবার লঙ্গরখানাটার খোঁজ ক'রে।'

খুসি হয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ে। ছেলেরা কাঠি নিয়ে ঠুন ঠুন ক'রে বাটি বাজায় পথ চলার তালে তালে। একটু পরেই ওদের শূন্য বাটিগুলো ভরে উঠবে। যে প্রাচীরটার গায়ে ওয়াং আশ্রয় নিয়েছে, তারি উত্তর দিক দিয়ে একটা রাস্তা। ওই রাস্তা ধরে চলেছে বাটি, বালতি, ভাঙ্গা টিনের কৌটো প্রভৃতি শূন্য পাত্র হাতে বিরাট ভুখ্ মিছিল—রাস্তার শেষ প্রান্তে অবস্থিত লঙ্গরখানার দিকে। ওয়াংরা এখন বুঝতে পারল, কেন এই বৃহৎ প্রাচীরটার গায়ে অতগুলো কুঁড়ে রয়েছে। এদের সাথে ওয়াংরা মিশে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চাটাই দিয়ে তৈরী প্রকাণ্ড দুই চালার সামনে এসে তারা উপস্থিত হল। চালার খোলা দরজার সামনে সকলে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল।

চালার পেছনের অংশে বিশাল বিশাল মাটির উনুন। অত বড় উনুন ওয়াং জন্মে দেখেনি। তার ওপর চাপান ছোটখাট পুকুরের মত অতিকায় লোহার কড়া। কড়ার ঢাকনা খুললে, সেই ফাঁকে দেখা যায় ধবধবে, ফুটন্ত, সাদা ভাতের চঞ্চল নৃত্য; ভেসে আসে সুবাসিত বাষ্পের জাল। আঃ সে কি সুগন্ধ! নাকে আসতেই ভিড়ের চাপ সামনের দিকে ঠেলে আসে। চীৎকারে, ডাকাডাকি, শিশুর কান্না, ক্রুদ্ধ মায়ের গালাগালি,—বুঝি তার ছেলেদের কে মাড়িয়ে দিলে; সব মিশিয়ে একটা কোলাহল প'ড়ে যায়। সরাইওয়ালারা চীৎকার করে: 'আরে সবাই পাবে, সবাই পাবে—। ভাত মেলাই আছে।

বোস চুপ ক'রে।' কিন্তু দুর্বার এই বুভুক্ষু মানবের প্রবাহ। পেট না ভরা পর্যন্ত এমনি ক'রেই এরা বুনো পশুর মত কাড়াকাড়ি করে। ওয়াং যেন ভেসে যাচ্ছে এই স্রোত-বেগে। প্রাণপণ শক্তিতে বাপ আর ছেলে দুটিকে শক্ত ক'রে ধরে রাখে। কখন যেন পেছনের ধাক্কায় ও চালার সামনে এসে পড়ল তারপর অতিকষ্টে বাটি বাড়িয়ে ধরল। এবং ভাত পেলে দমটা বের ক'রে দিল অতি কষ্টে। প্রতি মুহূর্তে জনপ্রবাহ ওকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়—প্রাণপণে ঐটুকু সময় ও কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইল।

ফাঁকা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাত খায় ওরা। ওয়াঙের বাটিতে খানিকটা ভাত প'ড়ে থাকে, ও সবটা খেতে পারে না। রেখে দিল, রাতে খাওয়া যাবে।

কাছেই লাল-নীল কাপড়ের পোষাক পরা একটা পাহারাওয়ালা গোছের লোক দাঁড়িয়েছিল। সে তীব্র স্বরে বাধা দিল: 'পেটে পুরে যা নিয়ে যেতে পারো, নাও বাপু। বাস। পোট্‌লা টোট্‌লা বাঁধা চলবে না।'

ওয়াং অবাক্। বারে! পয়সা দিয়ে কিনেছে রীতিমত। পেটে পুরেই ওর জিনিস ও নিয়ে যাক্ আর পোট্‌লা বেঁধেই নিক্, তা ও লোকটার কি? লোকটা বুঝিয়ে বলে: 'বাপুহে, বুঝছনা। এ তোমাদের ভালোর জন্যেই। এ লঙ্গরখানা—গরীব গরবার জন্যই। গরীবের জন্যই এত সস্তা করা হ'য়েছে, নইলে এমনিতে এক পেনির ভাতে কি আর পেটভরে কারো? কিন্তু জানো—জানবেই বা আর কি ক'রে—একদল মানুষ আছে কল্‌জে নেই তাদের, গরীবের এই সস্তা ভাত কিনে নিয়ে গিয়ে শূয়রদের খাওয়াতে লাগল। তাই এ নিয়মটা করতে হ'ল বুঝলে?'

ওয়াং অবাক হয়ে শোনে। চীৎকার ক'রে ওঠে: 'ওঃ এমন পাষণ্ডও আছে? আচ্ছা, গরীবদের এমন ক'রে কে খাওয়ায়?'

'ভাল লোকও আছে, সবাই কি আর মন্দ। সহরে মেলাই বড়লোক আছে। কেউ খাইয়ে পুণ্যি ক'রে পরলোকের পথ সাফ করে, আবার কেউ করে তারিফের আশায়। কতই যে আছে দুনিয়ায়!'

'তা, যার জন্যই করুক। কাজটা তো ভাল। কেউ কেউ হয়ত ওসব কিছুই চায় না, সত্যিকার দরদ আছে বলেই করে তারা।'

লোকটা আর জবাব না দিয়ে পিছন ফিরে একটা অলস সুর গুনগুনিয়ে চাজে। ওয়াং নিজেকে নিজেই সমর্থন করে ও তরফের কোনো সার না

পেয়ে। তারপর কুঁড়েতে ফিরে আসে সবাই। গ্রামের পর থেকে আজ এই প্রথম পেট ভরে খাওয়া। গভীর অবসাদে, ঘুমে ওদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হ'য়ে এল।

ঘুম ভাঙ্গল পরদিন ভোরে।

কালই ভাত কিনতে সব খরচ হ'য়ে গেছে। আজ খাওয়া চলে কি দিয়ে? কি করা যায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওয়াং স্ত্রীর দিকে চায়। কিন্তু আজ এ সে নিরাশার দৃষ্টি নয়—যে দৃষ্টি ও মেলে ধরেছিল ওলান্‌এর দিকে যেদিন ওদের শস্য-শ্যামল মাঠের বুকে মরুভূমির ঊষরতা নেমে এসেছিল। ওয়াঙরা কি এখানেও না খেয়ে মরবে? হতে পারে না। এখানে রাস্তায়-ঘাটে সকলের চেহারায়ই স্বচ্ছন্দ ভোজনের কান্তি। বাজারেও দেখে এল—তরী-তরকারী, মাছ-মাংসের অজস্রতা। বড় বড় কাঠের গামলায় কত মাছ। একি সম্ভব, এমন প্রাচুর্যের দেশে একটা মানুষ তার ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে থাকবে? এতো তাদের গাঁ নয়—যেখানে পয়সা দিলেও কিছু কিনতে পাওয়া যায় না! কিন্তু সে তো হ'ল। জিনিস পেতে হ'লে পয়সা তো চাই। ওয়াঙের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে স্থির ভাবে ওলান্ জবাব দেয়: 'ছেলেরা, আমি আর বাবা না হয় ভিক্ষে করি। আমাকে ভিক্ষে হয়ত কেউ দেবে না। কিন্তু বাবা বুড়ো মানুষ, তাকে দেখে লোকের মন নিশ্চয় গলবে।' কথাগুলো বেরিয়ে এল এমন ভাবে যেন এ ওলানের প্রাত্যহিক অভ্যস্ত জীবনের একটি অধ্যায় মাত্র, এর খুঁটিনাটি সবই ওর পরিচিত।

শিশুর স্বভাব—এরই মধ্যে ক'টা দিনের বিভীষিকাময় ইতিহাস ওরা একেবারে ভুলে বসেছে। পরম নিশ্চিন্ততায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ওরা নূতন জগৎটাকে দেখছিল। ওলান্ ওদের ডেকে নিল, হাতে তুলে দিল বাটি। তারপর শেখাতে বসল: 'হ্যাঁ এই ভাবে বাটি ধ'রে জোরে জোরে বল,—এই এমনি ক'রে করুণ স্বরে—জয় হোক বাবু, জয় হোক মা। পুণ্যি হবে, ভগবান রাজা করবেন—দয়া ক'রে কিছু দিয়ে যান বাবু। কতদিকে কত পয়সা ফেলে দেন বাবু। আজ ক'দিন খাইনি, দু'টো পয়সা দিন খেয়ে বাঁচব।'

অবোধ বালক, বোঝেনা কিছু। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। ওয়াংও বিমূঢ় হ'য়ে যায়—এ সব শিখল কোথায় ওলান্? রহস্যময়ী এ নারীর কতখানি অংশ এখনও ওর কাছে অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে কে জানে!

ওলান্‌ই সমস্যার সমাধান করে: 'যখন খুব ছোট ছিলাম, এমনি ক'রে ভিক্ষে করতাম, তবে তো খেতে পেতাম। সেবার দুর্ভিক্ষের বছরই আমায় বেচে দিলে কিনা।'

বৃদ্ধ ততক্ষণে জেগে উঠেছে। তার হাতেও একটা বাটি গুঁজে দিল ওলান্‌। চারজনে চ'লে গেল বড় রাস্তায়। সকলের সামনেই ওলান্ বাটি তুলে ধরে। অনাবৃত-বক্ষে ঘুমন্ত শিশুর এলিয়ে পড়া মাথা এদিক ওদিক দোল খায়। শিশুকে দেখিয়ে, স্বরে যাচ্ঞা মেখে ওলান্ চীৎকার করে: 'দয়া ক'রে দিয়ে যান কিছু মা, বাবু, নইলে—'

সত্যি মেয়েটাকে দেখলে মনে হয়, বুঝি মরেই গেছে—এমন ভাবে মাথাটা ঝুলে পড়েছে, আর এদিক ওদিক দুল্‌ছে। কারো প্রাণে দরদ হয়, খুচরা দু'একটা ভাঙ্গতি ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওর দিকে।

ভিক্ষের ব্যাপারটা ছেলেদের মনে হ'ল বেশ একটা খেলা। বড় ছেলে স্বভাব-লাজুক। চাইতে গিয়ে কুণ্ঠিত হাসি ফুটে ওঠে মুখে। মার চোখে প'ড়ে যায়। দু'জনকে হিড়্ হিড়্ ক'রে কুঁড়েতে টেনে এনে গালে মুখে চড়ের ওপর চড় মারতে লাগল আর বলতে লাগল: 'ক্ষিদে, মুখে আনিস আর ক্ষিধের কথা,—ছাই বেড়ে দেব! লজ্জা করে না দাঁত বের ক'রে হাসতে।' ওলানের হাত আর থামতে চায় না। অবশেষে নিজের হাত যখন প্রায় ফাটবার মত হ'ল, তখন দু'জনকে ঠেলে বের ক'রে দিল। 'হ্যাঁ ঠিক হ'য়েছে এবার, যুতসই চেহারাখানা হয়েছে। খবরদার আর হেসেছিস্ তো, হাড় মাস আলাদা ক'রে দেব ঠেঙ্গিয়ে।'

ওয়াং রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। একে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে রিক্‌শর 'খাটাল' খুঁজে বেড় ক'রে আধ ডলারে একটা রিক্‌শ সারা দিনের জন্য ঠিকে ক'রে নিল।

অদ্ভুত নড়্‌বড়ে হাল্কা দু'চাকার কাঠের গাড়ীটা টানতে টানতে ওয়াঙের মনে হয় সারা বিশ্ব ওর আনাড়ি-পানা দেখে হাসছে। হালে প্রথম-জোড়া বলদের মত রিক্‌শর বমের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াঙের কেমন অদ্ভুত ঠেকে। হাঁটতে পা বেঁধে যায়। কিন্তু পয়সা পেতে হ'লে তো আর দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ছুটতেও হবে। রিক্‌শাওয়ালারা তো দৌড়ে দৌড়েই রিক্‌শ টানে, সংকীর্ণ নির্জন একটা গলি খুঁজে নিয়ে ওয়াং রিক্‌শ টানা অভ্যাস ক'রতে আরম্ভ করে। কিছুতেই যেন আর হাত আসে না। দুত্তোর ছাই—এর চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভালো।

গলিরই একটা বাড়ীর দরজা খুলে যায়। স্কুল-মাষ্টারের পোষাক পরা চশমা চোখে বয়স্ক একজন ভদ্রলোক ওকে ডাকলেন। ওয়াং ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করে, যে ওর কাঁচা হাত, তাড়াতাড়ি টানতে পারবে না। কিন্তু এক অক্ষরও কি বোঝে লোকটা। সে গম্ভীরভাবে ওকে রিক্‌শ নামাতে সংকেত করে। কি যে ক'রবে ওয়াং ভেবে পায় না। লোকটার গুরু-গম্ভীর চেহারা দেখে ভড়কে গিয়ে রিক্‌শ নামিয়ে দেয়। সে ভেতরে ঢুকে সোজা হ'য়ে বসে হুকুম করে: 'কনফ্যুসিয়াসের মন্দির।'

ও স্থানটির অবস্থান সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ওয়াঙের নেই। কিন্তু তবুও ওই গুরু-গম্ভীর মূর্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও হ'ল না। অন্যের দেখাদেখি ও সামনের দিকেই ছুটতে লাগল। খোঁজ ক'রতে ক'রতে একটা বড় রাস্তায় পড়ে। অসম্ভব ভিড়। পসরা-মাথায় রকমারী ফেরীওয়ালা, মেয়েরা চলেছে বাজার করতে; ঘোড়ার গাড়ী, রিক্‌শ, আরো কতরকম গাড়ী,—ও সে-সবের নামও জানে না। এত ভিড়ে দৌড়ান অসম্ভব। ও যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটেই চল্‌ল। পিছনের বোঝাটার সশব্দ ঝাঁকানি ও কিছুতেই ভুলতে পারে না। পিঠে বোঝা বইবার অভ্যাস তো কিছু কম নেই, তবে বোঝা টানেনি ও কস্মিন্ কালেও। মন্দিরে পৌঁছুবার আগেই ব্যাথায় ওর হাত টন্‌টন্ ক'রতে থাকে—মস্ত মস্ত ফোস্কা পড়ে যায়। লাঙ্গল-টানা হাতে ফোস্কা পড়ার অবশ্য কথা নয়, তবে বমের ঘষাটা যেখানে লাগছে, লাঙ্গলের ঘষা সেখানে লাগেনি, কাজেই জায়গাটা নরম রয়ে গেছে।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে মাষ্টার মশায় নেমে গেলেন। জামার বুকে অনেক দূর পর্যন্ত হাত গলিয়ে একটা রূপার মুদ্রা বের ক'রে দিয়ে বললেন: 'আর হবে টবে না বাপু, সরে পড় গোলমাল না ক'রে।'

গোলমাল করবে কি ওয়াং? সে কথা ওর মাথায় আসেনি। কারণ ওরকম মুদ্রা এর আগে ও দেখেনি। ওতে ক'পেনি পাওয়া যাবে কে জানে।

কাজেই একটা চায়ের দোকানে মুদ্রাটা ভাঙ্গিয়ে ওয়াং ছাব্বিশটা পেনি পেল। এত সহজে এত পয়সা পাওয়া যায় এখানে? ওয়াং বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যায়। আর একজন রিক্‌শওয়ালা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে ওর পেনি গোনা দেখছিল। সে বলল: 'মাত্র ছাব্বিশ পেনি? কতদূর নিয়ে গিয়েছিলে বুড়োটাকে?'

ওয়াং বলতেই ও রেগে ওঠল: আচ্ছা চামৃচিকে তো বুড়ো। ঠিক আদ্দেক ভাড়া দিয়েছে তোমায়। ভাড়া ঠিক ক'রে নাওনি আগে থাকতে?'

'দরদস্তুর তো করিনি কিছু! সে ডাকল, আমি চলে এলাম।'

সহানুভূতি-ভরা দৃষ্টিতে লোকটা ওয়াঙের দিকে তাকাল। তারপর আশ-পাশের লোকদের ডেকে বলল : 'শুনছ তোমরা সব! কে ওকে ডাক্‌ল আর উনি তার পেছন পেছন সুর্ সুর্ ক'রে চলে গেলেন। অমন লম্বা টিকি না হ'লে অমন আক্কেল! গেঁয়ো ভূত কোথাকার! আরে হাঁদা, দরটা প্রথম ঠিক ক'রে নিতে হয়। বিদেশী সাহেবদের কথা অবশ্য আলাদা। ওরা একটু খিট্‌মিটে মেজাজের বটে, কিন্তু ওরা ডাকলে দরদস্তুর না ক'রে যাওয়া যায়। সাহেবগুলো একটু বোকাই হয়। কোন্ জিনিসের কি দাম ওরা বোঝে? হুট্ করতেই পকেট থেকে পেনি টেনি নয় একেবারে কাঁচা ডলার বের করে।

সবাই হেসে ওঠে।

ওয়াং কিছু বলে না। এই সব সহুরে লোকের ভিড়ে ও মিইয়ে এতটুকু হয়ে যায়। চুপচাপ রিক্‌শ নিয়ে চ'লে গেল। যেতে যেতে মনকে বোঝাল : 'হোকগে ছাই কম, ছেলেদের কালকের খোরাক তো চলে যাবে।' কিন্তু সাথে সাথেই মনে প'ড়ল রাতে রিক্‌শর চুক্তি মেটাতে হবে। কিন্তু চুক্তির অর্ধেকও তো পায়নি ও! সকালের দিকেই আর একটা ভাড়া মিলে গেল। এবারে আর ঠকবে না, ঠিক দরদস্তুর ক'রে নিল। বিকেলে আরো দু'টো পেল। কিন্তু রাতে সব মিলিয়ে হিসেব ক'রে দেখল মালিকের হিসেব মিটিয়ে ওর হাতে মাত্র একটা পেনি থাকে। ওয়াং ঘরে ফিরল বিশ্রী একটা তিক্ততা নিয়ে। সারাদিনে পেল মাত্র একটা পেনি? আর তার জন্য খাটলে কিনা ক্ষেতের একটা পুরোদিনের খাটুনীর চাইতে বেশী! মজুরীও তো পোষাল না।

তারপর ওর সেই পেছনে-ফেলে আসা মৃত্তিকার স্মৃতি বন্যার মত ওকে প্লাবিত করে দিল। এই বিচিত্র দিনটার মধ্যে একবারও ওর মনে পড়েনি ও-কথা। কত দূরে—কত দূরে—আজ ওর অন্নদায়িনী পালিকা জননী। সুদূরের আড়ালে বসে আজ ওরই আশাপথ চেয়ে আছে ওর মাটি। নিবিড় প্রশান্তিতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে ওয়াঙের অন্তর। পরিপূর্ণ হৃদয়ে ও ঘরে ফেরে।

কুটিরে ফিরে দেখল ওলান্ সারাদিনের ভিক্ষায় পাঁচপেনি আন্দাজ পেয়েছে, ছেলেরাও পেয়েছে কিছু। সব মিলে ভোরের খাওয়াটা হ'য়ে যাবে। ছোট খোকার পয়সাগুলো সকলের সাথে মেশাতেই সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। আপন উপার্জন সে ছাড়বে না। হাতের মুঠোতে পয়সা নিয়েই ছেলেটা ঘুমোল, বের করে দিল খালি নিজের ভাত কেনার সময়।

বুড়ো পায়নি কিছু। বাধ্য ছেলের মত গোটা দিনটা রাস্তায় বসেই ছিল, কিন্তু চায়নি। ঘুমিয়েছে, জেগেছে, চোখের সামনে যা এসেছে, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখেছে, ক্লান্ত হ'লে আবার ঘুমিয়েছে। বুড়ো মানুষ, তাকে আর কিছু বলা যায় না। যখন দেখল, হাত একেবারে খালি, একটা পয়সাও পায়নি, নির্লিপ্ত ভাবে কেবল বলল: 'এই হাতে আমি লাঙল চালিয়েছি, বীজ বুনেছি, ফসল কেটেছি, আপন ভাতের থালা ভরেছি। আমার ছেলে হয়েছে, নাতি হয়েছে—'

ওর পুত্র আছে, পৌত্র আছে, এই পরম অধিকারেই ও খেতে পারে। শিশুর মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বৃদ্ধ এই কথাটা জেনে বোসে আছে।

বার

এখন আর না খেয়ে থাকতে হয় না। ছেলেদের পেটে রোজই কিছু না কিছু পড়ছে এখন। ওয়াঙের পরিশ্রম আর ওলান্-এর ভিক্ষালব্ধ মিলিয়ে চলে যাচ্ছে এক রকম। কাজেই ক্রমে জীবনের এই বিচিত্র রূপান্তরের প্রথম অনুভূতির তীব্রতা কমে এল অনেকটা। যে-সহরের উপান্তে ওর জীবনের নূতন অধ্যায়ের বুনিয়াদ পত্তন হয়েছে, তারই পরিচয় নেবার আকাঙ্ক্ষা এবারে ওয়াঙের মনে জাগল।

রিক্‌শ নিয়ে সকাল সন্ধ্যা রাস্তায় রাস্তায় দৌড়ে খানিকটা পরিচয় ও পেয়েছেও। ও দেখেছে ওর রিক্‌শয় সকাল বেলায় স্ত্রীজাতীয় আরোহীরা বাজারে যায়, আর পুরুষ জাতীয়রা যায় স্কুলে, নয় অফিসে। স্কুলগুলির মস্ত মস্ত গাল-ভরা নামও শুনেছে, যেমন 'মহা-প্রতীচ্য বিদ্যালয়', 'মহা চীন বিদ্যালয়', এমনি ধারা সব নাম। কিন্তু নাম ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানেনা ও। গেট পার হবার সাহসই হয়নি কখনও। অফিস্‌গুলো সম্বন্ধেও ওর জ্ঞানের দৌড় ঐ পর্যন্ত। ও যায়, ভাড়া পায়, দোরগোড়া থেকে চলে আসে।

এখানেও ওয়াঙের অভিজ্ঞতা ওই বাইরের। সাক্ষাৎভাবে এর কোনো কিছুর সাথে ওর পরিচয় ঘট্‌ল না,—ওর গতি-সীমা গেট্ পর্যন্ত। এই ঐশ্বর্য-শালিনী নগরীর একেবারে মাঝখানে থেকেও ওয়াং সম্পূর্ণ প্রবাসী ও অসম্পৃক্ত রয়ে গেল এর সাথে। ধনী-গৃহবাসী মূষিক যেমন যে-সংসারের ঝড়তি পড়্‌তি খেয়ে জীবনধারণ করে, অথচ সেখানকার জীবন-ধারার সাথে

সত্যিকারের তার কোনো নাড়ীর যোগ নেই—তাকে গা ঢাকা দিয়েই থাকতে হয়, ওয়াঙের অবস্থাও ঠিক এমনিই রয়ে গেল এই বিলাস নগরীতে।

ওয়াংরা নিতান্ত বাইরের মানুষ হয়েই রইল যদিও নিজের গাঁ থেকে মাত্র একশ' মাইলের ব্যবধান এ জায়গা। একশ' মাইলের দূরত্ব বিশেষ ক'রে স্থলপথে তো কিছুই নয়।

রাস্তায় ঘাটে সর্বদা ওয়াং যাদের দেখ্ছে এখানে, তাদের চুল চোখ ওদের উত্তর-দেশীদের মতই কালো; আকারে প্রকারে তারা ওদেরই মতো, এদের কাটা কাটা উচ্চারণও একটু কষ্ট ক'রলেই বেশ বোঝা যায়। তবুও ওয়াং র'য়ে গেল বাইরের মানুষ হয়েই।

আনহুই আর কিয়াংশু—এক কথা তো নয়। দুটো আলাদা জায়গা। ওয়াঙের মনে হয়—আন্হুই অর্থাৎ ওয়াঙের মাতৃভূমির ভাষা—কেমন মন্থর, গভীর, কণ্ঠোৎসারী। আর কিয়াংশু—যেখানে ওরা এখন রয়েছে—শব্দগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে জিভের প্রত্যন্ত থেকেই ওষ্ঠের বাধায় হোঁচট্ খেয়ে টুক্রো টুক্রো হ'য়ে ছিট্‌কে পড়ে। আন্হুইয়ে ওর মাটি-মা স্বচ্ছন্দ মন্থরতায় ধান, গম, মটর, রসুনের দাক্ষিণ্যে আপনাকে উৎসারিত ক'রে দেয় বছরে দু'বার। আর এখানে মনুষ্য-বিষ্ঠার দুর্গন্ধময় সারের সাহায্যে নগরোপান্তের জমিগুলোর উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে জবরদস্তি ক'রে সারাবছর নানা রকম তরকারী, শাকসব্জী আদায় করে। কেবল শস্য-শালিনী হ'য়েই মাটি-মার রেহাই নেই সহরে।

তাছাড়া ওয়াংদের দেশে দু'এক কোয়া রসুন দিয়ে মোটা মোটা গমের রুটি একেবারে রাজভোগ। কিন্তু এখানে, শূয়রের মাংস, বাঁশের কোড়, পাখীর মাংস, হরেক রকম তরকারী, হরেক রকম রান্নার বাহার।—বাবাঃ হিসেব থাকে না ওয়াঙের অতশত। গায়ে একটু রসুনের গন্ধ পেলেই যা নাক সিঁটকোয় এরা। রসুনের গন্ধ নাকে গেলে কাপড়ের ব্যাপারীরা দর সুদ্ধ চড়িয়ে দেয়, সাহেবদের দেখলে যেমন তারা করে।

একা ওয়াং নয়, ওদের গোটা দীন-পল্লীটি সহর এবং কাছেরই সহরতলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রয়ে গেল। একদিন কনফ্যুসিয়সের মন্দির-প্রাঙ্গণের একাধারে, যেখানে সকলেরই অবারিত-দ্বার, ওয়াং দেখল ভীষণ ভিড় জমেছে। মাঝখানে এক যুবক সকলকে সম্বোধন করে উচ্চকণ্ঠে বলছে :

'বিপ্লব চাই, চীনে বিপ্লব। ঘৃণিত বিদেশীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতেই হবে...'

ওয়াং ভয় পেয়ে পালিয়ে এল। ও তো বিদেশী। ওরই বিরুদ্ধে কথা বল্‌ল ছেলেটা! আরও একদিন শুনল, আর একজন যুবক ওয়াংদের ঐ দিক্‌কার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আহ্বান ক'রছে সমগ্র চীনবাসীকে—তাদের সংহত হ'তে, শিক্ষা পেয়ে মানুষ হ'তে। আজ ওয়াঙের মনেই হ'ল না এই আহ্বানের যারা লক্ষীভূত, সেও তাদের একজন।

কিন্তু একদিন ওর চোখ খুলে গেল। ও বুঝল এই সহরে ওর চাইতেও বেশী বিদেশী মানুষ আছে। সেদিন ও সিল্কের বাজারে ভাড়ার আশায় ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। মহিলারা এখানে সিল্ক কিনতে আসেন, আর ওয়াঙের ভাগ্যেও প্রায়ই দু'একটা বড়ো শিকার মিলে যায়, বেশ দু'পয়সা ভাড়া পাওয়া যায়। আজও পেল। কিন্তু জীবটি অদ্ভুত—স্ত্রী না পুরুষ, ওয়াং ঠাহর ক'রতে পারলে না; প্রকাণ্ড লম্বা গড়ন, কালো মোটা কাপড়ের ঝোলা পোশাকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা, গলায় জড়ান কি একটা মৃত জন্তুর স-রোম চামড়া। জীবটি হাতের একটি হ্রস্ব ইঙ্গিতে ওয়াংকে বম্‌ নীচু ক'রতে সঙ্কেত ক'রল। কলের মত হুকুম তামিল করে ওয়াং। অভিভূতের মত উঠে দাঁড়াতেই জীবটি ভাঙা অস্পষ্ট উচ্চারণে গন্তব্যের নির্দেশ দিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো ছুটে চললো ওয়াং। পথে একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল 'দেখ তো ভাই আমার রিক্‌শয় ওটা কি চ'ড়ে বসেছে!'

'জোর কপাল ভাই তোমার', লোকটা বলে: 'ও বিদেশী—আমেরিকান মেমসাহেব যে—'

কিন্তু অদ্ভুত জীবটার ভয় ওকে একেবারে পেয়ে বসেছে। প্রাণপণে ও ছুটে চল্‌ল। গন্তব্য স্থানে যখন পৌঁছল, তখন ওর বিন্দুমাত্রও শক্তি অবশিষ্ট নেই। ভয়ে ক্লান্তিতে ও অবসন্ন। ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে। মহিলাটি নেমে এসে আগের মতই ভাঙা উচ্চারণে বল্‌ল: 'অমন ক'রে মরতে মরতে ছোটার কোন দরকার ছিল না।' তারপর ন্যায্য ভাড়ার দ্বিগুণ দু'টো ডলার ওর হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল।

ওয়াং বুঝল, এই হ'ল যাকে বলে আসল বিদেশী, ওর চাইতেও বেশী বিদেশী। কালো চুল, কালো চোখের সব মানুষ তবে এক জাতের। আর কটা চোখ, কটা চুলওয়ালা সব আর এক জাত। বিদেশী ওরাই। ওয়াং এখানে পুরো বিদেশী নয়।

ডলার দু'টো ও সাবধানে রেখে দিল। খরচ করল না। রাতে বাড়ী ফিরে ওলানকে সব বলল। ওলানও দেখেছে ওদের। ওদের কাছেই তো ও বেশী ভিক্ষে পায়। এদের হাতে তামা টামা ওঠে না। স্রেফ রূপো ওঠে।

কিন্তু এদের দু'জনের বিশ্বাস অমন ক'রে রূপোর মুদ্রা দেওয়াটা এই বিদেশীগুলোর ঔদার্য নয় ঠিক, এ ওদের নিছক বোকামী। ন'লে রূপো দেয় লোকে ভিকিরীকে! সবাই জানে ভিকিরীকে দিতে হয় এক আধটা তামার রেজকী! আচ্ছা বোকা বিদেশীগুলো!

কিন্তু ওর এই অভিজ্ঞতাই ওকে বুঝিয়ে দিল যা সেদিনকার যুবকদের বক্তৃতায় ও বোঝেনি। বুঝল যে এখানকার যত কালো চুল, কালো চোখ ওয়ালা তাদেরই স্বগোষ্ঠী ওয়াংরা।

আর বুঝল এখানে না খেয়ে মানুষকে মরতে হয় না। ওদের দেশে অনাহার ঘটে আশ্চর্য থাকে না বলে। রুদ্র আকাশের মমতাহীনতায় বসুন্ধরা হয় বন্ধ্যা, আর সে বন্ধ্যাত্বের হেতুতেই হাতের অর্থও হয় অক্ষমতায় অর্থহীন।

এখানে না খেয়ে মরবে না মানুষ! চারদিকে এত আহার্য; যেখানে যাও সেইখানেই খাবার জিনিষ। ভারী অদ্ভুত লাগে ওয়াঙের। মেছো বাজারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়ি সারি সারি সাজান, তাতে বড় বড় রূপোলী মাছ—রাতের বেলা নদী থেকে ধরা। তারপর গামলায় গামলায় সব কুচো মাছ—পুকুর থেকে ছোট ছোট জাল দিয়ে ধরা—কি রকম ঝলমল্ করে মাছগুলো। হল্দে রংএর কাঁকড়াগুলো সব স্তূপ ক'রে রাখা হয়েছে। বিরক্তিতে, বিস্ময়ে ওরা দাঁড়া দিয়ে যেন শূন্যে চিমটী কাটছে আর এদিক ওদিক নড়া-বড়া ক'রছে। ভোজন-বিলাসীদের অতিপ্রিয় কুঁচে মাছের স্তূপ সাপের মত মোচড় খাচ্ছে। শস্যের বাজারে যাও—এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটা শস্যের ঝুড়ি যে তাতে একটা আস্ত মানুষ তলিয়ে গিয়ে ম'রে থাকতে পারে। কত রকমের শস্য; সাদা চাল, বাদামী চাল; গাঢ় হল্দে, ফিকে সোণালী রংএর গম; হল্দে রংএর সয়াবীন, লাল বীন, চওড়া চওড়া সবুজ রংএর বীন্; হল্দে রংএর ভুট্টা; তামাটে রংএর তিল এমনি কত কি।

মাংসের বাজারে পেট চিরে নাড়ী-ভুড়ি বের করা গোটা গোটা শূয়র সব ঝুলছে। গভীর লাল মাংসের মধ্যে সাদা ধবধবে থোলো থোলো চর্বি, চমৎকার লাগে দেখতে। ঢিমে আঁচে সেঁকা হাঁস ঝুলিয়ে রেখেছে শিকেয়

ক'রে দরজার চৌকাঠে। সাদা হাঁসের নোনা সুট্‌কী,—আরো কত রকম বেরকমের পাখীর মাংস সব।

তরকারীর বাজারও কম যায় না—ভুলিয়ে ভালিয়ে মানুষ মাটি থেকে যা কিছু আদায় ক'রতে পেরেছে কিছুই বাদ যায়নি। নানা রংএর মুলো, পদ্মের নাল, কপি, নানারকম শাক, বাদাম, ক্রেসের নরম পাতা, সব আছে। এরপর আছে মিঠাইওয়ালা, ফলওয়ালা, মেওয়া-ওয়ালা। ছেলের দল মুঠো মুঠো পেনি নিয়ে ছুটে যায় ফেরী-ওয়ালাদের কাছে, কেনে আর খায়। তেলে রসে চট্‌চটে হ'য়ে ওঠে ওদের হাত পা মুখ।

এহেন সহরে অনাহারে কেউ মরতে পারে না।

কিন্তু প্রত্যেক দিন দেখে ভোরে অন্ধকার কেটে যাবার সাথে সাথেই এই দীন পল্লীর প্রত্যেকটী কুড়েঘর থেকে নর-নারী-বৃদ্ধ-বালের একটি দল বেরিয়ে আসে। সুদীর্ঘ সারি রচনা ক'রে তারা লঙ্গরখানার দিকে যায় একটি পেনির বিনিময়ে এক বাটি ভাতের মণ্ড কিনতে। শীতের সকাল, নদীর বুক থেকে ওঠে জোলো কুয়াশা, কারো গায়ে কোনো আবরণ নেই, থাকলেও আভাসমাত্র। কন্‌কনে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে পিঠ বাঁকা হ'য়ে যায় তাদের। ওয়াং বাটি, কাঠি নিয়ে তার পোষ্য-বর্গ সহ এদের সঙ্গ নেয়।

ভাত কিনে কখনও যদি বা এক আধটা পেনি উপরি হয় তা দিয়ে এক আধটু তরকারী কেনে মাঝে মাঝে। তরকারীর হাঙ্গামাই কি কম? কাঠ চাই, রান্নার বাসন চাই। কাঠ খড়ের যে সব গাড়ী সহরে যায় তা থেকে লুকিয়ে টেনেটুনে ছেলেরা দু'এক মুঠো আনে; ওলান খান দুই ইঁট দিয়ে একটা উনুনের মত ক'রে রেখেছে, তাতে কোনও মতে তরকারীটুকু সিদ্ধ ক'রে নেয়। কাঠ খড় চুরি ক'রতে গিয়ে ধরা প'ড়ে ছেলেরা মার-ধরও খায় মাঝে মাঝে। বড় খোকা একটু লাজুক ও ভীরু। বেচারা একদিন রাতে ফিরে এল কোন্ চাষার হাতের গুতোয় ফোলা দু'চোখ নিয়ে। ছোট খোকার হাত বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছে চুরিতে।

ওলান্‌এর মনে এসব কিছুই বড় একটা দাগ কাটে না। না হেসে ভিক্ষে যদি ওরা না চাইতে পারে, তবে চুরি করেই পেট ভরাক। পেটটা ভরাতে তো হবেই। ওয়াং কিছু বলতে পারে না। কিন্তু সন্তানের এই অবনতিতে রাগে দুঃখে অপমানে ভেতরটা ওর জলে যায়। বড় খোকার ভীরুতাই ওর ভালো লাগে। এই বিশাল প্রাচীরের গায়ের কালো ছায়ায়

তলার এই বিড়ম্বনার জীবন তো ও চায়নি কোনোকালে। ওর জন্য ওর মাটি যে পথ চেয়ে রয়েছে।

একদিন খেতে বসে ওয়াং দেখল কপির ঝোলে বেশ জড়সড় একখণ্ড শূয়রের মাংস। বলদটা কাটার পর আর মাংস খায়নি এতদিন। ওয়াং খুসি হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল: 'আজ কোনো বিদেশীর কাছে ভিক্ষে পেয়েছ বুঝি?'

অভ্যাস-মত ওলান্ চুপ ক'রে রইল। কিন্তু ছোট খোকা কৃতিত্বের গর্বে ডগ্‌মগ্ হয়ে বলে ফেলল: 'আমি এনেছি বাবা মাংস।' মাংস আনার ইতিহাসটা এই—এক বুড়ী, কসাইখানায় মাংস কিনতে গিয়েছিল। কসাই মাংস কেটে একটু অন্যদিকে চাইতেই ছোট খোকা বুড়ীর বগলের তলা দিয়ে ওটা নিয়ে সট্‌কে পড়ল। পাশের গলির মধ্যে ঢুকে একটা বাড়ীর পেছনে খালি একটা জলের জালার আড়ালে লুকিয়ে ছিল খানিকক্ষণ, তারপর বড় খোকা এলে, দু'ভাইয়ে মিলে বাড়ী এসেছে।

শুনে ভীষণ রেগে গেল ওয়াং। 'খাবো না আমি, এ চুরি করা মাংস,' চীৎকার ক'রে ওঠে: 'গতর খাটানো পয়সা দিয়ে যেদিন কিনতে পারব সেদিন খাব। চুরি! আমার ছেলেরা চুরি ক'রবে? ভিক্ষে করতে হয়েছে বলে চোর নই আমরা, কখনও না।' ছুঁড়ে ফেলে দিল মাংস মাটি থেকে তুলে। ছোট খোকা কেঁদে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। ভ্রূক্ষেপ করল না ওয়াং।

ওলান্ তার চিরকালের স্বাভাবিক মন্থর নির্বিকার ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে মাংসটা তুলে আনল। ধুয়ে পাত্রে রেখে শান্ত স্বরে বলল: 'চুরি করা ব'লে কি ওটা আর কিছু হ'য়ে গেল নাকি? মাংস মাংসই।' ওয়াং আর কিছু বলল না। কিন্তু রাগে গুমরাতে লাগল। ভয়ে যেন ওর বুকের ভেতরটা থম্‌থমে হ'য়ে রইল, সহরে থেকে ওর ছেলেরা চোর হচ্ছে!

ওয়াং বসে বসে দেখে ওলান্ নির্বিকারচিত্তে তার কাঠি জোড়া দিয়ে মাংস ছিঁড়ছে। কিছু বলল না। দেখল ছেলেদের পাতে, বাবার পাতে ভারি বড় বড় টুকরো দিল, ছোট খুকীকে একটু খাওয়াল, নিজে খেল। ওয়াং কিছু বলল না। শুধু নিজে ছুঁল না মাংস, কেবল নিজের পয়সায় কেনা কপির তরকারী দিয়ে ভাত খেয়ে উঠল।

খাবার পর ছোট খোকাকে নিয়ে গেল রাস্তায়; ওলান্ শুনতে না পায় এমন জায়গায়। তারপর ওর মাথাটা বগলে চেপে নির্মমভাবে ওকে মারতে

লাগল। বালকের চীৎকারে নৈশ আকাশ ঘোলাটে হ'য়ে উঠল; কিন্তু ওয়াঙের হাত আর থামতে চায় না।

'চুরি করা? এখন কেমন লাগে! চোরের এই এই—' হাত চলার সাথে সাথে ওয়াং গর্জায়।

তারপর ছেড়ে দিলে ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এল। ওয়াং ভাবতে লাগল: 'আর নয়, আর নয়, এবার ফিরতেই হবে আপন ভূঁইয়ে, সেই পল্লী-মায়ের কোলে।'

ঐশ্বর্য-শালিনী এই মহানগরী যে মহা-দৈন্যের বুনিয়াদে গড়া, এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও, ওয়াং লাং ভিত্তিমূলের সেই দৈন্যেই আকণ্ঠ ডুবে রইল। বাজারে আহার্যের কি অজস্রতা, কি অপচয়! রাস্তার দুই ধারের চীনাংশুকের বিপনী-বিথি হতে নানা রংএর দুকূলের ধ্বজা উড়ে উড়ে নবাগত পণ্য সম্ভারের বার্তা ঘোষণা করে। চারিদিকে সাটীন, ভেল্‌ভেট্, সিল্কের পরিচ্ছদ-ভূষিত ধনিকের জগৎ, যাদের দেহের মাংস কোমল, কুসুম-পেলব হাতে যাদের কুসুম-সুরভি আর নৈষ্কর্মের লালিত্য। বিলাসিনী নগরীর এই রূপ সম্ভারের পাশে ওয়াংদের ওই হত-শ্রী দুর্গত পল্লী। না আছে সেখনে অভদ্র ক্ষুধার মুখ চাপা দেবার মত স্বল্পতম খাদ্য, না আছে অস্থিসার দেহের নগ্নতা আবৃত করবার মত ক্ষুদ্রতম বস্ত্র।

পুরুষেরা দিনমান রুটী-কেকের কারখানায় খেটে ধনিকদের ভোজন বিলাসের সহস্র উপকরণ তৈরী করে। বালক মজুরেরা সেই ভোর থেকে খেটে খেটে মাঝরাতে বিশ্বের অবসাদে চাপ-বাঁধা ময়লা ও তেল-চর্বিতে চট্‌চটে দেহগুলি মেঝের খড়কুটোর ওপর এলিয়ে দেয়। পরদিন আঁধার না যেতে যেতেই চোখে অতৃপ্ত ঘুম নিয়ে টলতে টলতে এসে উনুনে আগুন দিতে হয়। এই শ্রমের মূল্য যা মেলে তা দিয়ে নিজের হাতে পরের ভোগের জন্য তৈরী ভক্ষ্যের একটি টুকরো কিনে মুখে দিতে কুলোয় না। আর একদিকে এরাই স্ত্রী-পুরুষে মিলে হাড় কালি ক'রে বহুমূল্য ব্রোকেড্, সিল্ক, ফার দিয়ে, কত সুষমা ফুটিয়ে বিভিন্ন পরিচ্ছদ তৈরী করে তাদেরই জন্য, যারা অপরের শ্রম-সৃষ্ট প্রাচুর্যকে নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে ভোগ করে। আর হতভাগ্য শ্রমিকদের ভাগ্যে জোটে কায়ক্লেশে-সংস্থান করা মোটা নীল কাপড়ের শ্রী-ছাঁদহীন যেমন তেমন করে জুড়ে নেওয়া নগ্নতার আবরণ।

এমনি ক'রে পরের ভোগের জন্য খেটে-মরা মানুষের দলের মধ্যে বাস

করতে করতে ওয়াং কত বিচিত্র কথা শোনে। কিন্তু তেমন কাণ দেয় না। অপেক্ষাকৃত বয়স্করা বড় কিছু একটা বলে না। বৃদ্ধেরা নীরবে খাটে, রিক্‌শ টানে, বোঝা বয়, ঠেলায় ক'রে কাঠ, কয়লা বোঝাই ক'রে রাজবাড়ী বা কারখানায় জোগান দেয়! পাথুরে রাস্তায় ভারী ভারী বোঝাই গাড়ীগুলি ঠেলতে ঠেলতে ওদের পিঠ ব্যথা হয়ে যায়, পেশীগুলি দড়ির মত মোটা হ'য়ে ফুলে ওঠে। আধপেটা আহার যা জোটে, দিনান্তে হিসেব ক'রে খায়, রাত্রির সংক্ষিপ্ত অবসরটুকু বেহুঁশে ঘুমিয়ে কাটায়। কোনো কথা বলে না। ওলান্‌-এর মতই এরা বোবা, তেমনি ভাবহীন মুখ। যা দু'একটা কথা বলে, হয় খাবার কথা, নয় পয়সা কড়ির। পয়সা কড়ির মধ্যে পেনির ওপরে ওরা যেতে পারে না, রূপোর মুদ্রার উল্লেখ ওদের মুখে কদাচিৎ শোনা যায়। রূপোর মুদ্রা ওরা প্রায় চোখেও দেখে না। দিন আনে দিন খায়।

বিশ্রামের সময়ও এ মানুষগুলির মুখের পেশী এমন ভাবে কুঞ্চিত হ'য়ে থাকে, দেখে মনে হয় যেন ভয়ানক রেগে আছে। কিন্তু সত্যি রাগ নয়। বছরের পর বছর সামর্থ্যের অতিরিক্ত ভারী বোঝা টানার আয়াসে ওপরের ঠোঁট উল্টে গিয়ে বিশ্রীভাবে দাঁত বেরিয়ে আছে,—তাতেই মনে হয় ওরা যেন সর্বদাই দাঁত খিঁচিয়ে আছে। শক্তি প্রয়োগের প্রাবল্যে চোখ ও মুখের চারদিক গভীর বলি-সংকুল। এরা যে এককালে কেমন ধারা মানুষ ছিল, সে কথা এরা নিজেরাই সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। একদিন মাল-বোঝাই একটা গাড়ী যাচ্ছিল; তাতে ছিল একটা আয়না। তারি মধ্যে নিজের ছায়া দেখে ওদেরই একজন চেঁচিয়ে উঠেছিল: 'বাস্‌রে, কি চেহারা শালার! সঙ্গীরা ওর কথা শুনে হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল। ও নিজেও বোকার মত একটু হাসল। কিন্তু বুঝতে পারল না এরা হাসে কেন। ভীত চোখে চারিদিকে তাকাল, কোনো অপরাধ ক'রে ফেলেনিতো!

ওয়াং লাং-এর কুঁড়ের আশে পাশে অগুন্‌তি কুঁড়ে, একটার ওপর আর একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। অগুণ্‌তি কুঁড়ে, অগুণ্‌তি মানুষ। পুরুষেরা খাটে। মেয়েরা যখন ঘরে থাকে তখন ন্যাকড়ার ফালি জুড়ে জুড়ে তাদের অবিরত বর্ধমান-সংখ্যা সন্তানদের জন্য জামা তৈরী করে; বাইরে যেয়ে কারো ক্ষেত থেকে একটু তরকারী, বাজার থেকে দু'মুঠো চাল চুরি ক'রে আনে; পাহাড়ের গায়ে সারা বছর ঘাস পাতা কুড়োয়; ফসল কাটার সময় কিষাণদের পায়ে পায়ে ফেরে মুরগীর মত, একটা দানা মাটিতে পড়লে ছোঁ মেরে তুলে

নেয়। শ্রীহীন বস্তীর এই জগতে অসংখ্য শিশুর যাওয়া আসা। এরা জন্মায়, মরে, আবার জন্মায়, শেষ পর্যন্ত বাপ মাও হিসেব রাখতে পারে না ক'জন জন্মেছিল, ক'জন মরল। ক'জন যে বেঁচে আছে তাও তারা বড় একটা খবর রাখে না। কারণ বাপ মার সাথে বস্তির জগতের এই সন্তানদের সম্পর্ক শুধু হিসেবের খাতায় কতগুলো পেট, কতগুলোর আহার জোটাতে হবে, এইমাত্র।

এই নর, নারী, শিশু-বালকদের দল বাজারে, কাপড়ের দোকানে, সহরতলীতে আনা-গোনা করে, পুরুষেরা নাম-মাত্র পারিশ্রমিকে মজুরী করে; আর শিশু ও স্ত্রীলোকেরা চুরি করে, ভিক্ষা মাগে, কেড়ে নেয়। এই চুরি-করা, ভিক্ষে মাগা, মজুরী-করা মানুষের ভিড়ে ওয়াং লাং, তার স্ত্রী ও তার সন্তানেরা মিশে এক হ'য়ে গেছে।

বৃদ্ধেরা তাদের জীবন ধারাকে মেনে নেয়। কিন্তু বালকেরা একদিন যৌবনে এসে পৌঁছয়। ওদের মনে অতৃপ্তি দানা বাঁধে। এরা কি যেন বলাবলি করে, অর্ধোচ্চার ক্রোধের গর্জন ফুটে ওঠে এই যুবকদের ভাবে ভাষায়। তারপর জীবধর্মে এরা বিয়ে করে, জীবধর্মে এদের সন্তান হয়। সন্তানের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার দিকে তাকিয়ে চোখের সামনে আঁধার নেমে আসে। উদয়াস্ত জানোয়ারের বাড়া শ্রম—আর তার বিনিময়ে দিনান্তে আধখানা পেট ভরবার মত ধনীদের ফেলে দেওয়া ক্ষুদ-কুড়ো, সেই আঁস্তাকুড়ের পাঁকের মধ্যে ক্রীমি-কীটের জীবন—।···সারা জীবনের এই তো বলা আর না-বলা ইতিহাস··· যতদূর দৃষ্টি চলে চেতনার পারে পড়ে থাকা ওই অন্তহীন পথের ধুলিকণায় একই বার্তা লেখা। যৌবনের উদ্দীপ্ত অসন্তোষের বিক্ষিপ্ত দানাগুলো একত্রিত হ'য়ে এমন একটা ভয়াবহ নৈরাশ্য ও বিদ্রোহ জ্বলে ওঠে যে অবশেষে শুধু কথা দিয়ে নেবান যায় না ··

এমনি কথাবার্তার ফাঁকে একদিন সন্ধ্যায় ওয়াং শুনতে পেল এই বিরাট প্রাচীরটার ওপাশে কি আছে।

অবগত-প্রায় শীতের দিন শেষ। সেদিন হাওয়ায় যেন বসন্তের খবর পাওয়া গেল। বরফ-গলা জলে কুড়ের চারিদিকে কাদা হয়ে রয়েছে। জল গড়িয়ে ভেতরে আসছে। ভেতরে আর শোওয়া চলে না। এই সিক্ততার স্বচ্ছের মধ্যেও বাতাসে কেমন একটা উষ্ণতার আমেজ। ওয়াং চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। খাবার পর ঘুম এল না। বেরিয়ে রাস্তার ধারে গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এইখানটাতেই ওর বাবা রোজ এসে মাটিতে থেব্‌ড়ে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। আজও ভাতের বাটিটা হাতে নিয়েই এসে বসেছে। কুড়েখানা ছেলেদের চেঁচামেচিতে গুল্‌জার। বৃদ্ধের সাথে তার বোবা নাত্‌নীটি, ছেঁড়া কাপড়ের ফালি কোমরে বাঁধা—ফালির এক মাথা তার দাদুর হাতে। মেয়েটা ট'লে ট'লে হাসে আজকাল। ভিক্ষে করার সময় মার বুক আঁকড়ে আর থাকতে চায় না। তা ছাড়া ওলান্‌ও আবার অন্তঃসত্বা এই বিদ্রোহী সন্তটির বোঝা সে আর বইতেও পারেনা। কাজেই নাত্‌নীকে পাহাড়া দিয়ে বৃদ্ধের দিন একরকম কাটে। ওয়াং তাকিয়ে দেখে খুকী প'ড়ে যায়, মাটি ধরে ওঠে আবার পড়ে। বাবা দড়ি ধরে টানে।

ওয়াঙের বুকে মুখে বাতাসের স্পর্শ লাগে। স্মৃতি-সাগর মন্থন ক'রে ওর ফেলে আসা মাটির জন্য গভীর আকুলতা উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। বাবাকে শুধায়: 'এটাই তো গম চাষের সময়, না বাবা?' গভীর স্নেহে বৃদ্ধ উত্তর দেয়: 'আমি বুঝিরে বাপ্‌, তোর কল্‌জের ব্যাথা। এম্‌নি ক'রে আমারও দেশ ছেড়ে, ভিটে-মাটি ছেড়ে দু'দুবার চলে যেতে হ'য়েছিল। বুনবার বীজ পর্যন্ত ছিল না।'

'আবার তো ফিরেছ বাবা।'

'হ্যাঁ বাবা, জমিগুলো যে ছিল—মাটির টান্‌রে, মাটির টান...'

ওয়াং মনে মনে বলে, ওরও তো জমি আছে। ও-ও ফিরে যাবে। এ বছর না হোক্‌ আসছে বছর যাবেই। যতদিন মাটি আছে—ওর ভাবনা কি?

বসন্তের জল-সেক-সিঞ্চিত রস-সমৃদ্ধ অপেক্ষমানা মাটির স্বপ্ন ওয়াঙকে আকুল ক'রে তোলে।

কুড়েতে ফিরে গিয়ে একটু রুক্ষ ভাবে ওলান্‌কে বলে:

'বেচবার মত কিছুই হাতে নেই, নইলে বেচে কিনে চলে যেতাম দেশে। যত ঝামেলা ঐ বুড়োর জন্য—নইলে পা দু'টোকেই চালিয়ে দিতাম। বাবা আর মেয়েটাতো কিছু এই একশ' মাইল হাঁটতে পারবে না। তার ওপর তোমার আবার এই অবস্থা।'

ওলান্‌ একটুখানি জল দিয়ে সন্তর্পণে বাটীগুলো ধুচ্ছিল। ধোয়া হ'লে এক কোণে জড় ক'রে রেখে না উঠেই ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল ধীরে ধীরে: 'এক খুকীটা ছাড়া বেচার মত আর তো দেখিনা কিছু।'

ওয়াঙের গলাটা যেন দুইহাতে টিপে ধরে কে, ওর দম বন্ধ হ'য়ে যায়। চীৎকার করে ওঠে: 'কক্‌খনও মেয়ে বেচব না আমি, কিছুতেই না।'

'আমায় বাবুদের বাড়ী বেচেই না আমার বাবা মা দেশে ফিরে যেতে পারল।' —অতি ধীরে ওলান্ জবাব দেয়।

'তাই খুকীকে বেচতে চাও?

'খালি আমার কথা হ'লে এ কথা মনেও আনতাম না,—বরঞ্চ মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম। কিন্তু মেরে লাভ নেই তো, মড়া মেয়েতো কড়িতে বিকোবে না। ওকে বেচে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব···তোমার দেশে,···তোমার মাটিতে।'

'মেয়ে বেচে পারের কড়ি জোটাব? তার চাইতে জন্ম জন্ম এখানে প'ড়ে পচ্‌ব সেও ভাল।'

আবার বাইরে চলে যায় ওয়াং। যে চিন্তা আপনা থেকে ওর মনে আসার পথ পায়নি—আজ ওলান্এর ইঙ্গিতে সেই চিন্তাই ওকে প্রলোভন দেখায়··· ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বেচারা মেয়েটা—দাদুর হাতে দড়ির বন্ধনে ট'লে ট'লে চলার কি অধ্যবসায়। প্রতিদিন পেট ভ'রে খেতে পেয়ে কত বড়টি হ'য়েছে, বেশ একটু মাংসও লেগেছে গায়ে। কিন্তু কথা কইতে শিখল না—। ওই বোবা শুক্‌না ঠোঁট দু'খানিতে লালের ছোঁওয়া লেগেছে। মুখে হাসি লেগেই আছে সর্বদা। ওয়াঙের চোখে চোখ পড়লে কি খুসীই না হয়ে ওঠে। ওয়াং ভাবে: সর্বনাশী, তোর ওই হাসিই তো আমার কাল। এখন তোকে আমি বেচি কি ক'রে? আমার কল্‌জে খানা যে উপড়ে আসবে! কিন্তু মাটি ওকে দুর্বার টানে পেছন-পানে টানে। অস্থির আবেগে প্রায় কেঁদে ওঠে ওয়াং: 'আর কি ফিরে চোখের দেখাও দেখব না আমার মাটিকে! এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, ভিক্ষে,—তাও আজ পেরিয়ে কাল কুলোয় না—'

অন্ধকারের মধ্যে একটা মোটা রুক্ষ স্বর ভেসে আসে: 'একা তুমি নও হে ভায়া, বহু লোক অমনি আছে এই সহরেই।' ছোট একটা বাঁশের হুঁকো টানতে টানতে এগিয়ে আসে লোকটা। ওয়াংদের ওখান থেকে দুটো ঘর এগিয়েই একটা কুড়েতে ও থাকে। দিনমানে ওকে বড় একটা দেখা যায়না। দিনে ও ঘুমোয়, ওর কাজ রাতে। ঠেলায় ক'রে মাল টানার কাজ। ঠেলাগুলো খুব বেশী বড় ব'লে দিনের বেলা ভিড়ের মধ্যে টানা সম্ভব হয় না। মাঝে মাঝে ভোরবেলা ওয়াং ওকে অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকতে দেখেছে; গ্রন্থিল, বলিষ্ঠ কাঁধ দুটো যেন নেতিয়ে পড়তো। ওয়াং রিক্‌শ নিয়ে বেরুবার সময় ক'দিন ওর পাশ কাটিয়ে গেছে। কোন কোন দিন

কাজে যাবার আগে রাতের ভাঙ্গা আড্ডায় এসে দাঁড়ায় লোকটা। ওয়াং জিজ্ঞাসা করল: 'চিরকাল এ ভাবেই চলবে?' ওর স্বরে তিক্ততা। হুঁকোতে বার তিনেক টান মেরে, মাটিতে বা'র কয়েক থু থু ফেলে লোকটা বলে: 'না হে না, চিরকাল কেন? কিছুই চিরকাল চলে না। সবেরই শেষও আছে, উপায়ও আছে। টাকার কুমীরদের টাকা যখন আর সিন্দুকে ধরেনা, তারও উপায় হয়। আবার আমাদের মত হতভাগারাও ভাগাড়ে প'ড়ে খাবি খায়, তারও পথ হতে দেরী হয়না হে। এই দেখনা গেল বছর, দু-দুটো মেয়েকে বেচতে হ'লো, বুক ধরে তাও তো সয়েছি। এবার যদি গিন্নীর আর একটা মেয়ে হয়, তাকেও কি আর রাখতে পারব? তাকে ও বেচতে হবে। খাওয়াব কি তাকে? আর নইলে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু তার চাইতে বেচাই ভালো, তবুও যাহোক দু'মুঠো খেয়ে বাঁচবে তো! বড় মেয়েটাকে আর বেচতে পারিনি প্রাণে ধরে। কই আর বুক বাঁধব বল, পাথর তো নই। আঁতুড়ে থাকতেও কেউ কেউ মেয়ের গলা টিপে বালাই শেষ ক'রে দেয়। গরীবের এও তো একটা পথ হে ভায়া! এমনি ধারা— কটা না একটা পথ হয়ই সব কিছুর। হবেও—হ'য়ে আসছে চিরকাল। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, বড়লোকদের টাকা আর যখন তাদের সিন্দুকে ধরেনা, তখন তারও একটা উপায় হয়—তাই না? বোধ হয় সে-দিনেরও আর দেরী নেই ভায়া।' বলে মাথা নেড়ে, হুঁকোর নলটা দিয়ে প্রাচীরের দিকে একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে: ,ওখানে দেখেছ?'

রহস্যময় কথা লোকটার, বলে কি সব? ওয়াং বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে যায়।

'আমার একটা অভাগী মেয়েকে,' আবার বলতে আরম্ভ করে: 'বেচতে নিয়ে যাই ওই ওর মধ্যে! এই চোখ দুটো দিয়ে দেখেছি, বল্লে বিশ্বেস করবে না, সে একেবারে এলাহি কারবার! চাকর ব্যাটারা পর্যন্ত রূপো-বাঁধান হাতীর দাঁতের কাঠি দিয়ে ভাত খায়। দাসী-মাগীগুলোর গায়ে মণি মুক্তোর সব গয়না ঝলমল করে। জুতোয় অবধি মুক্ত বসান। মাগীদের দেমাক্ কত! একছিটে কাদা লাগল, বা এই এ্যাতটুকু ফুটো হ'ল, দিলে জুতোগুলো ছুঁড়ে ফেলে মুক্তটুক্ত সুদ্ধু।' খুব জোরে হুঁকো টানে লোকটা। ওয়াং হাঁ ক'রে ক'রে শোনে, রূপকথা! বলে কি? এই দেয়ালটারই ওপাশে, সত্যি—

আবার বলতে আরম্ভ করে লোকটা: 'সব কিছুরই সীমা আছে হে, সব কিছুরই সীমা আছে—টাকার কুমীরদের টাকা যখন বেশী বেড়ে যায় তারও উপায়

আছে।' বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। এবং তারপর যেন এর আগে একটা কথাও বলেনি এমনি ভাবে হঠাৎ বলে ওঠে: 'যাও যাও কাজে যাও যার যার।' তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ওয়াঙের ঘুম আসে না। কত সোনা, রূপো, মুক্তোর ছড়াছড়ি ঐ ওপাশে, ঐতো এতটুকু প্রাচীরের ব্যবধান মাত্র। আর এ পাশে ওয়াং এবং তারই মত কত হতভাগ্য—এক ফালি ন্যাকড়ায় যাদের লজ্জাটুকু কেবল অর্ধাবৃত। শীত বাঁচাবার ছেঁড়া কাঁথারও একটা টুকরো নেই, আছে পিঠের তলায় ছেঁড়া মাদুর আর মাথার তলায় ইঁট।

আবার প্রলোভন জাগে—

'তাই হোক্ বেচেই ফেলি খুকীকে। কত বড়লোকের বাড়ী। আমার এখানে খাবে খুব বেশী নয়তো এক মুঠো ভাত। ওখানে কত কি খাবে। অঙ্গ মণি মাণিকে ঢেকে থাকবে। কিন্তু বড় হ'য়ে চেহারাখানা ভালো হ'লে কোনো বাবুর মনে ধ'রে যায় তবেই না কথা!' আবার ভাবে 'বেচলেই কি আর ওজনে সোনা রূপো ঢেলে দেবে কেউ? অতটুকু মেয়ের আর দামই বা কতটুকু হবে? যদি এমন হয়—দাম যা পাওয়া গেল তাতে যাবার খরচটুকুই কেবল কুলোবে। তবে? তবে কি দিয়ে বলদ কিনব, অন্যান্য জিনিষ পত্রই বা কোত্থেকে আসবে? দেশে যেয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেই তো আর চলবে না। চাষের যন্ত্রপাতি চাই, বীজ চাই, সবই তো চাই। তবে কি কেবল অনাহারে মরার ঠাঁই-বদলের জন্যই মেয়েটাকে ডালি দেব।

ওই লোকটা যে বলে গেল পথ আছে, কৈ পথ? ওয়াং তো কোনো পথ পায়না খুঁজে!

চৌদ্দ

বসন্ত এল, এবং এল কুৎসিৎ বস্তিটার মধ্যেও। পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাঁকে, শুক্‌ন মাঠের বুকে শষ্প-শিশুরা ভীরুভাবে দু'চারটে করে পাতা মেলে দিয়েছে। এতদিন যারা ভীক্ষার দিন অন্নের হীন উপকরণ চুরির রাস্তায় জোটাত, তারা, এখন দু'চারটে শাকপাতা খুঁটে পিটে নিতে পারে। তাই ভোর না হ'তেই অর্ধনগ্ন ছোট বড়-নারী-শিশু বালকের একটা কঙ্কাল-বাহিনী কঞ্চি বা নলঘাসের ঝুড়ি আর টিনের টুকরো, ধারাল পাথর বা ভোঁতা পাথরের

হাতিয়ার হাতে বেরিয়ে পড়ে; পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে বিনা পয়সায়, বিনা ভিক্ষায় যতটুকু পারে খাদ্যের সংস্থান করে। এদের সাথে ওলান্‌ও যায় দুই ছেলে নিয়ে।

ওয়াং আগের মতই কাজ করে। কিন্তু দীর্ঘায়িত তপ্তদিন, প্রখর সূর্যের তাপ, এলোমেলো বৃষ্টি সকলের মন অতৃপ্তিতে ভরে তোলে। শীতের সময় এরা নীরবে কাজ ক'রেছে; ঘাসের জুতো পরে পরে পায়ের তলায় বরফের তীব্রতা সহ্য করেছে, দিনমান পরে ঘরে ফিরেছে সেই অন্ধকার গড়িয়ে গেলে। স্ত্রীলোকের ভিক্ষা আর পুরুষের শ্রমের মূল্যে যা জুটেছে পেটে পুরেছে কথাটি না ক'য়ে। তারপর অসাড়ে ঘুমিয়ে হীনখাদ্য আর অমানুষিক শ্রম শরীরে যে অপচয় ঘটিয়েছে তারি আংশিক ক্ষতিপূরণ ক'রেছে। ওয়াঙের ঘরেও এই ব্যবস্থাই চলেছে। পাড়ার সকলের ঘরেই।

কিন্তু বসন্ত আসতেই একটা চাঞ্চল্য জাগে। এদের অবরুদ্ধ অতৃপ্তি ভাষায় উচ্চারিত হয়। সন্ধ্যার বিলম্বমান আধা-আলো-আঁধারের পরিবেশে এই মানুষগুলি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বসে জটলা করে। এতদিন ওয়াং যাদের দেখেওনি এমন অনেক প্রতিবেশীকেই এই সান্ধ্য-সভায় ও দেখতে পায়। পাড়ার কোনো খবরই ওয়াং রাখে না। কারণ ওলান্ প্রয়োজন ছাড়া কথাই কয় না, নইলে পাড়ার কোথায় কে বৌ ঠ্যাঙায়, কার কুষ্ঠ হয়ে সারা গা ছেয়ে গেছে, অমুকে ডাকাতের সর্দার, এমনিধারা বহু খবর ওয়াং পেত। ও কেবল এই জটলার একধারে দাঁড়িয়ে এদের কথা শোনে।

এদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই শ্রম আর ভিক্ষার উপার্জন ছাড়া আর কোনো সম্বল নাই। কাজেই ওয়াং এই অর্ধ-উলঙ্গ ভিক্ষে-মাগা মজুরখাটা সম্বলহীন মানুষগুলো থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্তরের মানুষ ব'লে জানে। এই উপলব্ধি ওর চেতনায়, ওর অবচেতনের প্রতি অলিগলিতে একেবারে মিশে আছে। কেননা, ও যে পেছনে ফেলে এসেছে রাজার ঐশ্বর্য, ওর ভূমি সম্পদ। ওর সেই ফেলে আসা ধন, ওর চির-জন্মের ধাত্রী, জননী ধরিত্রী, আজও পথ চেয়ে রয়েছে তার নির্বাসিত সন্তানের···। আর এই যে মানুষগুলি, কত ক্ষুদ্র এদের জগৎ। এরা কেবল ভাবে কেমন ক'রে বাঞ্চিত রসনাকে একদিন একটু মাছের স্বাদ দেবে, কেমন ক'রে কাজ পালিয়ে একটা দিন একটু বিনাকাজে কাটিয়ে দেবে, দু'এক পেনি দিয়ে জুয়ো খেলার স্বপ্নও মাঝে মাঝে মনে জাগে এদের।—এদের পশুজীবনের চারপাশের অনটন,

দৈন আর ক্লেদের মধ্যে এরাও হাঁপিয়ে ওঠে, একটু খেলার অবকাশ এরা খোঁজে।

আর ওয়াং খোঁজে ওর মাটিকে, বিভোর হ'য়ে থাকে মাটির স্বপ্নে। দুরাপগত আশার পীড়া বুকে ব'য়ে সহস্র উপায় হাতড়ে বেড়ায়—কি ক'রে ফিরে যাবে। এই ধনীর গৃহ-প্রাচীরের প্রান্তে পড়ে-থাকা আঁস্তাকুড়ের তো ওয়াং কেউ নয়, ওই ধনীগৃহেরও তো কেউ নয় ও। ও মাটির ছেলে—পায়ের তলায় ও পাবে মাটির স্পর্শ। বসন্তে লাঙ্গল হাতে নিয়ে ও মাটি চষবে, তারপর নিজের হাতে কাস্তে নিয়ে কাটবে সেই মাটির বুকের পাকা ফসল, তবেই না ওর বাঁচা, তবেই না ওর জীবনের পূর্ণতা। তাই ও সবার কথা দূরে দাঁড়িয়ে শোনে, ওদের সাথে নিজেকে মেলাতে পারে না। ওর মর্মে সুগোপনে ওর সমস্ত চেতনায় মাটির সুর কেবলি বেজে চলেছে···ওর পিতৃপিতামহের আমলের মাটি······রস সমৃদ্ধ গমের জমি···জমিদার-গৃহ হ'তে ওর স্বোপার্জিত অর্থে কেনা ধানের জমি···।

বস্তিবাসী এই লোকগুলির মুখে কেবলই অর্থের কথা: কে একজন একহাত কাপড় কিনেছে আজ ক'পেনি দিয়ে, আর একজন এই এতটুকু একটা মাছ কিনেছে, বাপ্‌রে, এত দাম ওইটুকু মাছের। আর একজনের রোজগারটা আজ ভালো হয়েছে বেশ।···এমনি ধারা সব কথা। কিন্তু সব শেষে রোজই ওদের আলোচনা এসে দাঁড়ায় প্রাচীরের ওপাশের ওই ধনীগৃহের অধিকারী ও তার লোহার সিন্দুকে। লোহার সিন্দুকে ভরা নাকি প্রকাণ্ড বড় বড় সোনার তাল। বস্তা ভরা টাকা, আর ওর পোষা মেয়েমানুষগুলোর গায়ের মুক্তার গয়না হাতে পেলে এরা যে কি ক'রবে তারি বিচিত্র পরিকল্পনায় সান্ধ্যসভা মুখর হয়ে ওঠে।

এরা কেউ রাজভোগ খাবে থালায় থালায়, কেউ কেবলই দিন রাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে; সহরের সেরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে আঁজলা আঁজলা ডলার ঢেলে জুয়ো খেলবে আর পরীর মত ফুটফুটে মেয়েমানুষ ভাড়া ক'রে ফুর্তি ওড়াবে। কাজ! আবার কাজ! ও নামও না। ওই টাকার কুমীরটার মত গদীর ওপর ঠ্যাং তুলে বসে থাকবে।

ওয়াং হঠাৎ বলে ওঠে: 'আমি ঐ ধনদৌলত হাতে পেলে ভালো দেখে মেলাই জমি কিনি।'

শুনে সকলেই ওকে তেড়ে আসে: 'যেমন চাষা তেমনি চেষো বুদ্ধি

টিকিওলা গেঁয়ো ভূত সহরে হালচালের কি জানবে। বলদের ল্যাজের মোচড় দিতে দিতে হাল ঠেলা ছাড়া চাষার আর কিছু রুচবে কেন?'

ওদের প্রত্যেকেরই ধারণা প্রাচীরের ওপাশের ধনী-গৃহের ঐশ্বর্যের যোগ্যতম অধিকারী সেই, যেহেতু ব্যয়ের সর্বোত্তম কৌশল তারই জানা আছে।

এত বিদ্রূপেও ওয়াং টলে না। মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করে, যাই বলুক এরা, ধন যদি ও পায়ই কোনোদিন—সে সোনা হোক, রূপো হোক, হীরে জহরৎ হোক, ও সব দিয়েই জমি কিনবে। যে ভূমি-সম্পদে ওয়াং ধনী, তারই জন্যে দিনের পর দিন আকুল হয়ে ওঠে ওয়াং।

নগরে ওরই চারপাশে প্রতিদিন যে বিচিত্র ঘটনা ঘটে চলেছে—ভূমির স্বপ্নে বিভোর ওয়াঙের কাছে সব স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ও কোনো প্রশ্ন করে না। সব কিছু বৈচিত্র্যকে ও মেনে নিয়েছিল। কত কিছুই ঘটছিল চারিদিকে—কতগুলো কি সব কাগজ কারা নানা জায়গায় বিলি ক'রে বেড়ায় ওকেও দিয়েছে মাঝে মাঝে।

কখনও অমনিও বিলি ক'রেছে, কখনও বিক্রিও ক'রেছে কাগজগুলো। সহরের গেটে, দেয়ালেও ওয়াং ঐসব কাগজ সাঁটা দেখেছে। ও লেখাপড়া জানে না, কাজেই কাগজের বুকের কালো দাগগুলি ওর কাছে রহস্যই থেকে গেছে।

প্রথমদিন কাগজ পায় ও একজন বিদেশীর কাছ থেকে, সেই যাকে ও একদিন না জেনে রিক্স ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, তার মত। এ লোকটা পুরুষ—ভয়ানক লম্বা, রোগা, ঝড়-বিধ্বস্ত গাছের মত চেহারা, শ্মশ্রু-সংকুল, পাথরের মত কঠিন মুখে একজোড়া নীল চোখ। প্রকাণ্ড উঁচু টিকোল নাকটা যেন দুই গালের বেড়া অতিক্রম ক'রে বহুদূরে চলে গেছে দুই পাশ ডিঙিয়ে বেরিয়ে-পড়া নৌকর গলুইর মত। লোকটার অদ্ভুত চোখ আর ঐ ভীষণ নাক দেখে তার হাত থেকে কিছু নিতে ওয়াঙের ভয় হচ্ছিল, না নিতে ভয় হচ্ছিল আরো বেশী। কাজেই সে ওর হাতে যা গুঁজে দিল ও ধ'রে থাকল খানিকক্ষণ। কাগজটা দেবার সময় ওয়াং দেখল হাতখানা লাল, যেন ফেটে পড়ছে, আর কোমল। লোকটা চ'লে গেলে পর সাহস ক'রে হাত খুলে দেখল— একটা ছবি। একটা কাঠের মাথায় আড়াআড়ি ক'রে রাখা আর একখানা কাঠ, আর তাতে ঝোলান একজন সাদা মানুষ। পরণে নেংটি, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া। বন্ধ চোখ দুটি যেন ঠোঁটের কাছে

নেমে এসেছে, দেখলে মনে হয় লোকটা মরে গেছে। ওয়াং শিউরে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে ওর কৌতূহলও বেড়ে উঠল। নীচে কি যেন লেখা।

রাত্রিবেলা ছবিটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখাল ওয়াং। সেও নিরক্ষর। ছবিটার অর্থ কি হতে পারে এ নিয়ে বাপ-ব্যাটা আর দুই নাতির মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো। ছেলেরা ভয়মিশ্রিত উল্লাসে দেখিয়ে বলে :

'দেখছ কেমন গল্ গল্ ক'রে রক্ত পড়ছে।'

'লোকটা', দাদু বলে : 'নিশ্চয় বদমায়েসের হাঁড়ি ছিল। তাই দোল খাচ্ছেন এখন।' কিন্তু ওয়াঙের মনে কেমন একটা ভয় জড়িয়ে থাকে। ভাবে, বিদেশীটা ওকে ওটা দিতে এল কেন, হয়তো বা তারই কোনও আত্মীয়স্বজন হবে ছবির লোকটা। ওরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়ত কেউ করেছে বেচারার ওপর, আর তারই প্রতিশোধ চাইছে ওই বিদেশী তার নিজের দেশবাসীর কাছে।

যে রাস্তায় বিদেশী ওকে কাগজটা দিয়েছিল, ভয়ে ওয়াং আর সে রাস্তা মাড়ায় না। ক'দিন পরে কাগজটার কথা সবাই ভুলে গেল, আর অন্যান্য কুড়িয়ে আনা কাগজের সাথে ওটাও ওলানের জুতো মেরামতের কাজে লাগল।

এর পর আর একজন ওয়াংকে আরো একখানা কাগজ দিল। লোকটা এই সহরেরই। পোশাক পরিচ্ছদ ফিট্‌ফাট্, বয়সে তরুণ। ওর চারধারে ভিড় জমে গেল। ভিড়ের মধ্যে কাগজগুলো ছুঁড়ে দিতে দিতে ছেলেটি চেঁচিয়ে কি যেন সব বলছিল। এবারের কাগজেও ছবি ছিল, কিন্তু অন্যরকম। তেমনি মৃত্যুর ছবি রক্তের ধারায় লেখা। তবে এবারের মৃত ব্যক্তি শ্বেতকায় নয়—ওরই মত একজন, তামাটে রং, গভীর কালো চুল, চোখদুটো ছোটো খাটো, নিতান্ত সাধারণ মানুষ। পরণের নীল পোশাকটি শতছিন্ন। মৃতদেহটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দৈত্যের মত চেহারা বিপুলকায় আর একটা লোক, হাতের লম্বা ছোরা দিয়ে মৃতদেহটার ওপরই বার বার আঘাত ক'রছে। কি বিভৎস দৃশ্য। ওয়াং ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। নীচের লেখাগুলো পড়ে ছবিটার রহস্যের সমাধান যদি ও ক'রতে পারত। পাশের লোকটাকে জিজ্ঞাসা ক'রল : 'পড়তে পারো ভাই, এ সাংঘাতিক ছবিটার মানে একটু বুঝিয়ে দেবে ?'

'শোনোনা মন দিয়ে, আমাদের তরুণ নেতাই তো বুঝিয়ে দিচ্ছে,

লোকটা বলল। ওয়াং মন দিয়ে শোনে। এসব কথা ও আগে শোনেনি কখনও।

'এই যে মৃতদেহটা দেখছ এ হচ্ছি আমরা', বুঝলে? আমরা মরে গেছি। কিন্তু মরে গিয়েও কি রক্ষে আছে। ওই রাক্ষসটা মড়ার ওপরই খাঁড়ার ঘা চালাচ্ছে। ওটা যে মরা, মরে কাঠ হয়ে আছে, সে হুঁসও নেই পিশাচটার। স্রেফ্ মারবার নেশায় ও মারছে। ওটা কে জানো? ও ধনিক, ও পুঁজিপতি। আমরা মরে গেলেও ওরা মারে। তোমরা, মানে আমরা, দরিদ্র নিপীড়িত, রিক্ত, সর্বহারা। কিন্তু কেন? ওই ধনীরা সব শুষে নিঃশেষ ক'রে নেয় বলে—'

নূতন কথা শোনে ওয়াং। এতদিন ওয়াং জেনে এসেছে দারিদ্র্যের কারণ, আকাশের অদাক্ষিণ্য আর অতিবৃষ্টি। ঠিকমত রোদ-বৃষ্টি হ'লে ফসল উপচে পড়ে। তখন কোথায় দারিদ্র্য; ওয়াং নিজেও তো তখন রীতিমতো বড় লোক। কাজেই উদগ্র কৌতূহলে আরো অভিনিবেশ দিয়ে ওয়াং শুনতে চেষ্টা করে, এই পুঁজিপতি না কি যেন ঐ লোকটি বলল, হয়ত ওরা বৃষ্টির মন্ত্রতন্ত্র জানে। কিন্তু যুবক অনর্গল আরো কত কি ব'লে যায় অথচ ঐ কথার নামও করে না। তখন ওয়াং একটু সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'শুনছেন, ও মশায়, ওই যে কি বললেন বড়লোকেরা না পুঁজিপতি কারা —ওই যারা আমাদের সব কেড়ে নেয় বলছিলেন, তাদের কাছে কোনমতে বৃষ্টির মন্ত্রটা শিখে নেওয়া যায় না একবার। চাষবাসের বড়ো সুবিধে হয় তা'হলে। আর চাষবাসটা ভালো হলেই তো দুদিনেই বড়লোক হয়ে যেতে পারি সব।'

তীব্র ঘৃণা আগুনের মত জ্বলে ওঠে যুবকের দুই চোখে। সে উগ্রস্বরে জবাব দেয়: 'মূর্খ কোথাকার। হবেই বা না কেন—যা সাতহাত একখানা টিকি ঝুলছে। আরে মূর্খ। বৃষ্টি আপনি না হ'লে কারো সাধ্যি নেই মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বৃষ্টি নামায়। তাছাড়া আমাদের সাথে তার সম্পর্কটা কি। আমি বলছি—এই ধনিকদের পুঁজি যা আছে, তা তাদের সিন্দুক থেকে একার ভোগে না লেগে যদি আমাদের সকলের মধ্যে সমানভাবে বাঁটোয়ারা হয়ে যায়, তবে বৃষ্টি হোক চাই না হোক, কুছ পরোয়া নেই, টাকা আর খাবার কোনোটারই অভাব হবে না কা'রো।'

শ্রোতাদের বিপুল চীৎকারে আকাশ মথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওয়াং ফিরে যায় অতৃপ্তি নিয়ে। ওর জমি রয়েছে। টাকা। খাবার। খাবার তো

খেলেই খতম্। কিন্তু ঠিক মত রোদ জল না হ'লে তখন? তখন উপোস ঠেকায় কে?

যাই হোক আগ্রহের সঙ্গেই ও কাগজগুলো বাড়ী নিয়ে চলল। কারণ ও জানে জুতোর সুকতলী মেরামত করার জন্য ওলান্ যথেষ্ট কাগজ পায় না।

বস্তির অনেকেই যুবকের কথা খুব আগ্রহভরে শুনেছে! বিশেষ আগ্রহের হেতুটা, প্রাচীরের ওপাশের বড়-বাড়ীর ভরা-সিন্দুক। মাঝখানে ঐ তো খানকয়েক মাত্র ইটের বাধা। মোটা লাঠির কয়েকটা গুঁতো, বাস্! বোঝা বইবার বাঁকগুলোই যথেষ্ট, আবার লাঠি!

বসন্তের চঞ্চল হাওয়ায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে দিয়ে গেল ঐ যুবক এবং তার মতো আর অনেকে। ওরাও মানুষ কিন্তু মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার-চ্যুত হয়েছে, অন্যায়ভাবে সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ওদের কাছ থেকে। আজ যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ওঠে এই পুরানো সত্যটাই নূতন করে চোখে পড়ে। বস্তির মানুষগুলো বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের মত আলোড়িত হয়ে উঠেছে। আজ ওদের চোখে পড়ে ওদের ওই শোণিত-ক্ষরা শ্রম আর তার পরিণতিতে এই অসুন্দর পশুর জীবন।

প্রতি সন্ধ্যায় ওরা ওই আলোচনাই করে, দিনের পর দিন। যারা এখনও যুবক, যাদের পেশীর শক্তি এখনও ক্ষয়িত হয়নি, তাদের ধমনীর রক্তের ঝঞ্ঝা জাগে। একটা উদ্দাম হিংস্রতায় ওরা শীতের তুষারে কেঁপে-ওঠা নদীর মত ভেতরে ভেতরে ফুলতে থাকে।

ওয়াং দেখে, শোনে,—এদের ধূমায়িত ক্রোধবহ্নির উত্তাপ ওর মনেও এসে লাগে। কিন্তু ওর সারা চেতনায় একমাত্র চাওয়ার কেন্দ্র ওর মাটি,—পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ— আর কিছু নয়—আর কিছু চায় না ওয়াং।

আজকাল রোজই একটা না একটা নতুন কিছু ঘটে। সেদিন একেবারে ওর চোখের সামনেই ঘটে গেল, কিন্তু ও কিছুই বুঝল না। ভাড়ার আশায় ও খালি রিক্শ নিয়ে যাচ্ছিল। একটা লোক দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। হঠাৎ একদল সশস্ত্র সৈন্য এসে ঘেরাও করল লোকটাকে। সে প্রতিবাদ ক'রতেই তারা ওর মুখের সামনে ছোরা খুলে ধরল। ওয়াং অবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল। পর পর ক'জনকে ধরল সৈন্যরা। ওয়াং দেখল ওরা সবাই খেটে খাওয়া লোক। ওর চোখের সামনেই ওর একজন প্রতিবেশীকেও ধরল।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে ওয়াং লক্ষ্য করল এরা সব ওরই মত নেহাৎ সাধারণ মানুষ। কিন্তু কি ক'রেছে ওই নিরীহ বেচারারা? ওদের কেন অমন ক'রে ধরছে, ওয়াং ভাবে। ভয় পেয়ে গলির একধারে রিক্শটা ঠেলে দিল। তারপর দৌড়ে একটা গরম জলের দোকানে ঢুকে প'ড়ে বড় বড় জলের হাঁড়ি-গুলোর পেছনে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে রইল; পাছে ওকেও ধরে। সৈন্যরা চলে যেতে বেরিয়ে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করল: 'এসব কি?'

বুড়ো দোকানী ঔদাসীন্যের সাথে উত্তর দিল: 'যুদ্ধ্ টুদ্ধ্ হ'চ্ছে হয়তো কোথায়। কেন যে এসব লড়াই ফড়াই কে জানে। লড়াই আর লড়াই। চিরটা কাল ওই চলবে।'

'লড়াই হবে তো আমার পাশের ও লোকটাকে ধরল কেন ওরা? ওসব লড়াই ফড়াইর ধারপাশ দিয়েও আমরা যাই না। খাটি, খাই, বাস্ কি অপরাধ করল ও লোকটা?' বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করে ওয়াং।

'কে জানে বাপু কেন। সেপাইরা বোধ হয় লড়াইয়ে যাচ্ছে। ওদের মাল-পত্তর বইবার কুলি টুলি চাই তো—। তাই হয়ত ধ'রছে। কিন্তু তুমি এসেছ কোত্থেকে হে! এ সহরে এ তো নতুন ব্যাপার নয়,—এ তো হামেশাই হচ্ছে।' ওয়াং হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করে আবার: তারপর—তারপর-ওরা। টাকা দেবে না—মাইনে!—কি রকম মাইনে দেয়?'

অতিবৃদ্ধ দোকানী, জলের হাঁড়ি ছাড়া ওর আর কোনো আসঙ্গ নেই; এসব ব্যাপারে ওর বড় একটা কৌতুহল নেই। একটু তাচ্ছিল্যের সাথেই জবাব দেয়:

'মাইনে না হাতী! মামার বাড়ী পেয়েছে? হুঁঃ মাইনে। দেবে দু'টুকরো শুক্‌না রুটি ফেলে, ডোবা থেকে আঁজলা ভরে জল খাও আর রুটি চিবোও, তারপর কাজ হ'য়ে গেলে বাস্ ভাগো বাড়ী—অবশ্যি ঠ্যাং দুটোতে যদি বাড়ী পর্যন্ত আসার শক্তি থাকে। নইলে মর রাস্তায় পড়ে।'

ওয়াং আতঙ্কে শিউরে ওঠে: 'কিন্তু সকলেরই তো পুষ্যি আছে—'

'ও:' একটা হাঁড়ির ঢাকনা ফাঁক ক'রে জল ফুটেছে কিনা দেখতে দেখতে বৃদ্ধ ব্যাঙ্গের সুরে বলে: 'সে ভাবনা ভেবে তো ওদের ঘুম হ'চ্ছে না।'

একরাশ ধোঁয়ার জালে বৃদ্ধের বলিকীর্ণ মুখখানা প্রায় ঢেকে যায়। বাষ্পের আবরণ কেটে যেতেই তার চোখে পড়ল সৈন্যরা আবার ফিরে আসছে। ওয়াং হাঁড়ির পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছিল না।

রাস্তা একেবারে শূন্য। দেহে সামর্থ্য আছে এমন একটি প্রাণীও রাস্তায়

নেই। দোকানী তাড়াতাড়ি বলে: 'আরে মাথা নীচু কর, মাথা নীচু কর—ওরা ওই আবার এসেছে।'

ওয়াং নীচু হ'য়ে একেবারে মাটির সাথে মিশে রইল। রাস্তায় বন্ধুর পাথরে খট্ খট্ ক'রে বুট বাজিয়ে সৈন্যরা চলে যায় পশ্চিম দিকে। শব্দ মিলিয়ে গেলে লাফ দিয়ে উঠে ছিট্‌কে বাইরে গিয়ে রিক্‌শটা নিয়ে সোজা বাড়ীর দিকে দৌড়ায় ওয়াং।

শাক পাতা কুড়িয়ে সবে ওলান্ ফিরেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় ওয়াং সবিস্তারে সব বর্ণনা করল। ওঃ কি বাঁচাটাই ও বেঁচে এসেছে। মনে করতেই আবার নূতন ক'রে ভয়ে কেঁপে ওঠে, যেন সত্যি সত্যি ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওর শঙ্কিত কল্পনায় ভেসে ওঠে—বুড়ো বাবা, ওলান্—সব না খেয়ে মরছে। ও নিজে মরে গেছে লড়াইতে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌ছে,—আঃ, আর ফিরে যাওয়া হ'ল না,—আর মাটি-মাকে দেখা হ'ল না; একবার চোখের দেখাও না। ভয়ের কাতরতা নিয়ে ও ওলান্‌এর দিকে তাকিয়ে বলে:

'এবার মেয়েটাকে না বেচলে চলছে না। আর থাকছি না—এবার ফিরবই।'

ওলান্ শুনল,—ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর তার সাধারণ স্বভাব-নির্বিকার স্বরে বল্‌ল: 'সবুর কর ক'দিন। কেমন কেমন সব শুনছি যেন চারিদিকে।'

ওয়াং দিনের বেলা আর বাইরে যায় না। রিক্‌শটা বড়খোকাকে দিয়ে মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছে। রাতের বেলা যায় কুলির কাজে। রোজগার এখন আগের অর্ধেক হ'য়ে গেছে। সারা রাত বিশাল বিশাল বোঝাই বাক্স টানে, এত বড়ো বাক্স—জন বার লোকের জিভ বেরিয়ে যায় তুলতে। সারা রাত অন্ধকার ঢাকা পথে সামর্থের অতিরিক্ত শক্তি-প্রয়োগে বোঝা বওয়ার বীভৎসতা। উলঙ্গ দেহ হ'তে দর্ দর্ ক'রে ঘাম ঝরে; শিশির-ভেজা পিছল পথের নগ্ন পদ পিছলে যায় প্রতিমুহূর্তে। সামনে এক ছোকরা মশাল নিয়ে পথ দেখিয়ে চলে। মশালের আলো শ্রমিকদের স্বেদ-সিক্ত মুখে আর নীচেকার ভেজা পাথরে প্রতিফলিত হ'য়ে প্রেতলোকের বীভৎসতার সৃষ্টি করে।

ভোরের আগেই ওয়াং ধুকৃতে ধুকৃতে ফেরে। কিছু মুখে তোলার মতও শক্তি থাকে না। ঘুমে ঢুলে পড়ে। দিনের বেলা সৈন্যরা রাস্তায় রাস্তায় ফেরে মজুরের খোঁজে। ওয়াং ওর কুঁড়ের এক কোণে এক গাদা খড়ের পেছনে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

কিসের লড়াই, কেই বা লড়ে ওয়াং কিছু জানে না। কিন্তু ক্রমেই একটা

আতঙ্কে সারা সহরটা থম্‌থমে হ'য়ে ওঠে। রোজ ওরা দেখে সহরের অভিজাত সব ধনীরা সপরিবারে ধনরত্ন এবং মূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে নদীর ধারে আসে, তারপর জাহাজে ক'রে কোথায় চলে যায়। বড় বড় মোটর লরী ক'রেও যায় কেউ কেউ। এদের বিছানাগুলো পর্যন্ত সাটীনে মোড়া,—ওরা দেখেছে। ওয়াং দিনে বেরোয় না। ওর ছেলেরা বড় বড় চোখ ক'রে এ সব পলায়নের বিচিত্র কাহিনী ওকে শোনায়।

'একটা লোক যাচ্ছিল বাবা—ইয়া হাতীর মত ধুমসো চেহারা! ঠিক আমাদের সেই মন্দিরের ঠাকুর মূর্তির মত। আর একজনের কি সুন্দর টুকটুকে হলদে জামা পরা, কি সুন্দর চক্‌মক্‌ করছে! সিল্কের জামা, না বাবা? বুড়ো আঙ্গুলে সোনার আংটি, আর তাতে সবুজ রং-এর কাঁচের মত কি যেন বসান। কি নরম, মাখনের মত তুলতুল করছে গা। খুব খায় আর তেল মাখে ওরা না?'

আর এক ছেলে বলে:

'পেল্লায় পেল্লায় পাহাড়ের মত কি সব বাক্স, মা! সে কি একটা দু'টো?—অগুন্তি। একজনেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওর ভেতরে কি আছে? সে বললে কি সোনা-রূপো ভরা নাকি সব একদম! আর বলে কি জানো? বড়লোকেরা নাকি সব নিয়ে যেতে পারবে না, ও সব নাকি একদিন আমাদের হবে। তাই না কি, মা। সত্যি?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে ছেলে বাবার দিকে তাকায়।

ওয়াং ছোট্ট একটুখানি কাটা জবাব দেয়: 'তা আমি কি ক'রে জানব, কে ব'লেছে ওর মাথামুণ্ডু।'

'বলোনা, বাবা, সত্যি নাকি ওসব আমাদের হ'য়ে যাবে। যাইনা এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসি না তবে। আমার ভয়ানক পিঠে খেতে ইচ্ছে করে, তিলের মিষ্টি পিঠে নাকি ভারী চমৎকার খেতে। কক্‌খনও খাই নি।'

একথা কাণে যেতেই বৃদ্ধ তার স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠে আপন মনে বলে: 'ফসল ভালো হ'লে নবান্নের সময় অমন কত পিঠে খেয়েছি। পিঠের জন্য তিল রেখে তবে বেচেছি—।'

ওয়াঙের মনে পড়ে যায়, সেবার নতুন বছরে, চালের গুঁড়ো চর্বি আর চিনি দিয়ে কি চমৎকার পিঠে বানিয়েছিল ওলান্‌। এখনও জিভে জল আসে। যে দিন চলে গেছে, তারই জন্য আকাঙ্ক্ষার বেদনায় ওর বুকটা মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। যদি একবার কোনমতে ফিরে যেতে পারে—।

হঠাৎ ওর কেমন মনে হয়, আর একদিনও ওই বিশ্রী কুঁড়েটায় ও শুতে পারবে না, পা-টা অবধি ছড়াবার মত পরিসর নেই। পারবেনা, পারবেনা আর একটা রাতও অমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে।—পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে কোমরের সাথে দড়ি বেঁধে, ঝুঁকে পড়ে জানোয়ারের মত অত বড় বড় বোঝা টানতে পারবে না। দড়িগুলো মাংসতে যেন কেটে বসে। বন্ধুর রাস্তাটার প্রত্যেকটা পাথর ওর চেনা হ'য়ে গেছে--ওরা ওর পরম শত্রু। কিন্তু চাকার দাগগুলো পরম মিত্রের মত ওকে বহু আঘাত থেকে বাঁচায়। ঐ দাগে দাগে পা ফেলেই তো ওয়াং রাস্তায় মাথা উঁচিয়ে থাকা পাথরগুলো থেকে আত্মরক্ষা ক'রেছে। নইলে হোঁচট খেয়ে বহু কষ্টোপার্জিত রক্তের কত অপচয় ঘট্‌ত। কত কালো রাত্রির অন্ধ তমিস্রর, বিশেষ ক'রে বাদলা রাতে কত সময় ওর মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে ঐ ভেজা পাথরগুলোর ওপর। ওরাই যেন ওর ঘাড়ের বোঝাগুলোর সাথে ঝুলে ঝুলে ওগুলোকে অত ভারী করে তোলে !

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ওয়াং। ছেলেরা ভয় পায়। বৃদ্ধ বাবা বিহ্বল বিস্ময়ে ছেলের দিকে তাকায়, এদিকে ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে, মায়ের কান্না দেখে শিশু যেমন করে।

আবার ওলান্ তার ব্যঞ্জনাহীন স্বরে বলে :

'অস্থির হ'চ্ছ কেন, আর একটু সবুর করনা বাপু। দেখতে পাবে'খন শিগ্‌গিরই। সবাইতো বলছে।'

কুঁড়েতে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াং পায়ের শব্দ শোনে। যুদ্ধগামী সেনাদলের পায়ের শব্দ। কখনও চাটাই একটু ফাঁক ক'রে দেখে সেই চলমান পায়ের অগণিত সংখ্যা। চামড়ার জুতো পরা, পটি পরা আঁটা পা, জোড়ায় জোড়ায় সুবিন্যস্ত ছন্দে মার্চ ক'রে চলেছে।

রাতের বেলা কাজ করতে করতে ওয়াং কতদিন ওদের পাশ দিয়ে মার্চ ক'রে যেতে দেখছে। নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে মশালের আলোয় ক্ষণিকের জন্য ওদের কঠিন মুখগুলো দেখে চমকে উঠেছে ওয়াং। এখন ও ভয়ে কেমন যেন বিকারগ্রস্তের মত হ'য়ে পড়েছে। মোহাচ্ছন্নের মত মাল বয়—বাড়ী ফিরে কোনো মতে একমুঠো ভাত মুখে গুঁজে শুয়ে পড়ে নেশাগ্রস্তের মত, খড়ের গাদার আড়ালে প'ড়ে ঘুমোয়। আজকাল কেউ কারো সাথে কথা কয়না। ভয়ে গোটা সহরটার যেন নাড়ীর স্পন্দন থেমে গেছে। যে যার কাজ সেরে ঘরের ভেতরে দরজা এঁটে বসে থাকে। সন্ধ্যার সেই মজলিশ নেই--

দোকানপাট সব বন্ধ। দুপুর বেলা সহরটাকে মনে হয় যেন মৃতের পুরী।

চারিদিকে যেন হাওয়ায় কাণাকাণি—শত্রু এসে পড়েছে। যাদের কিছুমাত্র আছে তারা শঙ্কিত হয়। ওয়াঙের কোনো ভয় নেই, বস্তীর কারুরই নেই। থাকার কথাও নয়। কে শত্রু, কার শত্রু, কেমন শত্রু এরা কিছুই জানে না। হারাবার মত বিত্ত এদের কারো ঘরে নেই। যা আছে ওই ধুক্‌পুকে প্রাণটা। কিন্তু এদের মতো মানুষের প্রাণ যাওয়াটাও তত সহজ নয়। এলই বা শত্রু। এর চাইতে বড় দুর্গতি আর কি হবে?

কর্তারা মালটানা মজুরদের জানিয়ে দিল তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, যেহেতু ব্যবসা বন্ধ হ'য়েছে। ওয়াং এখন বেকার। দিনরাত মড়ার মত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল ক'দিন। বেকারত্বের সাথে বেঅন্নত্বেরও যোগ আছে—এটা ওয়াংকে বুঝতে হ'লো দুদিনেই। হাতের সামান্য সঞ্চয়ও ফুরোল। এখন ওয়াং পাগল হয়ে ওঠে।

লঙ্গরখানাগুলোর দোর বন্ধ হ'লো। যাঁরা নিরন্নকে অন্ন দিয়ে ওপারের পথ নিরঙ্কুশ ক'রছিলেন, তাঁরা এখন ঘরে খিল এঁটে এপারের পথের ভাবনা করেন। এখন নাই অন্ন, নাই বস্ত্র, নাই রাস্তায় মানুষ, ভিক্ষাও তাই বন্ধ।

ওয়াং মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে কুঁড়ের ভিতরই বসে থাকে। ওর চোখে চোখ রেখে ভেজা কোমল স্বরে বলে: 'তাই ভালো মা, তাই ভালো। ওই বড় বাড়ীটায় রেখে আসি তোকে। কত খাবি দাবি, নতুন নতুন কত জামা কাপড় পরবি।'

অবোধ শিশু বোঝে না, হাসে। ক্ষুদ্র হাত দু'খানি বাড়িয়ে বাবার চোখ ধরতে যায়। ওয়াঙের বুকটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে। অসহিষ্ণু হ'য়ে চীৎকার ক'রে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে:

'বাবুদের বাড়ীতে যখন ছিলে তোমায় মারধোর করত?

'রোজ'—নির্লিপ্ত, মোটা স্বরে ওলান উত্তর দেয়।

'কি দিয়ে মারতো?'

'কি দিয়ে আবার? খচ্চর তাড়ানো চামড়ার চাবুক দিয়ে। হাতের কাছেই সর্বদা ঝোলান থাকত কিনা ওটা।' নিতান্ত সাধারণ নিষ্প্রাণ স্বর।

ওয়াং জানে ওলান্ ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তবুও আশ্বস্ত হবার মত একটু কিছু শুনতে পাবার আশায় আবার জিজ্ঞাসা করে:

'মেয়েটা বেশ ফুটফুটে হয়ে উঠেছে। চেহারা ভালো হ'লেও মার খায়

দাসীরা? তেমনি নির্বিকার জবাব দেয় ওসান্, 'সে বাবুদের খেয়াল। সোহাগ ক'রে শয্যায়ও শোয়ায়, আবার মেরে হাড় মাংস এক ঠাঁইও করে।'

ওসানের বিকারহীন আটপৌরে কণ্ঠ হ'তে ওয়াং ধনীগৃহের অন্তঃপুরের ইতিহাস শোনে। অর্থ দিয়ে কেনা ক্রীতদাসী ধনী বাবুদের যথেচ্ছ-ভোগের পণ্য। যেদিন যার হুকুম বিচার না ক'রে তারই শয্যায় সেদিন নিজেকে ডালি দিতে হবে। তরুণ বাবুরা দর কষাকষি করে, ভাগাভাগি করে,—আজ এ নিলে তো কাল অমুককে দিতেই হবে, এমনি ধারা। তারপর পুরানো হ'য়ে গেলে, ছেঁড়া জুতোর মত ছুঁড়ে দেয়। আর মনিবের পাতের উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভৃত্যের দল কাড়াকাড়ি করে।

ওয়াং তীব্র বেদনায় কাতর হ'য়ে শিশুকে বুকে চেপে ধরে। একটা তলহীন কান্নার আবর্তে পড়ে ও অসহায় ভাবে কেবলি ঘুরপাক খেতে থাকে। উপায় নেই, কোনো উপায়, কোনো পথ নেই আর।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ। একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে আকাশটা যেন ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সকলে মাটিতে উবু হয়ে প'ড়ে মুখ গুঁজে থাকে, ওই অতিকায় কুশ্রী গর্জনটার থেকে কি যে সাংঘাতিক সংকট ঘনিয়ে উঠবে কে জানে। ছেলেটা ভয়ে চীৎকার জুড়ে দেয়।

হঠাৎ-ই আবার থেমে গেল গর্জনটা—যেমনই হঠাৎ এল, তেমনি হঠাৎ গেল। তারপর পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা,—পৃথিবীটাই যেন থেমে গেল। ওসান্ মাথা তুলে বলে: 'মিথ্যে শুনিনি তাহ'লে। শত্রুই তো এসেছে দেখছি, সহরের গেট ঐ ভেঙ্গে ফেলল।'

ওসান্এর কথা শেষ হবার আগেই একটা বিরাট কোলাহল উঠল। কোলাহলের একটা বন্যা যেন সারা সহরকে প্লাবিত করে দিল। প্রথমটা অস্পষ্ট, যেন বহু দূর থেকে ছুটে আসা প্রবল ঝড়ের চাপা গোঙানী। ক্রমেই কাছে আসতে লাগল,—স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর—উচ্চ হতে উচ্চতর, উন্মত্ত মানুষের চীৎকার—কাছে আরো কাছে—প্রতি রাস্তায়—প্রতি গলিতে—বস্তির একেবারে কাছে—মর্ত্ত্য এবং আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল।

ওয়াং ওঠে সোজা হয়ে বসে। একটা নামহীন ভীতি সরীসৃপের মত ওর মাংসের ওপর গুড়ি মেরে বেড়াতে লাগল—রোমকূপে, চুলের গোড়ায় গোড়ায় যেন কিলবিল করতে লাগল। আতঙ্কে, রোমাঞ্চিত দেহে ও কাণ পেতে শোনে···কেবলি মানুষের চীৎকার—আর কিছু না।

একেবারে কাছেই। প্রাচীরটার গায়ে একটা বিরাট কপাট যেন কজার ওপর মোচড় খেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠে অনিচ্ছায় খুলে গেল। তারপর একেবারে হঠাৎ সেই লোকটা, সেদিন সন্ধ্যার সময় বলেছিল ওয়াংকে—'সব কিছুরই পথ আছে,—ওয়াঙের কুঁড়ের মধ্যে উঁকি মেরে বলে উঠল: 'আরে, আচ্ছা মানুষ তো। এখনও ঠায় বসে আছে? আরে বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস। সময় হ'য়ে গেছে। দেখছ না টাকার কুমীরটার বাড়ীর দরজা খুলে গেছে। আমাদেরই জন্য খুলেছে এই কথাটা মাথায় ঢুকল না এতক্ষণ। কি বলে ছিলাম সেদিন!'

চকিতে ওলান্ সেই লোকটার হাতের তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে গিয়ে উধাও হয়ে গেল। ওয়াং ধীরে ধীরে ওঠে স্বপ্নাবিষ্টের মত। খুকীকে মাটিতে শুইয়ে বাইরে আসে।

বড় বাড়ীটার লোহার গেটের সামনে—চীৎকারোন্মত্ত অসংখ্য মানুষের একটা তরঙ্গক্ষুব্ধ বিরাট সমুদ্র। সবাই সাধারণ মানুষ, ওয়াঙেরই মত। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত হিংস্র গর্জন করতে করতে ওরা পাগল হ'য়ে সামনের দিকে ছুটছে…ঠেলাঠেলি মারামারি ক'রছে অন্ধ আবেগে। এদের কোলাহলই ওয়াং শুনেছিল ফুলে-ফেঁপে-ফেটে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে। ওয়াং বুঝল, পশুর মত অভদ্র গর্জন করতে করতে ছুটছে এই যে অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল জীবের দল এরাই সেই বুভুক্ষিত, সর্বহারা মানুষ যারা এতদিন দুর্গতির কারাগারে বন্দী ছিল। আজ সে কারাগারের আগল ভেঙ্গেছে, একটা স্বল্পায়ু মুহূর্তের জন্য এরা যা খুশী তা করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে। তাই ওরা আজ দিশাহারা হয়ে মত্ত নেশায় ওই খোলা গেটের দিকে ছুট'ছে সবাই। ব্যষ্টি গোষ্ঠীর মধ্যে হারিয়ে গিয়ে ওই অসংখ্য মানুষ এক-দেহ একটা প্রবাহে যেন ব'য়ে চলেছে একটা বেগবান স্রোতে।

আকস্মিক বিস্ময়ে ওয়াং সম্বিৎ হারিয়েছিল। কেন যে ও এখানে এসেছে সে খেয়ালও ওর নেই। পেছনের ঠেলায় ও স্রোতের আবর্তে গিয়ে পড়ল। ইচ্ছা না থাকলেও ভেসে চলল স্রোতে। শূন্যের ওপর ভর দিয়ে যেন চলল ওয়াং —ওর পা, মনে হ'ল, একবারও মাটি স্পর্শ করছে না।

গেট পেরিয়ে, মহলের পর মহল পার হয়ে একেবারে অন্দরের প্রাঙ্গনে গিয়ে পড়ল। শূন্যতা থম্ থম্ ক'রছে সেখানে যেন কোন যুগের এক প্রেতায়িত রাজপুরী। কেবল বাগানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফোটা লিলিফুলে, নিষ্পত্র

তরু শাখে, বসন্তের পুষ্পোৎসবে এখনও একটু প্রাণের পরিচয় রয়েছে। খাবার ঘরে টেবিলেও খাবার সুসজ্জিত, রান্না ঘরের উনুন তখনও জ্বালা। অন্তঃপুরের পথঘাট এ মানুষগুলোর নখাগ্রে। ভৃত্যদের ঘর, রান্না বাড়ী পার হয়ে ওরা সোজা চলে গেল বাবুদের খাসমহলে —যেখানে কোমল বিলাসী শয্যা, সোনার মীনা করা লাক্ষার আধার আর কারুকার্য-মণ্ডিত মূল্যবান আসবাব, প্রাচীর বিলম্বিত বিচিত্রিত পট প্রভৃতির অজস্র সম্ভার। জনতা ঐসব ঐশ্বর্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাক্স পেট্‌রা খুলে ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ ক'রে ছড়িয়ে ফেলল। যা কিছু চোখে পড়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, বিছানা, পর্দা থালা বাটি কিছুই বাদ যায় না, কেবল হাতে হাতে ঘোরে। এবং ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়, ও তার থেকে ছিনিয়ে নেয়, কারো হাতে কিছু থাকলেই হ'ল অমনি ছোঁ মেরে আর একজন তুলে নেয়, এক মিনিট তাকিয়ে দেখে না।

ওয়াংলাং কেবল ছুঁল না কিছু। পরস্ব সে জীবনে ছোঁয়নি। অনেক চেষ্টায় ও ভিড়ের মাঝখান থেকে এক পাশে এল। পাশে চাপ অল্প, সুতরাং যেমন ক'রে নদী তীরোপান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণাবর্ত পাক খেয়ে খেয়ে অল্পতর স্রোতের সাথে সাথে বয়ে যায় ধীরে ধীরে, ওয়াংও তেমনি এগিয়ে চল্‌ল।

যেখানটায় ও এসে পড়ল সেখানটা অন্দরের একেবারে পেছনের অংশ— বাবুদের হেরেম। খিড়কীর দরজা খোলা প'ড়ে আছে। কতকাল ধরে এমনিতরো বিপদের দিনে পালাবার পথ ক'রে দিয়েছে এই গুপ্তদ্বার। সবাই বোধ হয় আজও ওই দরজা দিয়েই পালিয়েছে। কেবল একজন রয়ে গেছে, হয়তো পালাতে পারেনি। দেহের আয়তনের জন্যই হোক আর নেশার দরুণই হোক, পারে নি। একটা খালি ঘরের এক কোণে লোকটা লুকিয়েছিল। জনতা ওখান দিয়ে চলে গেছে, ওকে দেখতে পায়নি। এখন নিজেকে একা মনে ক'রে লোকটা পালিয়ে যাবার জন্য বেরিয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তেই ওয়াং ভিড় থেকে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে এখানে এসে পড়ল।

লোকটার বয়স যৌবনাতিক্রামী। দেহে মাংসের বেমানান আতিশয্য হয়ত' বিলাস নিদ্রায় রাত কাটিয়ে এই মাত্র ঘুম ভেঙেছিল তার। কোনোমতে ওপর থেকে জড়িয়ে নেওয়া অসম্বৃত বেগুনী সাটীনের পরিচ্ছদ ভেদ ক'রে দেহের নগ্ন মাংস আত্মপ্রকাশ ক'রছে। বড় বড় হলদে মাংসের থোলো ঝুলছে বুকে পেটে, দুই গালের মাংসের উঁচু ঢিবির পেছনে কোটরগত শুয়োরের মত কুঁৎকুঁতে চোখ। ওয়াংকে দেখে লোকটা কাঁপতে লাগল ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে।

এমনভাবে হঠাৎ চীৎকার সুরু করল যেন ওর গায়ের মাংস কেউ ছুরি দিয়ে কাটছে। অহিংস, নিরস্ত্র ওয়াং লাং অবাক হ'য়ে গেল, ওর হাসি পেল। কিন্তু লোকটা ওর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে প'ড়ে মাটিতে মাথা ঠুকে কেঁদে কেঁদে ওকে বাঁচাবার জন্য মিনতি করতে লাগল। প্রাণে যেন না মারে ওয়াং ওকে, অনেক টাকা দেবে ও, যত চায়।

'টাকা'—এই শব্দটা যেন ওয়াঙের মোহগ্রস্ত সম্বিতে সজোরে একটা ধাক্কা দিল। তাইতো টাকাই তো চাই। টাকা···টাকা···টাকা চাই, এই কথাই যেন ওয়াং দিকে দিকে শুনতে পেল। টাকা চাই, তা'হলে ওর প্রিয়তমা কন্যা, ওর দেশ, জমি, মাটি ··মাটিমা···তড়িৎ বেগে মনের পরদার কতগুলি ছবি জেগে উঠল।

পুরুষ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠল ওয়াং: 'কৈ বের কর টাকা, শিগ্‌গির।' অমন স্বর যে ওর কণ্ঠে লুকিয়েছিল তা এক মুহূর্ত আগেও জানতো না ওয়াং।

লোকটা উঠে দাঁড়ায়। ফোঁপাতে ফোঁপাতে আপন মনে কি বলতে বলতে পকেট থেকে দুই মুঠো ভরে মোহর বের ক'রে ওয়াঙের কাপড়ে ঢেলে দিল। 'আরও দাও আরো চাই' – বিকট স্বরে চীৎকার ক'রে আবার বলে ওয়াং।

আবার ভরা দু'হাত বেরিয়ে আসে। আর নাই। কেঁদে ফেলে লোকটা বলে: 'প্রাণটা ছাড়া আর এখন কিছু নেই—'। তেলের মত ক'রে অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

ক্রন্দনপর, বেপথুমান ওই মাংস পিণ্ডটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘৃণায় জর্জরিত হ'য়ে ওঠে ওয়াং।

'দূর হ'য়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে', চীৎকার ক'রে ওয়াং বলে: 'নয়ত পোকার মত দু'হাতে টিপে মারব।'

এই সেই ওয়াং—বলদটা মারতে যার হাত ওঠেনি। লোকটা খেঁকী কুকুরের মত ওর পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেল।

হাতে বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে ওয়াং একা। দেখার জন্য এক মুহূর্ত দাঁড়াল না ও ওখানে। জামার মধ্যে মোহরগুলি গুঁজে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে চুপি চুপি বস্তীতে ফিরে এল।

মোহরগুলোতে তখনও তাদের পূর্বতন অধিকারীর দেহের উষ্ণতা জড়িয়ে রয়েছে। শক্ত ক'রে চেপে ধরল যেন কেউ কেড়ে না নেয়।

'আর দেরী নয় কালই ফিরে যাব,'—ওয়াং ভাবে, 'ফিরে যাব, যাব মাটি—আমার মাটির কোলে।'

পনের

দু'চার দিনের মধ্যেই ওয়াঙের সর্ব চেতনা এমন একটা প্রশান্ত পরিপূর্ণতায় এসে পৌঁছুল যে এখন আর ওর মনেই হয়না যে একদিনের জন্যও ও মাটি মায়ের কোল ছেড়ে দূরে এসেছে। মাঝখানের এই সুদীর্ঘ কালের বিচ্ছেদ সেই পরিপূর্ণতার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর বাস্তবিক পক্ষে ওর দেহটাই দূরে এসেছে, মন তো প'ড়েছিল এই বিরহ সায়রের ওই তটে।

গোটা তিনেক ডলার দিয়ে খুব ভাল দেখে বীজ কিনল নানা রকম শস্যের। কোনও দিন চাষ করেনি এমন সব তরকারী শাকসব্জির বীজও কিনল, আর নিল পুকুরের জন্য পদ্মের বীজ।

বাড়ী যাবার পথে একটা বলদ কিনল পাঁচটা মোহর দিয়ে। বলদটা দিয়ে জমি চষ্‌ছিল এক চাষা। ওয়াঙের চোখে পড়ল। বলদটার বলিষ্ঠ কাঁধ এবং প্রকাণ্ড জোয়ালের প্রতিকূলতাও লাঙ্গল টানার সাবলীল বলিষ্ঠ ভঙ্গী ওকে মুগ্ধ করল। সুতরাং ওটা ওয়াঙের চাই-ই। প্রথমটায় চাষী মুখ বাঁকা ক'রে বলেছিল: 'সখের যে আর সীমা নেই হে, আমার হাল থেকে খুলে তিন বছরের যোয়ান বলদ আমি বেচি ওকে—এরপর বলবে বৌ বেচ।' ওয়াং দমল না—চাই-ই ওটা। খাসা বলদ, কি চমৎকার রং, কেমন পরিপূর্ণ কালো দুটি চোখ। তারপর অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক দর কষাকষির পর উচিত মূল্যের দেড়গুণ পেয়ে লোকটা বলদ ছাড়ল। অবলীলায় পাঁচটা মোহর গুণে ও তার হাতে তুলে দিল। এমন চমৎকার বলদের কাছে তুচ্ছ ওর সোনা—তুচ্ছ রূপো। ওই পাঁচটা মোহরের বিনিময়ে ও যেন রাজ্য হাতে পেল এমনি একটা গর্ব-স্ফীতভাবে ও বলদের দড়ি ধরে চলতে লাগ্‌ল।

বাড়ী এল তারা। ঘরের দরজা নেই, চালে নেই একগাছি খড়। ছাউনি-হীন বাঁশ ক'খানা আর অর্ধেক ধ্বসে-পড়া-মাটির দেয়াল কটা প'ড়ে আছে কেবল। চাষের যন্ত্রপাতি একখানিও নেই। প্রথম বিহ্বলতার ঘোর কেটে যাবার পর ওর এসব তুচ্ছ মনে হ'ল। সহরে গিয়ে খুব মজবুত একটা হাল আর অন্যান্য হাতিয়ার এবং চালের জন্য খড় নিয়ে এল। নিজেদের জমির খড় উঠতে এখনও অনেক দেরী।

সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দেয় ওয়াং মাঠগুলির বিস্তৃতির ওপর। পরম আপনার ধন ওই মাটি ওর, শীতের জড়তা কাটিয়ে নূতন বৃষ্টি রস-স্নেহ-সমৃদ্ধ হ'য়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে বীজ বোনার প্রতীক্ষায়। ভরা বসন্ত।

অগভীর ডোবাগুলি থেকে ভেসে আসে ব্যাংএর একটানা তন্দ্রালু ডাক। বাড়ীর এক কোণের বাঁশ ঝাড়টায় লেগেছে মৃদু হাওয়ার শিহরণ। প্রদোষের দিকে আলো-আঁধারে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় সামনের ওই মাঠের ধারের পিচ গাছগুলো গোলাপী ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে; উইলো গাছে নব কিশলয়ের পাটল-শ্যাম-শোভা। শান্ত, নীরব-শ্রী, উন্মুখ মাটির বুক থেকে লঘু জ্যোৎস্নার মত শুভ্র কুহেলীর জাল ধীরে ধীরে উঠে তরু মূলে লীন হয়ে যায়।

কয়েকটা দিন ওয়াং যেন কি একটা ভাবাবেশে ডুবে রইল। এতদিন বিচ্ছেদের পর মিলনের এই মহালগ্নে ওর আর ওর পরম প্রিয়, পরম-আপনার মাটির মাঝখানে ও কাউকে সহ্য ক'রতে পারল না। কারো বাড়ী গেল না—কারো সাথে সাক্ষাৎ ক'রল না। প্রতিবেশীদের অনেকেই দুর্ভিক্ষে গত হয়েছে। দু-চার জন যারা বাকী ছিল, তারা এলে ও ক্ষেপে গিয়ে পাগলের মত চীৎকার জুড়ে দিত: 'এই শালারাই সব চুরি করেছে আমার,—চালের খড় পর্যন্ত নিয়ে গেছে—দে শালারা সব বের ক'রে—'

প্রতিবেশীরা ভালো মানুষের মত মাথা নেড়ে বলে: 'আমাদের গালি-গালাজ করিস না বলছি—আমরা কিছু জানি না—জানে তোর খুড়ো ব্যাটা। আকালের সময় চোর ডাকাতের রাজ্যি পড়ে সব জায়গায়ই, এ কে না জানে।'

'পেটের জ্বালায়ই লোকে চুরি করে,—না ক'রে ক'রবেই বা কি। পেট তো মানে না।' এমনিধারা কৈফিয়ৎ।

পড়শী চিংও দেহটাকে বড় কষ্টে টানতে টানতে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। সে বলল: 'কি বলব ভাই, গোটা শীতটা, তোমার বাড়ীতে সে এক ডাকাতের আড্ডা। গাঁ, সহর ওদের জ্বালায় অস্থির। তোমার কাকার ধরনধারন কেমন যেন—থাক বাপু সত্যি মিথ্যে আমি জানি না; অন্যের কথায় আমার কাজই বা কি?

কিন্তু এই কি চিং? না তার ছায়া? জিরজিরে হাড় ক'খানার গায়ে সেঁটে আছে কেবল চামড়াখানা। মাথার চুল উঠে গেছে। যা দু-এক গাছি আছে তাও শনের মত শাদা। বয়স তো সবে এই চল্লিশ। ওয়াঙের মুখে কথা সরে না। ওই মানুষ-রূপী কঙ্কালটার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওয়াং হঠাৎ বলে উঠল: 'তাইতো আমাদের চাইতে অনেক বেশী কষ্ট গেছে দেখি তোমার। কি খেয়ে দিন গেছে তোমার বলো দেখি?' ওয়াঙের বুক দরদে ভরে ওঠে।

চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিং বলে: 'কি খাইনি তাই জিজ্ঞাসা করো।

কুকুরের মত আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে খাম্‌চে পচা গলা যা পেয়েছি এই পোড়া পেটে পুরে'ছি। সহরে ভিক্ষে মেগেছি—পাইনি। কে দেবে? মরা কুকুরের মাংস অবধি খেয়েছি। বৌটা চলে গেল,—এত কষ্ট সইতে পারল না। মরার আগে একদিন কিসের মাংস এনে সেদ্ধ ক'রে সাম্‌নে ধরল। জিজ্ঞেস ক'রতেই সাহস হ'লনা—কিসের মাংস। হয়ত শুনব মেয়েটারই মাংস। কিন্তু, না কিছুতেই কাউকে মারতে ওর হাত উঠবে না—এ আমি জানতাম। মরা ধরা জন্তু জানোয়ার কুড়িয়ে টুড়িয়ে এনে থাকবে। আমার মত লোহার প্রাণ তার ছিল না···সে চলে গেল। মেয়েটাও অমন ক'রে চোখের সাম্‌নে না খেয়ে শুকিয়ে তিল তিল ক'রে মরবে? এ সইতে পারলাম না,—দিলুম তুলে একটা সৈন্যের হাতে।'

থেমে আবার বলল : 'লাঙ্গলখানা রয়েছে—ভাবলাম আবার হাতে করি। কিন্তু বুনব কি? বীজ কি রেখেছি একটা দানাও!'

ওয়াং স্বরে এক কপট রুক্ষতা মিশিয়ে বলে : 'রাক্ষস! রাক্ষস! পেটে আগুন সব। যাক্‌, এখন এসো দেখি একবার সাথে।'

টেনে নিয়ে গেল ওকে বাড়ীর ভেতর। দক্ষিণ দেশ থেকে আনা বীজ থেকে সব রকম কিছু কিছু ক'রে ওর ছেঁড়া কোটের এক প্রান্তে ঢেলে দিয়ে বলল : 'খাসা একটা বলদ কিনে'ছি—কাল তোমার জমিতেই ওটাকে পরখ ক'রে দেখব।'

চিং ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওয়াঙের চোখও ভিজে উঠল। উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল : 'আকালের সময় খেতে দিয়ে আমার বৌটাকে বাঁচিয়েছিলে তুমি, সেকথা কি ভুলে গেছি? অমন নেমকহারাম ওয়াং নয়।' চোখ মুছতে মুছতে চ'লে যায় চিং।

কাকা গাঁয়ে নেই, ওয়াং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কোথায় গেছে কেউ জানে না। কেউ বলছে সব ক'টা মেয়েকে বেচে দিয়ে সে দেশান্তরী হয়েছে। শুনে রাগে ওয়াঙের সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে।

তারপর আপনাকে নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিল ওয়াং চাষের কাজে। চার ধারের সংসার যেন ওর চেতনার পর থেকে একেবারে মুছে গেল। খাবার শোবার যেটুকু সময় ওকে বাড়ীতে থাকতেই হয় তাতেও যেন ওর বুকটা চড়চড় করে। রুটির মোড়ক আর ক'কোয়া রসুন হাতে নিয়েই ও মাঠে চলে যায়। কোথায় কি লাগবে তার হিসেব ক'রতে ক'রতে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে খেতে ওর বেশ লাগে। ক্লান্তিতে দেহটা যখন নুয়ে আসে তখন ও চষা জমির ওপর নিজেকে এলিয়ে দেয়। মাটির উষ্ণ স্পর্শে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

ওলান্‌ও বসে থাকে না—। নিজ হাতে চাটাই দিয়ে চাল ছায়; মাঠ থেকে মাটি এনে ঘরের দেওয়াল মেরামত করে, উনুনটা নূতন ক'রে গড়ে; বৃষ্টি বাদলে রান্নাঘরের মেজের মাটি উঠে গিয়ে এখানে সেখানে গর্ত হ'য়ে গিয়েছিল, সেগুলো ভরাট ক'রে নিকিয়ে পরিপাটি ক'রে তোলে। তারপর একদিন ওয়াঙের সাথে সহরে গিয়ে বিছানাপত্র, কিছু আসবাব, একটা লোহার কড়া, একটা দস্তার শামাদান, দস্তার ধূপদানী, একখানা ধনদেবতার পট—দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে—এবং পটের সামনে জ্বালাবার জন্যে দুটো লাল মোমবাতি কিনে আনল। এছাড়া নলঘাসের সল্‌তে দেওয়া আরো দুটো চর্বির বাতিও কিনল। আর কিনল এসব প্রয়োজনের ওপরে একটু বিলাসের রং লাগিয়ে চিত্র বিচিত্র করা একটা লাল রংএর মেটে চা-দানী, এবং তার সাথে মিলিয়ে ছ'টা বাটি।

ওয়াং ক্ষেত্রদেবতার কথা ভোলে না। ফেরার পথে মন্দিরের মধ্যে এক বার উঁকি মেরে দেখে নিল। করুণ দৃশ্য। বৃষ্টির জলে ওপরকার রং ধুয়ে প্রতিমার মাটি বেরিয়ে পড়েছে। কাগজের পোষাক ছিন্ন ভিন্ন। আকালের বছরটায় কেউ আর এদিকে দৃষ্টি দেয়নি। ওয়াং মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে একটু তৃপ্তির সুরে বলে: 'বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে—মানুষের অনিষ্ট করবে আক্কেলটা পাও এখন। দেবতা না রাক্ষস।'

ওয়াঙের বাড়ীখানা আবার হেসে ওঠে। দস্তার শামাদানে লাল মোম-বাতি জ্ব'লে লাল আভা ছড়ায়; চা-দানী, বাটি সব টেবিলের ওপর সাজানো। আর একটা ছোটবিছানা বেড়েছে। ওয়াঙের শোবার ঘরের ঘুলঘুলিতে নূতন কাগজ সাঁটা হয়েছে। নূতন কপাট বসেছে চৌকাটের গায়। ওয়াং শঙ্কিত হয়, কে জানে এত সুখ বুঝি সইবে না। ওলান্ আবার ভাবী-মাতৃত্বে সমৃদ্ধা। ছেলেরা আঙিনায় গড়াগড়ি ক'রে খেলা ক'রে—ঠিক যেন মেটে রংএর মোটা সোটা কুকুরছানা ক'টা। দক্ষিণের প্রাচীরে হেলান দিয়ে বৃদ্ধ পরিতৃপ্ত অন্তঃকরণে ঝিমোয়।

শিশু-ধানের শ্যাম-রূপশ্রীতে মাঠ অপরূপ। আরো রূপ শিশু-মটর গাছের মাটির বাঁধন ছাড়িয়ে আকাশের ইসারায় ওপর দিকে মাথা তোলার লীলায়।

হাতে যা টাকা আছে হিসব ক'রে চললে নূতন ফসল ওঠা পর্যন্ত ভাবতে হবে না।

ওপরে নীলের বিস্তারে শুভ্র মেঘের অভিযানের দিকে তাকিয়ে ওয়াঙের মনে হয়: 'নাঃ, মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে দুটো ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসি,—কে জানে ওদের মতিগতিতে বিশ্বেস নেই মোটে।'

ষোল

একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে ওয়াঙের হাতে ওলান্‌এর বুকের মাঝখানে শক্ত একটা কি ঠেকল। জিজ্ঞাসা করল: 'ওটা কি রেখেছ ওখানে?' হাত দিয়ে দেখল কাপড়ে জড়ান একটা পুঁটলি, ভেতরে শক্ত কি যেন নড়ে। ওলান্ সরে গেল। কিন্তু ওয়াং জোর ক'রে কেড়ে নিতে গেল—হাল ছেড়ে দিয়ে জিনিষটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ওর দিকে—'নাও নাও দেখ,' কাঁদ কাঁদ হয়ে ওলান্ বলে।

ময়লা ন্যাকড়ায় জড়ান পুঁটলিটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একরাশ দামী পাথর। ওয়াং বিহ্বল হ'য়ে তাকিয়ে রইল। যেন রামধনুর রংএর খেলা ওর সামনে। কোনটা তরমুজের শাঁসের মত টুকটুকে লাল; সোনালী কোনটা; কোনটায় নবপল্লবের শ্যামলিমা; কোনটায় বসুধা-তল-নিঃসৃত সলিলের স্বচ্ছতা। কি এ বস্তু! জহরৎ ওয়াং জীবনে দেখেনি, চেনেও না সে-সব। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কটা রংএর রুক্ষ হাতখানার মধ্যে বস্তুগুলো যেন শত দীপের মতো জ্বলে উঠল। দুজনেই নিস্পন্দ, নির্বাক। ওদের বিমূঢ় দৃষ্টি যেন মণিগুলোর গায়ে বিঁধে রইল।

ওয়াং রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে: 'কোথায়—কোথায় পেলে এসব?'

'সেই বড় বাড়ীটায়। বোধহয় বাবুদের পেয়ারের কারো গয়না ছিল এসব।' খুব ধীরে ধীরে ওলান্ বলে চলে: 'দেয়ালের একটা জায়গায় আলগা ইট। একখানা দেখেই বুঝতে পারলাম। চুপি চুপি সেখানে চলে গেলাম। কেউ দেখলে আবার ভাগ দিতে হবে তো। গিয়ে ইটটাকে সরাতেই এই ঝক্‌ঝকে জিনিষগুলো বেরুল।'

'আলগা ইট? ভেতরে যে এসব থাকে তা জানলে কি ক'রে তুমি?' —সপ্রশংসা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে ওয়াং।

ওলান্‌এর ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসির রেখা জেগে ওঠে—সেই স্বল্পপ্রাণ হাসি ঠোঁটের প্রান্তেই মিলিয়ে যায়, যার দ্যুতি চোখে প্রতিফলিত হয় না কখনো। বলে: 'অতদিন বড়লোকের বাড়ী থেকে এটুকুও জানব না? ওরা ভয়েই মরে সর্বদা। তা' দামী জিনিষপত্রের কাছে থাকলে ভয় হবারই কথা। আর একবার আকাল হ'য়েছিল, সেবার দেখলাম ডাকাত পড়লো বাবুদের বাড়ী। দাসী চাকর মায় গিন্নী পর্যন্ত যে যেদিকে পারল, প্রাণ নিয়ে পালালো। দেয়ালে আগে থাকতেই জায়গা ঠিক ক'রে রাখে। ওরই ফোকরে গয়নাপত্র দামী জিনিষ সব লুকিয়ে ফেলে। তারপর খাঁজের মুখে ইটখানা বসিয়ে দিলেই হ'ল। ও কত দেখেছি। পাঁচিলের গায়ে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একখানা আল্‌গা ইটের মানে কি, সে খুব বুঝি।'

অতৃপ্ত দৃষ্টিতে ওরা মণিগুলোর দিকে তাকিয়েই থাকে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর ওয়াং বলে: 'এত সব দামী জিনিষ তো আমাদেরও কাছে রাখা ঠিক হবে না। বেচে টাকা ক'রে টাকাগুলো বরঞ্চ ভালো যায়গায় রেখে দি। আমার মনে হয় জমি কেনাই ভালো সব চাইতে। নইলে কারো কাণে একবার একথা গেলে রক্ষে আছে আর? সেদিনই ডাকাত পড়বে। এগুলো তো যাবেই সাথে সাথে জানেও টান পড়বে। কাজেই আজই যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রতে হবে। নইলে ভয়ে ঘুমই আসবে না'।

কথা বলতে বলতে ওয়াং পাথরগুলো আবার আগের মত করে পুঁটলিতে বেঁধে নিজের জামার মধ্যে পুরতে যাবে এমন সময় চোখ পড়ে গেল ওলান্‌এর দিকে। বিছানার শেষ প্রান্তে পায়ের ওপর পা আড় ক'রে ওলান্ বসে আছে নতমুখে। চির-নির্বিকার চির-উদাস, চির-ব্যঞ্জনাবিহীন মুখখানায় কী যে গভীর কামনার একটা চাপা আবেগ ঠোঁট দু'খানিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওয়াং অবাক্ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল: 'একি! কি হ'ল তোমার?'

'সব কটাই বেচে ফেলবে?'

'কেন, রাখতে চাও কটা? কি করবে বলতো?' ওয়াং আরো অবাক হয়ে যায়। 'আমাদের এই তো মেটে ঘর, এতে এমন দামী জিনিষ রাখতে আছে?'

'বেশী নয়, অন্ততঃ দুটো যদি রাখতে পারতাম।' আশা ভঙ্গের আকুতিতে

এমন ভারী হয়ে ওঠে ওলান্‌এর কথা ক'টি, যে ওয়াঙের বুক দুলে ওঠে—ওর কোন সন্তান ওর কাছে একটা পুতুল বা লবেঞ্চুস চায় তাহলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি করে। বড় অবাক লাগে। একরকম চেঁচিয়েই বলে ওঠে : 'সেকি, কি করবে বলতো ?'

ওলান্ মিনতি করে : 'দুটো, ছোট্ট দুটো—না হয় ঐ সাদা মুক্তো দুটোই রাখ।'

'মুক্তো ?' ওয়াং আরো অবাক হয়—মুখটা ওর হাঁ হয়ে যায়।

'আমি পরবো না কখনও, কেবল কাছে রেখে দেব।'—চোখ দুটি যেন নেমে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। চাদরের একটা আল্‌গা সুতো পাকাতে থাকে আস্তে আস্তে,—যেন উত্তর পাবে না ব'লেই ধরে নিয়েছে।

কিছুই না বুঝে ওয়াং চকিত দৃষ্টিতে ওলান্ এর মর্মখানি পড়ে নিতে চেষ্টা করে ওর চোখের ভাষায়। প্রকাশহীন, ভাষাহীন, বোবা নারী—ভৃত্যের মতো সারাজীবন খেটে এল, যার জন্য কোনোদিন কোন পুরস্কার পেল না। চোখের সামনে ধনী পরিবারের বিলাস-ব্যসন, মণি মানিকের চোখ-ঝলসান চাকচিক্য দেখেছে, কিন্তু হাতে ছুঁয়ে দেখবারও অধিকার ছিলনা—কেবল চোখে দেখেছে।

নিজের মনেই বলে চলেছে ওলান্ : 'মাঝ মাঝে একটু হাতে ক'রে দেখতে পারতাম।'

ওয়াং ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু বুকখানা দরদে ভরে ওঠে। জামার ভেতর থেকে পুঁটলিটা আবার বের ক'রে খুলে নীরবে ওলান্‌এর হাতে তুলে দেয়। ওলান্ ওর কঠিন হাতখানা দিয়ে আল্‌তো ক'রে পাথরগুলো অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে মুক্তো দুটো বের ক'রে নিয়ে বাকীগুলো বেঁধে ওয়াঙের হাতে ফিরিয়ে দেয়। জামার একটা কোণ ছিঁড়ে তাতে ও দুটো বেঁধে বুকের মধ্যে রেখে দিয়ে তবে স্বস্তি পায়।

ওয়াং নির্বাক বিস্ময়ে, কতক বুঝে কতক না বুঝে, গভীর দৃষ্টিতে ওলান্‌কে দেখে। এর পর থেকে মাঝে মাঝেই হাতের কাজ থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে—মুক্তো দুটো এখনও হয়তো বুকের উত্তাপে জড়িয়ে রেখেছে ওলান্। কিন্তু কৈ একদিনও ওয়াং ওকে দুটো বের করতে দেখল না তো। কোন কথাও তো' হয় না আর ওদের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে।

অন্য পাথরগুলো নিয়ে ওয়াং অনেক ভাবল কি করা যায়। তারপর ঠিক করল হোয়াংদের বাড়ী গিয়ে দেখবে ওরা আর জমি বেচবে কিনা।

তাই গেল ওয়াং। গেটে আজ আর কেউ দাঁড়িয়ে গালের আঁচিলের চুলে তা দিচ্ছে না। সোজা ভেতরে চ'লে যাবার মত পদ-গৌরব যাদের নেই তাদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হান্‌ছেনা কেউ। বিশাল কপাট-জোড়া বন্ধ। ওয়াং অনেক ধাক্কা দিল, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। রাস্তার লোকেরা বলল :

'ধাক্কাধাক্কি ক'রে মিছেই মরছ। কেউ কি আর আছে যে সাড়া দেবে। এক বুড়োটা আছে। সে যদি জেগে থাকে তো উঠে এলেও আসতে পারে—আর দাসী টাসী কেউ থাকে তো তার কৃপা হ'লে খুলে দিলেও দিতে পারে।'

ভেতরে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়—খুব ধীরে ধীরে এলোমেলো ভাবে কখনও জোরে কখনও আস্তে ফেলা। হুড়্‌কো খোলার শব্দও পাওয়া যায়। তারপর কপাট খুলে যায়। ভেতর থেকে একটা ভাঙ্গা-গলা চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে :

'কে ?'

ওয়াং বিস্মিত হওয়া সত্বেও একটু জোরেই বলে : 'আমি ওয়াং লাং।'

বিরক্ত স্বরে একটা ঝাঁঝালো উত্তর আসে : 'সে আবার কোন্ শালা।' খোদ কর্তাই বটেন। আপ্যায়নের বহর দেখে বেশ বোঝা যায় আজীবন ভৃত্যের রাজ্যে রাজত্ব ক'রে ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ওয়াং বিনয়ে স্বর নরম ক'রে বলে : 'কর্তাবাবু, একটু কাজে এনেছিলাম। আপনার বড় কষ্ট হ'ল। মাপ করবেন কর্তা। আপনার কষ্ট করবার দরকার ছিল না। ওঠা আপনার ম্যানেজারের সাথেই সেরে নিতে পারতাম।'

দরজা না খুলেই ঠোঁট বাঁকিয়ে কর্তা বলেন : 'ম্যানেজার ট্যানেজার নেই, ও ব্যাটা মরেছে—বুঝেছ ? কমাস হ'ল ভেগেছে এখান থেকে।'

কি করবে ওয়াং ভেবে পায় না। কর্তার সাথে সরাসরি জমিদারী বিক্রীর কথা কওয়া যায় না। কিন্তু পাথরগুলো ওর বুকের মধ্যে জলন্ত অঙ্গারের মত জল্‌ছে। এ থেকে মুক্তি চাই। শুধু তাই নয়,—ওর জমি চাই, আরো অনেক জমি। যা বীজ এনেছে তাতে বর্তমানে ওর যা জমি আছে তার দ্বিগুণ চাষ করা চলে। কাজেই জমিদারের রসাল জমি ওকে পেতেই হবে কিছু।

অনেক ইতস্ততঃ ক'রে সংকোচে ব'লে ফেলে অবশেষে : 'আজ্ঞে, এই সামান্য একটু লেনদেনের কথা ছিল।'

দরজাটা ওয়াঙের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। রুক্ষস্বর রুক্ষতর ক'রে উচু পর্দায় কর্তা বলেন : 'ম্যানেজার ব্যাটা সব লুটে নিয়ে পালিয়েছে। শালা

চোর, ডাকাত, পাড় ডাকাত—ও নরকে যাবে, ওর মা যাবে, ওর বাবা যাবে, ওর চৌদ্দ পুরুষ যাবে। আমার কি কিছু রেখেছে? সব মেরে নিয়েছে। দেনাটেনা শুধতে পারব না এখন—একটি পয়সাও না।'

ওয়াং তাড়াতাড়ি বলে: 'না, কর্তাবাবু না, আমি আদায়ে আসিনি। বরং টাকা দেব।'

একটা তীক্ষ্ণস্বর ওয়াঙের কানে এলো। দরজার ফাঁকে একজন স্ত্রীলোক মাথা বাড়িয়ে বলে: 'তা বেশ। কি মিঠে কথাই শোনালে। বহুকাল অমন কথা শুনিনি।' ওয়াং তাকিয়ে দেখে সুন্দর একখানা মুখ, ফুটফুটে রং, কিন্তু চোখে মুখে একটা শয়তানীর ছাপ। 'এসো বাছা ভেতরে এসো',—বলে দরজাটা খুলে ওয়াংকে ভেতরে এনে আবার ভাল ক'রে বন্ধ করে দিল সে।

বুড়ো কর্তা দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর আর সেদিন নেই। পুরু সাটীনের ময়লা একটা জামা পরা, অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ শতছিন্ন ফারএর ছিঁটে ফোঁটা তখনও ঝুলছে তাতে। অজস্র দাগে ভরা আর কুঁচকে একাকার হয়েছে,—যেন এটাকে নাইট্ গাউন ক'রে ব্যবহার করা হ'য়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুঝতে কষ্ট হয় না পোষাকটা এককালে দামী ছিল। ওয়াং একটা ভয়-মিশ্রিত কৌতূহলে বৃদ্ধ জমিদারের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই বিশাল পুরীর অধিবাসীদের সম্বন্ধে এতদিন ওয়াঙের একটা আতঙ্ক ছিল। সম্মুখের এই জরাজীর্ণ দীন মূর্তিটিই এই পুরীর অধীশ্বর, একদা পরাক্রান্ত মহাবিভবশালী জমিদার স্বয়ং, যার সম্বন্ধে ওয়াং কতো কথাই না শুনেছে। ওয়াঙের বিশ্বাস হ'তে চায় না। তার ছায়া না প্রেত এ? কৈ ওয়াঙের বুড়ো বাবার চাইতে বেশী ভয় করার মতো কিছু তো খুঁজে পায়না ও এই মানুষটার মধ্যে। বরং একে দেখলে মায়াই হয়। এক কালের অতিস্থূলত্বের প্রমাণ রয়েছে কেবল বৃদ্ধের অঙ্গের থল্‌থলে, ঝোলা, অতি-শিথীল চামড়ার খোলসাটিতে। কতোদিন যেন নাওয়া নেই, কামান নেই। অভ্যাসবশতঃ বার বার চিবুকে ঘসতে গিয়ে ঝুলে পড়া ঠোঁটটায় বৃদ্ধের পীতবর্ণের হাতখানা লেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

স্ত্রীলোকটি ঠিক বিপরীত। তার কঠোর প্রখর মুখে, সুউচ্চ নাকের তীক্ষ্ণতায় কালো চোখের তীব্র দীপ্তিতে সেই সৌন্দর্য যা থাকে একমাত্র শিকারী বাজের চেহারায়। বর্ণে স্নিগ্ধতার একেবারে অভাব, চামড়া হাতের ওপরু একটু অতিমাত্রায় সেঁটে বসা। ওষ্ঠে অদ্ভুত কাঠিণ্য। রক্তিম

গণ্ড আর কালো কেশের মসৃণতায় যেন মুকুরের মত প্রতিফলিত করার শক্তি। কিন্তু ভাষা ও কথা বলার ভঙ্গিমা বলে দেয় এ লোকটি এখানকার এই অভিজাত গোষ্ঠীর কেউ নয়। ক্রীতদাসী মাত্র। একদা-বহুজন-মুখর এই শতমহলা পুরীতে এখন এই দুটি ছাড়া আর কেউ নেই।

স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণস্বরে বলে: 'হ্যাঁ বলতো বাপু কি দেবার থোবার কথা কইতে এসেছ?'

ওয়াং সহসা বলতে পারেন না—কর্তা সামনে রয়েছেন। অসাধারণ বুঝবার ক্ষমতা মেয়েটির,—মুহূর্তেই ওয়াঙের অবস্থা বুঝে নিয়ে কর্তাকে কঠোর স্বরে বলে: 'হয়েছে, খুব হয়েছে, এখন দূর হও চোখের সামনে থেকে।'

কথাটি না ব'লে কাশতে কাশতে লোলচর্ম বৃদ্ধ সরে যায়। ওয়াং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটির সামনে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, কি বলবে, কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। চারিদিকের থম্‌থমে নীরবতা যেন ওকে হাঁ ক'রে গ্রাস করতে চায়। পরের মহলটায় চোখ পড়ে—শূন্য নিথর অঙ্গনে কতকালের সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ, ছড়িয়ে আছে ঘাস, শুকন পাতা, শুকন ফুলের ডাঁটা…

'মিন্‌সের মুখ যেন কুলুপ মেরে রেখেছে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির ব'লে ফেল কি কাজ। আর টাকা পয়সা এনে থাকো তো বের কর।' কথাগুলোর অত্যুগ্র ঝাঁঝে ওয়াং চম্‌কে একেবারে লাফিয়ে ওঠে।

একটু সাবধানী জবাব দেয় ওয়াং: 'হ্যাঁ কাজ আছে বলেছি, টাকা এনেছি বলিনি তো।'

'কাজ! টাকা ছাড়া কাজ কাকে বলে আবার! কাজ মানে—টাকা আসবে নয় যাবে, দুটোর একটা। বেরুবার মত কড়ি এ বাড়ীতে এখন নেই। বুঝেছ?'

ওয়াং মৃদু আপত্তি জানায়: 'এসব বিষয়-ব্যবসার কথা তো আর মেয়েমানুষের সাথে চলে না।' প্রকৃত অবস্থাটা তখনও ওয়াঙের হৃদয়ঙ্গম হয়নি। ও খালি বোকার মত চেয়ে থাকে। 'আলবাৎ চলে', তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধস্বরে জবাব আসে: 'কেন চলবে না শুনি?' তারপর হঠাৎ অত্যন্ত চীৎকার ক'রে বলে:

'জানিস না, আর দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই এখানে।'

বলে কি? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরে ওয়াং সম্মুখবর্তিনীর দিকে। স্ত্রীলোকটি আবার চীৎকার ক'রে বলে: 'আমি আর ঐ বুড়ো, বুড়ো কর্তা বুঝলে, আর

কাক-চিলটি অবধি নেই।' 'কোথায় গেল আর সব?' সভয়ে ওয়াং জিজ্ঞাসা করে।

'কোথায় গেল? কাণের মাথা খেয়ে ছিলে কোথায় শুনি? এতো বড় ব্যাপারখানা সহরের কুকুর বেড়ালটাও জানে। যত সব চোখ কাণ-খেগো! সেবার ডাকাত পড়ল শোনোনি কিছু? একদল ডাকাত,—কিছু কি আর রেখে গেছে? একটা কুটোও না। দাসীগুলোকে সুদ্ধ লুটের মাল ক'রে নিয়েছে। কর্তাকে বুড়ো আঙ্গুলে বেঁধে কড়ি কাঠের সাথে ঝুলিয়ে সেকি মার! আর গিন্নীর মুখে একরাশ কাপড় গুঁজে,—যেন টুঁ শব্দটি না বেরোয়—চেয়ারের সাথে বেঁধে চলে গেল। আমি পালাই-টালাইনি। একটা ঢাকা চৌবাচ্চার মধ্যে ঢুকে পড়লাম বেমালুম। ডাকাতরা যেতে তবে বেরই! দেখি গিন্নী ঠাকরুণ তো বসে বসেই ভয়ে কাঠ মেরেছেন। ও দেহে কি আর ছিল কিছু? আফিংএ একদম ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ভয়ের ধাক্কা আর সইবে কি করে?'

'চাকর তো মেলাই ছিল, তারা? দরোয়ান?' ওয়াং হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—ভয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

নির্বিকার স্বরে স্ত্রীলোকটি বলে: 'কোনো ব্যাটা কি আছে? সব চলে গেছে কোন কালে। শীতের মাঝামাঝি খাবার ফুরোল, ট্যাঁকও গড়ের মাঠ!' তারপর স্বর নামিয়ে কাণে কাণে বলে: 'চাকররা—ওরাই তো সব ও দলে ছিল। দরোয়ান ব্যাটাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওই নেমকহারাম কুকুরটাই তো পথ দেখিয়ে দিয়েছে। কর্তার সামনের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আঁচিলটা আর তার ওপরের চুল তিন গাছ যাবে কোথায়? আমার চোখে ধুলো দেবে? হুঃ ঠিক চিনেছি। আরো চাকর ব্যাটারা সব ছিল। নয়তো জানা লোক ছাড়া ভেতরের অন্দি সন্ধির খোঁজ জানে আর কেউ ভেবেছ?' বলে সে চুপ করে গেল। চারপাশে আবার রক্তহীন নীরবতার স্তর জমে উঠল। মৃত্যুর মত নীরবতা।

তারপর আবার আরম্ভ করে: 'এ কি আর একদিনে হ'য়েছে ভেবেছ? তলা চোঁয়াচ্ছে সেই কর্তার বাপের আমল থেকে। বাবুরা জমিদারী দেখাশোনা ছাড়লেন। ম্যানেজার টাকা জোগায় আর তারা দু'হাতে ওড়ায়—এই তো ব্যবস্থা। সেই থেকেই ভেতর ফাঁপা হয়ে চলছিল কোনমতে। আর হাল

আমলে জমিদারী যেতে বসল। একখানা দুখানা ক'রে জমি খসতে সুরু করল। হুট্ করতেই বেচ জমি।'

ওয়াং অবাক্ হয়ে শোনে—যেন রূপকথার গল্প। কিছুতে বিশ্বাস হয় না।

'কর্তার ছেলেরা সব কোথায় ?' ওয়াং জিজ্ঞাসা করে। 'সব যে যার মত এখানে সেখানে', নির্লিপ্ত স্বরে মেয়েটি উত্তর দেয় : 'ভাগ্যি ভালো যে মেয়ে দুটোর বিয়ে চুকে গিয়েছিল। এখানকার এসব ব্যাপার শুনে কর্তার বড় ছেলে বাপ-মাকে নিতে লোক পাঠিয়েছিল। আমি বাপু যেতে দিইনি। এই যক্ষির পুরীতে থাকবে কে ? আমি তো মেয়েমানুষ আমি কি এখানে একা থাকতে পারি ?' কথাগুলো বলার সময় ওর পাতলা ঠোঁট দুটিতে একটু ভক্তির কুঞ্চন জাগল। একটু থেমে আবার বলল : 'এতকাল বাবুর সেবাতেই তো কাটল, আমার কি আর আপনার বলতে কিছু আছে। সবই আমার এখানে।'

ওয়াং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এইবারে ও যেন সব বুঝতে পারছে। এই পারের-যাত্রী বৃদ্ধের ওপর এত অনুরাগের মূলে রয়েছে লাভের আশা—লোকটা মরলে সবই এর। ঘৃণায় ওর মন কুণ্ঠিত হয়ে যায়।

'তুমি তো এখানকার ঝি বলে মনে হচ্ছে,—কাজের কথা তোমার সাথে হবে কি ক'রে ?'

'আমি যা বলব তাই ও মুখপোড়া ক'রবে,' বিরক্তভাবে জবাব দেয় স্ত্রীলোকটি। ওয়াং একটু ভাবে। জমি আছে, ও না কিনলে এই মেয়েটার হাত দিয়েই কিনবে অন্যে। ইতস্ততঃ ক'রে ও জিজ্ঞাসা করে : 'জমি কতটা হবে ?'

ওয়াঙের মনের কথা নিমেষে পড়ে নেয় মেয়েটি। বলে : 'জমি কিনতেই যদি এসে থাকো তবে শোন, বিক্রীর জমি আছে অনেক। পশ্চিমের দিকে শ'খানেক একর হবে, আর দক্ষিণের দিকে এই শ'দুই। একসাথে নেই, ভাগ ভাগ করা রয়েছে।' হিসেবগুলো এমন গড়্ গড়্ ক'রে বলে গেল—যে ওয়াং বেশ বুঝতে পারল যে বুড়োর যা কিছু অবশিষ্ট আছে তার কড়াক্রান্তির হিসেব এ মেয়ে রাখে। তাও ওর না হ'ল বিশ্বাস, না চাইল ওর মন এর সাথে কাজের কথা কইতে। 'ছেলেদের মত না নিয়েই কর্তা গোটা জমিদারী বেচবেন, এও কি একটা কথা ?' ওয়াং সন্দেহ প্রকাশ করে।

'সে বিষয়ে ভাবনা নেই গো তোমার। জমি সব বেচে ফেলতেই তারা বাবাকে বলেছে। সাতজন্মে তারা কেউ এখানে এসে থাকবে ভেবেছ ? তা

ছাড়া দুর্ভিক্ষ আর আকালের দিনে যা চোর ডাকাতের উপদ্রব,—থাকবে কি? বাপকে তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে তারা এখানে এসে থাকতে পারবে না। বরং জমিদারী বেচে টাকাটা ভাগযোগ ক'রে নিলে কাজে আসবে।'

'কিনব তো, তা দামটা দেব কার হাতে?' ওয়াঙের তখনও পুরো বিশ্বাস হয়নি মেয়েটির কথাগুলো।

'কর্তাই তো রয়েছেন বাপু খোদ।' মোলায়েম ভাবে মেয়েটি বলে।

কিন্তু ওয়াং বু'ঝে নিয়েছে কর্তার হাত গলিয়ে ওই হাতেই যেয়ে পড়বে সুতরাং এর সাথে ও আর কোনো কথা কইবে না।

'আচ্ছা তা'হলে আর একদিন—' বলতে বলতে ফেরে ওয়াং। স্ত্রীলোকটি চীৎকার করতে করতে পেছন পেছন এলো রাস্তা পর্যন্ত: 'আচ্ছা কাল তাহ'লে এই সময় এসো। এ সময় সুবিধে না হ'লে বিকেলেই এসো। আমাদের সব সময়ই সময়।'

ওয়াং উত্তর না দিয়ে পথ ধরল। ওর মাথাটা যেন গুলিয়ে গেছে। যা কিছু শুনে এল, একটু চিন্তা না করলে ঠিক ঠাহর হচ্ছেনা। ছোট্ট চা-এর দোকানটায় গিয়ে চা-এর হুকুম দিয়ে বসে পড়ল। ভৃত্য চট্‌পট্ চা এনে দিল এবং একটু উদ্ধত ভাবে দামটা তুলে নিয়ে বাজাতে বাজাতে চলে গেল। ওয়াং তার ভাবনায় ডুবে গেল। যতই ভাবে ততই সবটা ইতিহাস ওর বড় ভয়ানক মনে হয়। নগরের গৌরব ও শক্তির উৎস এই মহাধনী অভিজাত পরিবারের এ অধ:পতন, এ দুর্গতি কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

বড় বেদনার সঙ্গেই ওর মনে হয় মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েই এমনি হ'ল। নিজের ছেলেদের কথা মনে হয়। বসন্তের নব-কিশলয়ের মত ছেলেদু'টি বেড়ে উঠেছে। ওয়াং ঠিক ক'রল, ওদের খেলা-ধুলো আর ঘুরে-বেড়ানো আজই বন্ধ ক'রে দেবে এবং সোজা ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দেবে। মাটি আর লাঙলের সুর রক্তে এখন থেকেই লাগুক ওদের।

জহরতগুলো ওয়াঙের বুকের মধ্যে যেন কাঁটার মত বিঁধছিল। ওর ভয় হ'তে লাগল এগুলোর অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বুঝি ওর ছিন্নবস্ত্র ভেদ ক'রে বাইরে এসে কারো চোখে পড়বে। যতক্ষণ না এই রাজার ধনকে ও মাটিতে রূপান্তরিত করতে পারে ততক্ষণ ওর শান্তি নাই। দোকানীকে একটু অবসর দেখে তাকে ডেকে বলল:

'ওখানে কেন? এখানে এসে ব'সো না ভাই, একসঙ্গে একটু চা খাই।

খাই, আর খেতে খেতে একটু গাল-গল্প করি। বহুদিন দেশে ছিলাম না—সহরের খবর টবর দুচারটে অমনি শোনা হবে'খন। চায়ের জন্য তোমার ভাবতে হবে না, সে খরচটা আমিই দেব।'

গল্পের নামে দোকানী সর্বদাই তৈরী, বিশেষ ক'রে তার সাথে যদি পরের পয়সায় নিজের ঘরের চায়ের চাট্ থাকে। এক মুহূর্ত দেরী হ'লনা, সে এসে টেবিলের একধারে ব'সে পড়ল। বেজীর মত মুখ, বাঁ চোখটা টেরা, শক্ত মোটা কাল কাপড়ের পোশাকের সামনের দিকটা তৈল-চর্চিত—এ দোকানটা ছাড়া ওর একটা হোটেলও ছিল—রান্না করত নিজের হাতেই, এ তারি চিহ্ন। এই দাগগুলো ওর গর্ব,—বুক ফুলিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলত: 'কাপড়ে দাগ না থাকলে আর রাঁধুনি কিসের—! এ-তো রাঁধুনির অঙ্গের সাজ।' আর সেই জন্যই ও ভাবতো পরিষ্কার থাকাটা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। মুহূর্ত মাত্র দেরী না ক'রে লোকটা আরম্ভ ক'রে দিল: 'যা আকালটা হ'লো ও বছর। হাজার হাজার লোক না খেয়েই মরল। তবে এ-তো মামুলী খবর। আসল খবর জানোনা! সেই জমিদার বাড়ীতে ডাকাত পড়ার কথা শুনেছ?'

ঠিক এইটেই জানতে চেয়েছিল ওয়াং। দোকানী বেশ রং ফলিয়ে বর্ণনা ক'রতে লাগল, কেমন ক'রে চেঁচিয়ে দাসী-চাকরেরা বাড়ী মাথায় ক'রে তুলেছিল। কটা মাগীকে ডাকাত-ব্যাটারা তো নিয়েই গেল। বুড়ো কর্তার মেয়েমানুষ-গুলোর মধ্যে ক'টা পালিয়েছে, যারা পালাতে পারেনি ডাকাতদের হাতে তাদের কি হালই না হ'লো। কাউকে তাড়িয়ে দিলে, কাউকে নিয়ে গেল। খাঁ খাঁ করে বাড়ীটা এখন। কে আর থাকবে! আছে খালি কোকিলা মাগী। মাগী ধড়িবাজ, সেই গোড়া থেকে একেবারে শেকড় গেড়ে ব'সে আছে। নড়বার নামটি নেই। কত মেয়েমানুষই এল, মাগী কি কাউকে তিষ্ঠুতে দিয়েছে দুদিনের বেশী! এখন ওই আছে এই শূন্য পুরীতে যক্ষি হ'য়ে, আর বুড়ো আছে মাগীর হাতে দুধে-খোকাটি হ'য়ে।'

ওয়াং বেশ মন দিয়ে শুনে বলে:

'কর্তা তাহ'লে ও মাগীর হাতের মুঠোয়, কি বল?'

'স্রেফ ভ্যাড়াটি বানিয়েছে হে বুড়োকে। বেটি হাতড়েছে কম? দু'হাতে লুটছে যা পাচ্ছে সব। কিন্তু বেশীদিন আর নয়—কর্তার ছেলেরা সব এলেই পাততাড়ি গুটোতে হবে। তাদের সেখানকার কাজকর্ম একটু গোছগাছ ক'রে নিতে পারলেই আসবে সব তারা। দেবে তখন দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে।

ছ্যাদা কথায় বধূরা আর ভুলবেন না। মাগী স্যাকা। তা ওর ভাবনাটাই বা কি। বুঝ্ ঠিক বুঝে নিয়েছে। একশো বছর বসে বসে খেলেও ভাবনা নেই।'

'জমিজমাগুলো সব কি করবে জানো ?' আগ্রহে, আশায় ওয়াঙের সর্ব দেহ কাঁপতে থাকে।

'হু: জমিজমা—সেতো ওদের কাছে স্রেফ ধুলো। ওরা তো ওসব গণ্যিই করে না।'

'বেচবে কি না জানো ?' অধীর হ'য়ে ওয়াং জিজ্ঞাসা করে।

নিতান্ত সাধারণ নির্লিপ্ত স্বরে দোকানী জবাব দেয় :

'হ্যাঁ কি বলছ ? জমি ?' এর মধ্যেই খদ্দের এসে উপস্থিত হয়। দোকানী উঠে যেতে যেতে বলে : 'শুনেছিলাম জমিজমা সবই বেচবে। খালি যেখানটায় ওদের তুপুরুষ ধরে কবর দিচ্ছে সেইটুকু রাখবে।'

ওয়াং উঠ্‌ল। যা শুনতে এসেছিল তা শোনা হ'ল। আবার জমিদার-বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকটি এসে দরজা খুলে দেয়। ভেতরে না গিয়েই ওয়াং বলে : 'ঠিক ক'রে বলো দেখি বিক্রীর কবালায় কর্তা নিজের সই দেবেন তো ?'

স্ত্রীলোকটি ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল :

'দেবে আবার না—সাতশো বার দেবে। আমি বলছি তোমায় দেবে।'

তারপর সোজাসুজি ওয়াং বলে : 'দামটা কি কাঁচা টাকায়ই চাও না জহরৎ হ'লেও চলবে ?'

স্ত্রীলোকটির চোখ জ্ব'লে উঠ্‌ল, বলল : 'জহরতই আমি চাই।'

সতের

ওয়াঙের এখন যা জমি তাতে একটা বলদ আর একটা মানুষে কুলিয়ে উঠতে পারেনা। ফসল যা হয়েছে তা একজন মানুষের কাটার সাধ্য নেই। একটা গোলায়ও চলেনা এখন আর, কাজেই বাড়ীতে আর একটা ঘর বাড়াতে হয়। গাধা কেনা হ'ল একটা। প্রতিবেশী চিংকে গিয়ে ওয়াং বলল :

'এই তো অতটুকু জমি তোমার, কেন আর হাঙ্গাম পোয়াবে, দাও আমিই কিনে নি ওটুকু। আর তুমি চ'লে এসো আমার কাছে। এই শ্মশানপুরী

আগলে ক'রবে কি? দুভাইয়ে একসাথেই থাকা যাবে—আমারও একটু সাহায্য হবে, একা পেরে উঠিনা আর।'

শুনে চিং খুসীই হয়।

সময় মতই বৃষ্টি হ'ল। ধানের চারা বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে। গম কাটা হ'য়ে আঁটি আঁটি ক'রে আঙ্গিনায় এসে জমা হয়। তারপর মাড়াই ঝাড়াই হ'য়ে ওঠে গোলায়। প্রচুর বৃষ্টি হ'য়েছে, শুক্‌নো মাঠগুলো জলে ভ'রে ধান লাগাবার মত হয়েছে, ওয়াং ওলান্ দু'জনে মিলে জলভরা মাঠে ধানের রোয়া লাগিয়ে দিলে। অন্য বছরের চেয়ে এবার অনেক বেশী ধানের আবাদ ক'রেছে ওয়াং। ধান কাটার সময় আরো দুজন লাগাতে হ'ল।

জমিদার-বাড়ী হ'তে কেনা জমিটায় কাজ ক'রতে ক'রতে ওয়াঙের মনে পড়ে যায় ওই ধ্বংশোন্মুখ জমিদারদেরই কথা। তাই রোজ সকালে ও ছেলেদের মাঠে যেতে হুকুম করে। গাধা-বলদগুলোকে তাড়িয়ে দেখেশুনে রাখা—এবং অমনি হাল্কা ধরনের ছোটো খাটো কাজ যা ওরা ছোটো ছোটো হাতে সহজে পারবে, তাতেই ওদের লাগিয়ে দেয়। ওয়াঙের ইচ্ছাপরিশ্রমের কাজ ছেলেদের পক্ষে সম্ভব না হ'লেও, অন্ততঃপক্ষে রোদটা, আর চষা-জমির ওপর দিয়ে যাওয়া-আসার কষ্টটা তো অভ্যাস হোক।

কিন্তু ওলান্‌কে ওয়াং কিছুতেই আর ক্ষেতে আসতে দেয়না। কেনই বা দেবে? আগের মত গরীব তো নেই আর, ইচ্ছে হ'লেই দশটা জন মজুরও রাখতে পারে। এবারের মত এত ফসল কোনোবার হয় নি। আর একটা ঘরও বাড়াতেই হ'লো, নইলে নিজেদের ঘর কখানায় আর পা ফেলার জায়গা থাকে না। তিনটে শুয়োর ও একপাল মুরগী কিনে ফেলল ওয়াং। খুদকুঁড়ো তো মেলাই হয়—তাতেই মুরগীগুলোর চলবে। ওলান্ বসে থাকেনা, স্বামী পুত্রের জন্য জুতো জামা তৈরী করে, প্রত্যেকটি বিছানার জন্য নতুন লেপ্ করে, তার ওয়াড়ে ব'সে ব'সে ফুল তোলে। জামা কাপড়, বিছানা সব কিছুতেই এখন স্বচ্ছলতার চিহ্ন।

কিছুদিন পরে ওলান্ আবার যেয়ে শয্যা নিল। আবার এল নূতন শিশু। কিন্তু এবারেও আঁতুড়ে কাউকে থাকতে দিলনা ওলান্। ইচ্ছে হ'লেই তো এখন টাকা খরচ করে দাই আনতে পারে। কিন্তু ওলান্ একাই থাক্‌বে। এবারে প্রসবে বড় বেশী সময় লাগল। ওয়াং বাড়ী ফিরে দেখে বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে হেসে বলছে: 'এবারে এক ডিমের দুই কুসুম রে।

ওয়াং ভিতরে গিয়ে দেখল ওলান্ শুয়ে আছে। পাশে সদ্যোজাত যমজ শিশু—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। একেবারে হুবহু একরকম চেহারা, যেন এক ধানের দুইটি চাল। ওয়াং হোঃ হোঃ ক'রে হেসেই কুটিপাটি। তারপর ওর ইচ্ছে হয় একটু ঠাট্টা করে। বলে: 'ওঃ—এইজন্যই তুমি দুটো মুক্তো বুকে পুরে রেখেছিলে?' কথাটা মনে আসতেই ওয়াং আবার একচোট হাসে। ওয়াংকে খুশী দেখে ওলান্‌ও একটু হাসে,—সেই চিরকালের মন্থর, বিষাদঘন মৃদু হাসির একটু রেখা মাত্র।

ওয়াঙের চারিদিক তখন একেবারে ভরা, কোথাও কোনো ফাঁক, কোনো অভাব বোধ নেই। কেবল একটুখানি কাঁটা রয়ে গেল—বড়খুকী কথা কইতে শিখল না, না এল ওর মধ্যে বয়সের উপযোগী কোনো চঞ্চলতা। বয়স বৃথাই ওর ওপর দিয়ে চলে গেল। কেবল বাপের চোখে চোখ পড়লে শৈশবের সেই হাসিখানি হাসে। এ কিসের অভিশাপ? ওর প্রথম জীবনের সেই বেঁচে থাকার মহাসংগ্রাম? অনাহার? কিসের পরিণাম এ? ওয়াং ব্যাকুল হ'য়ে প্রতীক্ষা করে কবে কচি ঠোঁট দুখানি দিয়ে ও আধো আধো বোলে 'বা—বা' বলে ওকে প্রথম সম্ভাষণ জানাবে। কিন্তু কই বোবা মুখে দন্তহীন মৃদু, মধুর হাসিটুকু ছাড়া আর কোন ভাষা ফুটল না। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ওয়াঙের যেন পাঁজরা ভেঙ্গে যায়। আবেগ ভরে আদর করতে যায়: 'ওরে আমার সোনামাণিক আমার হাঁদুমণি',—আদরের ভাষা অস্ফুট, চাপা একটা বেদনার গুমরাণীতে পর্যবসিত হয়, বুকের মধ্যে খালি এই কথা গুমরে বেড়ায় হতভাগীকে যদিও তখন বেচে ফেলত, তবে এতদিনে তারা নিশ্চয় ওকে মেরে ফেলত।

ওয়াং নিবিড়ভাবে শিশুকে আঁকড়ে ধরে, এতে যদি বেচারার জীবনের মহাক্ষতির কিছুমাত্রও পূরণ হয়। কখন ও সঙ্গে সঙ্গে মাঠে যায়। নিঃশব্দে ওয়াঙের পায়ে পায়ে চলে, ওয়াং কথা কইলে বা হাসলে একটুখানি হাসে।

ওয়াংদের এ অঞ্চলটায় দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি তো আছেই, তাছাড়া মাসে মাসে পাহাড় থেকে ঢল নেমে শত শত বছরের আগেকার তৈরী বাঁধ ছাপিয়ে মাঠ ঘাট সব ভাসিয়ে দেয়। এই সব কারণে প্রতি পাঁচ বছরে একবার অন্ততঃ দুর্ভিক্ষ হয়। ভগবানের কৃপায় মাঝে

মাঝে ফাঁক পড়েছে অবশ্য—পাঁচ বছরের যায়গায় হয়ত' সাত-আট বছর হয়েছে বড় জোর ফাঁকটা।

প্রতি দুর্ভিক্ষের সময় সবাই দেশ ছেড়ে গেছে, আবার অবশ্য ফিরে এসেছে। সেইজন্য ওয়াং ওর চারপাশে এমনি বাঁধন আঁটতে লাগল যেন ওকে কোনো দুর্বছরে মাটি ছেড়ে যেতে না হয়। সু-সময়ের সঞ্চয় ওর অকালের পাথেয় যেন হয়।

দেবতাও ওর সহায় হ'লেন। পর পর সাতটা বছর খুব বেশী ফসল হ'ল। প্রতিবছর উদ্বৃত্ত ফসল ঘরে উঠে সঞ্চিত হয়, প্রতিবছর আরো বেশী জন-মজুরের প্রয়োজন হয়, পুরানো বাড়ীর পেছনে আরো একটা মহল ওঠে,—একটা বড় ঘর, দুপাশে দুটো ছোট ছোট, সামনে একখানি আঙিনা, টালির ছাদ। দেওয়ালগুলো হ'ল মাটিরই,—ওদেরর মাঠ থেকে আনা মাটির—খালি ওপরে চুণের একটা পোঁচ পড়ল।

চিঙের পূর্ণ পরিচয় ওয়াঙের কাছে খুলে গেছে এ ক'বছরে। অতি বিশ্বাসী সাধুপ্রকৃতির মানুষটি। ওয়াং ওরই ওপর জমিজমার পুরো ভার ছেড়ে দিল। মাইনে মন্দ দেয়না—খাওয়া পরা বাদে দু' ডলার। কিন্তু চিঙের হাড়ে কিছুতেই একফোঁটা মাংস লাগে না। ওয়াং সর্বদাই ভালো ক'রে খাওয়া দাওয়া করার জন্য ওকে পীড়াপীড়ি করে। কিছুতেই কিছু হয় না। অত্যন্ত কৃশ, দুর্বল, এই এতটুকু মানুষই রইল চিং—অতিমাত্রায় গম্ভীর। সকাল থেকে সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত খুসী মনে কাজ ক'রে যায়। প্রয়োজন হলে একটা দুটো কথা কয় চির-অভ্যস্ত ক্ষীণ স্বরে। কইতে না হলেই খুসী হয় বেশী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর কোদাল ওঠে পড়ে; দুবেলা বালতি বালতি সার জল এনে গাছের গোড়ায় ঢালে।

'ওয়াং খুব ভালো ক'রে জানে, এমনি ভালো মানুষটি হ'লে কি হবে, ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার সাধ্য কারো নেই। জনমজুরদের মধ্যে কার ঘুমের মাত্রা একটু বেশী হ'ল বা দৈনিক বরাদ্দ খাবারে বীন্‌এর চাট্‌নী একটু বেশী কে খেয়ে ফেল্‌লে, বা ফসল কাটা তোলার সময় কার বৌ ছেলে এসে লুকিয়ে দু'মুঠো নিয়ে গেল—চিঙের চোখে এড়াবেনা কিছুতে। বছরের শেষে যখন সকলের একসাথে মিলিত ভোজ হয় তখন ও ঠিক ওয়াংকে কাণে কাণে বলবে অমুককে আর যেন আগামী বছর রাখা না হয়।

সেই একমুঠো বীজ আর বীজশস্যের আদান প্রদান এই দুটি প্রাণীকে ভাইয়ের প্রেমে বেঁধেছে। একটু অবশ্য তফাৎ আছে, ওয়াঙের স্থান উঁচুতে কাজেই বয়সে চিঙের চাইতে ছোট হলেও আসলে ওই হয়েছে বড়। এবং চিংও সম্পূর্ণ ভুলতে পারে না যে সে বেতনভোগী ভৃত্য, পরের ঘরে প্রবাসী।

পঞ্চম বছরের শেষে কাজ আরো অনেক বেড়ে গেল। নিজহাতে কাজ করার সময় ওয়াঙের আর প্রায় থাকেই না এখন। কাজকর্ম দেখাশোনা তারপর এত ফসল, এখন একেবারে গঞ্জে গিয়ে কারবার করতে হয়, এসবেই ওর সব সময় যায়। লেখাপড়া জানাতে ভয়ানক অসুবিধা হয় ওয়াঙের। উটের লোমের তুলি দিয়ে টানা ওই হিজিবিজি দাগগুলোর কোনো মানেই ও বোঝে না। ব্যবসা সংক্রান্ত দলিল চুক্তিপত্র ইত্যাদির ব্যাপারে বড় বিপদে পড়ে ওয়াং। বাধ্য হয়ে উদ্ধত প্রকৃতির ব্যাপারীদের কাছে সবিনয়ে সসঙ্কোচে নিরক্ষরতার লজ্জা স্বীকার ক'রে বলতে হয়: 'আমায় একটু শোনান দয়া ক'রে। আমি পড়তে জানিনে।' আরো বেশী লজ্জায় পড়ে নাম সই করার সময়। বাচ্চা কেরাণীটা পর্যন্ত ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি তুলিটা তুলে নিয়ে ওর নামের অক্ষরগুলো টেনে যায়। কি রকম বিশ্রী টিপ্পনী কাটে ওরা সব। ওয়াঙের ভারী লজ্জা করে।

সেদিন দুপুর বেলা, গঞ্জের হাটে ওরই ছেলের বয়সী ছোক্‌রা কর্মচারীদের কাছ থেকে বিদ্রূপের হাসি শুনে ওয়াং ভয়ানক রেগে বাড়ী ফিরল।

'সহুরে ভূত যত সব! কারো তো একহাত জমির মুরোদ নেই, ওদের ওই হিজিবিজি কালির আঁচড় পড়তে পারিনে বলে আবার আসে আমায় ঠাট্টা করতে।'

তারপর রাগটা পড়ে গেলে ভেবে দেখল, সত্যিই তো লিখতে পড়তে না পারাটা ভারী লজ্জার ব্যাপার বৈকি। কালই বড় খোকাকে ক্ষেতের কাজ ছাড়িয়ে সহরের স্কুলে পাঠিয়ে দেব। লেখাপড়া শিখে ওই শেষে বাপের হ'য়ে ব্যবসা সংক্রান্ত যত লেখাপড়ার কাজ সব করবে। তখন বাছাদের হাসি, টিট্‌কারী বেরিয়ে যাবে। অতগুলো জমির মালিক ও, ওকে ঠাট্টা!

মতলবটা ওর ভালোই ঠেক্‌ল। সেদিনই বড় ছেলেকে ডাকল। বছর বারো বয়স হয়েছে, লম্বা দোহারা গড়ন, মায়ের মত বড় বড় হাত পা, চোয়ালের হাড়

চওড়া, বাপের মত প্রখর দৃষ্টি চোখে। ওয়াং তাকে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে দেয়; 'মাঠে আর তোমায় যেতে হবেনা এখন থেকে। লেখাপড়া জানা একটা লোকের দরকার ব্যবসা চালানোর জন্য।' শুনে ছেলের মুখ আনন্দে ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠল। বলল: 'বহুদিন থেকেই আমার মনে মনে বড় ইচ্ছে ছিল, ভয়ে তোমায় বলতে পারিনি।'

মেজ খোকা শুনেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল; ছোটবেলা থেকে ওর ওই অভ্যাস। চ্যাঁচামেচী, কান্নাকাটি যে ক'রে হোক কাজ আদায় করে নেবেই। যেদিন থেকে ও প্রথম কথা বলতে শিখেছে—ওকে বিশ্বসংসারের সবাই ঠকাচ্ছে এমনি একটা ধারণা সেদিন থেকে ওর মনে বসে গেছে। তাই সবটাতেই ভাগে কম পড়েছে বলে কান্না আর ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। আজও সে এসে বাবার কাছে ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করতে লাগল: 'বেশ আমিও মাঠে যাবোনা কিছুতে। দাদা দিব্যি বসে বসে থাকবে আর আরাম করে লিখবে পড়বে, আর আমি গাধার মত খাটব। দাদাই খালি তোমার ছেলে, আমি যেন কেউ নই!'

ওয়াঙের এ ঘ্যান্‌ ঘ্যানানী ভালো লাগে না। অসহিষ্ণু হ'য়ে বলে: 'বেশ বাপু, বেশ। দুজনেই যেও,—হ'ল? একজনকে যমে নিলে আর একজন থাকবে, আমারি ভাগে।'

তারপর স্ত্রীকে পাঠাল সহরে ছেলেদের জামার কাপড় কিনতে; নিজে গিয়ে ওদের কাগজ, তুলি, দোয়াত এসব কিনে আনল। বড় মুস্কিলে পড়েছিল ওয়াং। এসব ব্যাপারে ও একেবারে অজ্ঞ, লজ্জায় দোকানীর কাছে নিজের অজ্ঞতাও প্রকাশ করতে পারেনা। দোকানী যা কিছু সামনে আনে ওয়াং সন্দেহের চোখে দেখে। যাক্‌ এদিকের সব আয়োজন ঠিক হ'য়ে গেল সহরের গেটের কাছে বুড়ো গুরুমহাশয়ের ছোট পাঠশালাটায়ই ও ছেলেদের দেবে ঠিক করল। গুরুমশায়টি নাকি এককালে কি একটা সরকারী পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু পাশ করা আর হয়নি। কাজেই নিজের বসত-বাড়ীর একটা ঘরে বেঞ্চি পেতে, যৎসামান্য মাইনে নিয়ে ছেলে পড়ান। সারাদিন পোড়োরা উপুড় হয়ে বই মুখস্থ করে,—ফাঁকির জো নেই। পড়া না পারলে হাতের প্রকাণ্ড পাখাটার বাঁট পোড়োদের পিঠে সজোরে পড়ে।

গরমের দিনটায় ছেলেরা একটু ফাঁক পায়। খাবার পর গুরুমশায়ের চোখ প্রথমে একটু ঢুলে আসে, তারপর ধীরে ধীরে ছোটো ঘরখানা নাসিকা-ধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে ওঠে। ছেলেরা তখন ফাঁক পেয়ে খেলায় মাতে,—

ফিসফাস করে, মজার মজার ছবি এঁকে এ ওকে দেখায়; গুরুমশায়ের ব্যাদিত মুখ-গহ্বরের অতি কাছে মাছি উড়তে দেখে বাজী রাখে ওটা ওঁর মুখের মধ্যে পড়্‌বে কিনা। হঠাৎ গুরুমশায়ের চোখ খুলে যায় কোনো এত্তালা না দিয়েই। এবারে পালা গুরুমশায়ের। ওঁর পাখার বাঁধের চট্‌ পটাপট্‌ আওয়াজ শুনে পড়শীরা বলে: 'হাঁ, এমন নইলে মাষ্টার!' এই কারণেই ওয়াং ছেলেদের জন্য এই পাঠশালাটাই নির্বাচন করল শিক্ষার যোগ্যতম স্থান বলে।

একটা দিন ঠিক ক'রে ওয়াং ছেলেদের পাঠশালায় নিয়ে চল্‌ল। ওয়াং আগে আগে চলে, ছেলে বাপ পাশাপাশি চলা বেয়াদপী। নীল রংএর রুমালে বেঁধে কটা ডিম এনেছিল ওয়াং, গুরুমশায়কে ভেট দিল। লোকটার প্রকাণ্ড পিতলের ফ্রেমের চশমা, কালো কাপড়ের লম্বা চাপ্‌কান, হাতের বিরাট পাখাটা— শীতের দিনেও সেটা হাতছাড়া হয়না—এসব দেখে ওয়াং ভয়ে ভক্তিতে গদগদ হ'য়ে গেল। প্রণাম করে বলল: 'আমার ছেলে দুটো ঠাকুর আপনার পায়েই রইল। ওদের মাথায় মোটা খুলির মধ্যে ঠেঙ্গিয়ে ঠুঙ্গিয়ে যাহোক ক'রে কিছু ঢুকিয়ে দেবেন।'

ছেলেরা বিস্মিত দৃষ্টিতে বেঞ্চে অধিষ্ঠিত মূর্তিগুলিকে দেখে, চোখা-চোখি হয় ওদের সঙ্গে।

ছেলেদের স্কুলে রেখে বাড়ী ফেরার সময় গর্বে যেন ফেটে পড়তে লাগল। ওর মনে হ'ল, ওই অতগুলো ছেলের মধ্যে ওর ছেলেদের মত অমন বলিষ্ঠ চেহারা, অমন উজ্জ্বল বাদামী রং, আর কারো নেই। গেট পার হতে এক পড়শীর সাথে দেখা হ'য়ে যায়, সহরের দিকে চলেছে সে। তার প্রশ্নের উত্তরে ওয়াং জানাল যে সে ছেলেদের ইস্কুলে দিতে গিয়েছিল। লোকটার বিস্ময়ের ভাব দেখে নিতান্ত উদাসীনভাবে বলে: 'ক্ষেতে খাটবার আর ওদের দরকারটাই বা কি। ওরা তার চাইতে দু'টো আঁচড় কাটতেই শিখুক, কি বলো। ভাতের ভাবনা তো ঠাকুরের কৃপায় নেই আর!'

যেতে যেতে ওয়াং ভেবে দেখল যে বড় খোকা যদি কালে মস্ত পণ্ডিত হয়ে ওঠে তবে ও মোটেই অবাক হবে না।

সেদিন থেকে গুরুমশায় বড় খোকা ছোট খোকা নাম ঘুচিয়ে, ওয়াঙের ছেলেদের নাম রাখেন নাং এন আর নাং ওয়েন। নাং শব্দটার মানে অর্থ সম্পদ্‌।

আঠার

ওয়াং আটঘাট বেঁধে নিয়েছে, কোনো ছিদ্র দিয়ে যেন দুর্দিন না আসে। সপ্তম বছরে উত্তর পশ্চিমে অতিবৃষ্টি আর তুষারপাতের ফলে উত্তর দিককার বড় নদীটায় বান এল। বাঁধ জল ঠেকাতে পারল না। ঐ অঞ্চলটা প্রায় সব বন্যায় ভেসে গেল। ওয়াঙের জমির অর্ধেকের বেশী এক কাঁধ জলের তলায় তলিয়ে গেল। কিন্তু ওয়াঙের ভয়ের কিছু নেই।

বসন্তের শেষের দিক থেকে গ্রীষ্মের প্রথম পর্যন্ত জল কেবলি বাড়ল। চারিদিকে শুধু জল আর জল যেন একটি মহাসাগর, নিস্তরঙ্গ অলস বিস্তারে এলিয়ে, আকাশের চাঁদ, ভাসমান মেঘ, সারি সারি উইলো গাছের ছায়া বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আসে। আধ-ডোবা বাঁশঝাড়ের ছায়ার ঋজু রেখাগুলো সেই শান্ত, সীমাহীন জলের বুক বিচিত্র ক'রে তুলেছে। জনহীন, পরিত্যক্ত মেটে ঘরগুলো প্রথমটা দাঁড়িয়েই ছিল ক'দিন; তারপর জলের টানে ভেঙ্গে পড়েছে। ওয়াং লাংএর বাড়ীটা কেবল একটা ছোট টিলার উপর ছিল ব'লে বেঁচে গেছে। তা ছাড়া প্রায় সব বাড়ীর ওই এক দশা। জলবেষ্টিত টিলাগুলো এক একটি দ্বীপ হয়ে উঠেছে।

ওয়াং ভয় করবেই বা কেন? ব্যবসায়ে ওর বহু টাকা খাটছে। গত দু'বছরের উদ্বৃত্ত ফসলে ওর গোলা ভরা। বাড়ীখানার জন্যও ভাবনা নেই, অত উঁচুতে জল উঠবে না। কাজেই ওয়াঙের কোনো ভয় ভাবনা নেই।

কিন্তু বেশীর ভাগ জমি জলে ডোবা বলে চাষবাস বন্ধ। একেবারে অলস কর্মহীন জীবন। খাওয়ার ভাবনা নেই; কেবল ভাবনা নেই নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়ই রয়েছে। এখন কেবল শুয়ে বসে থাকা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমেও ক্লান্তি এসে যায়। ওয়াং চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। হাতের কাছে করার মত কিছুই খুঁজে পায় না; থাকবেই বা কি ক'রে। গোটা বছরের জন্য জন-মজুর লাগান হয়েছিল আগেই, তাদেরই এখন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে, জল না নামা পর্যন্ত থাকতে হবেও। কাজেই তারা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে অন্ন ধ্বংশ করবে আর ওয়াং খাটবে, তা তো হয় না। ওয়াং তাদেরই বরঞ্চ নানা কাজে লাগিয়ে দিল,—পুরানো বাড়ীটার খড়ের চাল ছাওয়া, নূতন বাড়ীর

টালির চাল চোঁয়ায়, তা সারানো ; লাঙ্গল, কোদাল মই জোয়াল সব মেরামত করা ; গরু বলদগুলোকে ভালো ক'রে দেখাশোনা করা, এমনি ধারা শত কাজে। হুকুম দিল : 'কতগুলো হাঁস কিনে ফেল না হে—যা জল দিব্যি সাঁতার কাটবে। শন তো মেলাই রয়েছে, দড়ি টড়ি পাকাও না।' এ সব কাজ আগে ওয়াং নিজ হাতেই করত। তখন ওই একহাতে লাঙ্গলও চালাত, এসবও করত। এখন এরাই করে। সুতরাং ওয়াং একেবারে কর্মহীন। এমন অলসভাবে বসে থেকে ও অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। কি করবে ভেবে পায় না।

একটা মানুষ সারাদিন কিছু আর তার ডোবা মাঠগুলির দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে পারে না ; যা পেটে ধরে তার বেশী একবারে বসে খাওয়াও যায় না ; ঘুমুলেও ঘুম ফুরিয়ে যায়। ওয়াং চঞ্চল হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—ওর উদ্দাম রক্তের কাছে নিস্তব্ধ বাড়ীখানা যেন একেবারে মৃত। বাবা বড় বেশী বুড়ো হয়ে প.ড়ছে, শরীরে শক্তি নেই, চোখে ভালো দেখতে পায় না, শুনতেও পায় না। সাধারণ কুশল প্রশ্ন—এখন চা খাবে কিনা, শীত করছে কিনা, এমনি ধারা দু'চারটে অসংলগ্ন কথা ছাড়া তার সাথে আর কোনো কথা বলার প্রয়োজনই হয় না। ওয়াঙের অসহ্য মনে হয়। কেন বাবা ওর আজের এই শ্রীবৃদ্ধি, এই উন্নতি দেখতে পায় না ? এখনও জলে চায়ের পাতা ভাসতে দেখলেই চীৎকার করবে : 'জলেই বেশ চলে যায়, চা খাওয়া, না কাঁচা পয়সা গেলা ! যত সব বড়মানুষী চাল !' বৃদ্ধকে কিছু বলেও লাভ নেই, কেননা তক্ষুনি সব ভুলে বসে থাকবে। একান্ত নিরালায় আপনার জগতে ডুবে থাকে বৃদ্ধ. অধিকাংশ সময় অতীতের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকে। ভুলে যায় তার বর্তমানের জরাগ্রস্ত রূপ। স্বপ্নের তরঙ্গে ভেসে ভেসে পশ্চাতে ফেলে আসা ভরা যৌবনের দিনে ফিরে যায়। আজ পাশের বাস্তব জগৎ বহুদূরে পড়ে থাকে।

বড় খুকী এখনও কথা বলে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দাদুর পাশে বসে একটা কাপড়ের ফালি পাকায়, ভাঁজ করে, আবার খোলে, আবার ভাঁজ করে। নিজের মনেই হাসে। ওয়াং ধনী—ওর জীবনের ভরা গাঙ্গে জোয়ার, ওর উপযুক্ত কথা ঐ বৃদ্ধ আর জড়-বুদ্ধি মেয়েটা কোথায় পাবে ? ওয়াং বাবাকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দেয়—মেয়ের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করে, প্রতিদানে পায় মেয়ের মধুর করুণ দন্তহীন হাসি। হাসিটুকু উঠেই চকিতে একটা বিষাদের ঘন ছায়ায় মিলিয়ে যায়—কেবল দীপ্তিহীন,

ম্লান আঁখিদুটির শূন্যতাখানি প'ড়ে থাকে। কন্যার মুখের বিষাদের মেঘ পিতার মুখে ছায়া ফেলে যায়; স্তব্ধ হয়ে ওয়াং মুখ ফিরিয়ে নেয়। যমজ ছেলে মেয়ে দুটি আঙিনায় ছুটো ছুটি ক'রে খেলা করে—সেদিকে সে একবার তাকায়।

কিন্তু কেবল শিশুদের অর্থহীন ছেলেমানুষী দেখে দেখে একটা পুরুষের মন ভরেনা। ক্ষণিকের হাসি, দুষ্টুমীর ঝলক ছড়িয়ে ওরা আপন খেলায় মাতে। ওয়াং লাং আবার একা। অধীর হয়ে ওঠে…। একটা চঞ্চলতা। স্ত্রীর দিকে চায়—বিচিত্র দৃষ্টিতে—পুরুষের দৃষ্টি…যে মেয়েকে—তার দেহকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়ে গেছে—প্রত্যহের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় যে মেয়ে সম্পূর্ণ ভাবে উদ্‌ঘাটিতা—নূতন ক'রে জানার মত, পাবার মত যার মধ্যে আর কিছুই বাকী নেই সে মেয়ের দিকে পুরুষ যে চোখে তাকায়—এ সেই দৃষ্টি।

ওয়াঙের মনে হয় জীবনে আজই সে প্রথম ওলান্‌কে দেখল। নিতান্ত সাধারণ, নিতান্ত আটপৌরে মেয়ে ওলান্। এরা নীরবে সংসারে চ'লে যায়—মানুষের হাটে তার কি মূল্য যাচাই হ'ল, ভেবেও দেখেনা কোনোদিন। আজই প্রথম ওয়াঙের মনে হয় ওলান্‌এর মত মেয়ের বাইরের ওই সাধারণ রূপটির উর্ধ্বে পুরুষের চোখে পড়বার মত আর কিছু নেই। এ মেয়ে কোনোদিন পুরুষের ধ্যানলোকের মানসী হ'য়ে ওঠে না। আজই প্রথম ওয়াঙের চোখে পড়ল ওলান্‌এর চুল রুক্ষ, কটা, তেল পড়েনি কতকাল; মুখটা অস্বাভাবিক বড়, চ্যাপ্টা; গায়ের চামড়া পুরু রুক্ষ; মোটা মোটা, পুরুষালি গড়ন; এককথায় এতটুকু সৌন্দর্য বা লালিত্য কোনো অঙ্গে নেই। অতি-বিস্তৃত ভ্রূ-জোড়া বিরল-কেশ, ঠোঁট দুটি অতি-বিস্ফারিত, হাত এবং পা বেমানান রকম বড়। এ সব ওয়াং যেন আজই প্রথম দেখল এমনি একটা স্বপরিচয়ের দৃষ্টিতে ওলান্‌এর দিকে তাকিয়ে রুক্ষ ভাবে হঠাৎ বলে উঠল:

'তোমায় দেখে লোকে চাষার বউ ছাড়া আর কিছু বল্‌বেনা। কে বল্‌বে যে তোমার স্বামীর এত জমি খামার, আর সে নিজে হাতে লাঙল ঠেলেনা—পয়সা দিয়ে জন খাটায়।'

ওলান্‌কে ওর কেমন লাগছে সে সম্বন্ধে ওয়াং আজ প্রথম মত প্রকাশ করল। প্রত্যুত্তরে ও শুধু নিবিড় বিষাদ বিধুর একটি মন্থর দৃষ্টি তুলে ধরল। একটা বেঞ্চিতে বসে একটা বড় ছুঁচ দিয়ে জুতোর সুকতলি সেলাই করছিল

ওলান্। হাত থেমে গেল, ছুঁচটা যেমন ধরা ছিল তেমনিই ধরা রইল, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে কালো দাঁতের রাশি বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ যেন ও বুঝতে পারল যে পুরুষ-ওয়াং আজ ওর দিকে তাকিয়েছে। গালের উঁচু হাড়গুলির ওপর দিয়ে একটু লালের আভা খেলে গেল। খুব ধীরে ধীরে বলল :

'ছোট খোকা খুকী যবার পর থেকে আমার শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না। ভেতরটায় যেন আগুন জলে সর্বক্ষণ।'

ওয়াং বুঝতে পারে ওলান্এর সরল মন ভেবে নিয়েছে ওর এই সাতটা বছরের মাতৃত্বে স্বামী রুষ্ট হ'য়েছে। বলে : 'আমি বলছি কি, একটু তেল কেনারও পয়সা জোটেনা তোমার? কালো কাপড় দিয়ে একটা নতুন জামাও সেলাই ক'রে নিতে পারো? তুমি এখন আর চাষার বৌ নও—তোমার স্বামী এখন রীতিমত বড়লোক, বুঝেছ। কিন্তু যে ছিরির জুতো পরে আছ তুমি—ও জমিদারের বোরা কস্মিন্ কালেও পরেনা।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওয়াঙের স্বরটা অতিমাত্রায় রুক্ষ হয়ে ওঠে।

ওলান নীরব। নম্র, ভীরু দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চায়; কি অপরাধ ক'রেছে বুঝতে পারেনা। তারপর দুখানা পা এক সঙ্গে ক'রে বেঞ্চিটার তলায় লুকিয়ে ফেলে। ওলান্কে অতগুলো পরুষ কথা বলার জন্য ওয়াং অন্তরে অন্তরে বড় লজ্জিত হয়। এই নারী এতকাল প্রভুভক্ত কুকুরের মত ওর অনুগমন ক'রেছে, দুঃখ দারিদ্র্যের দিনে যখন ওকে মাথার ঘাম পায় ফেলে ক্ষেতে কাজ করতে হয়েছে, এই নারীই তো, এমন কি প্রসবের পর-মুহূর্তেই শয্যা ছেড়ে উঠে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তার শ্রমের অংশ আপন হাতে তুলে নিয়েছে,—ওয়াং ভোলেনি সে কথা। তবুও কিছুতেই ও মনের বিরক্তি ঠেকাতে পারেনা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর ভাষায় বড় কঠিন সুর বেজে ওঠে :

'অত কষ্ট ক'রে তো দুটো পয়সার মুখ দেখেছি। আমি মোটেই চাইনে যে আমার বৌ অমন চাষাড়ে চেহারা ক'রে থাকে। আর তোমার ওই শ্রীচরণ দুখানা—'

ওয়াং থেমে যায়। ওর মনে হয় ওলান্ বড় বেশী কুৎসিৎ। কিন্তু ঐ সাধারণ ঢিলে সূতী কাপড়ের জুতো পরা পা দু'খানা যেন সব চেয়ে কুৎসিৎ। জলন্ত দৃষ্টিতে ওয়াং স্ত্রীর পায়ের দিকে তাকায়। ওলান্ আরো বেশী ক'রে বেঞ্চির নীচে পা দুটোকে ঠেলে দেয়। তারপর অনুচ্চার কণ্ঠে বলে :

'খুব ছোট বেলায়ই আমাকে বেচে ফেলেছিল কিনা, তাই মা আর

আমার পা বেঁধে দিতে পারেনি। মেয়ে দুটোর পা আমি বেঁধে দেব'খন।'

ওয়াং পেছন ফেরে। ওর বড় লজ্জা হয়, বেচারার ওপর অমন ক'রে রাগ ক'রেছে বলে। ওলান্ উল্টে রাগ করেনা ব'লেই তো ওর অত রাগ হয়। ওলান্ কেন রাগ করেনা ? কেন অত ভয় করে ?

নূতন কালো রংএর জামাটা টেনে নিয়ে পরতে পরতে বিরক্তির স্বরে বলে : 'যাই দেখি একবার চায়ের দোকানে—নতুন কিছু শুনে যদি একটু মুখ বদল হয়। ঘরে তো থাকার মধ্যে যত বোকা-হাবা, বুড়ো-হাবড়া আর দুটো বাচ্ছা ছেলে। আর কি কিছু আছে ! এর মধ্যে থাকে কি ক'রে মানুষ !'

সহরের দিকে যেতে যেতে ওর মনে পড়ে যায় ওলানই জহরতগুলো সেই টাকার কুমীরটার বাড়ী থেকে এনে ছিল। তা যদি না আনতো এবং হুকুম করা মাত্রই সব ওর হাতে তুলে না দিত, তবে সারা জীবনেও এই নতুন জমিগুলো ও কিছুতেই কিনতে পারত না। এ কথা মনে হ'তেই ওর রাগ আরো বেড়ে গেল। বিদ্রোহী ওয়াং নিজের অন্তরকে বোঝাতে বসল : 'হ'লোইবা। জহরতগুলো আনার সময় ওলান্ কি কিছু ভেবে চিন্তে হিসেব ক'রে এনেছিল। এনেছিল নেহাৎ খেয়াল খুসীতে, ছোট ছেলেরা রঙ্গীন লজেঞ্চুষ দেখলে যেমন খপ্ ক'রে ধরে। আর ওয়াং যদি না দেখত তবে তো ওলান্ চিরকালই ওগুলো বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখত।'

তারপর ভাবে : ওলান্ কি এখনও মুক্তা দুটো ওর বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রেখেছে। আগে কথাটা মাঝে মাঝে ওর ভাবনার খোরাক জুটিয়েছে এবং ভাবতে গিয়ে ওর মনে বিস্ময়ে একটা বিচিত্র অনুভূতি জেগেছে। কিন্তু আজ ঘৃণায় সারা মন ওর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল—কারণ, বহু-সন্তান-মাতৃত্বে ওলান্এর স্খলিত স্তনের কুরূপ মাংসপিণ্ডের মাঝে বড় বেমানান লাগে মুক্তা দুটো।

বন্যা না হ'লে এবং ওয়াং পূর্বের সেই দরিদ্র চাষী ওয়াং থাকলে কোনো বিপর্যয়ই ঘটত না। কিন্তু আজ ওয়াং বহু ঐশ্বর্যের অধিকারী। এখানে সেখানে নানা জায়গায় ওর অঢেল অর্থ লুকোন রয়েছে, দেয়ালের মধ্যে, নূতন বাড়ীর মেজেতে একটা টালির তলায় বস্তা ভরা, নিজেদের শোবার ঘরে বাক্সে কাপড়ের পুঁটুলী বাঁধা, বিছানার তোষকে তুলোর সাথে সেলাই করা, কোমরে,—কোথায় না

আছে। কোনো অভাব নেই ওয়াঙের। আজকাল আর একটা পেনি ব্যয় ক'রতে ক্ষতের মুখে ক্ষয়ের বেদনা জাগে না, আজ ওর অর্থ ব্যয়ে সার্থক—যেদিন সঞ্চয়ে সার্থক ছিল, সেদিন গেছে। অবহেলায় অজস্র অর্থ ওয়াঙের কোমর-বন্ধে পড়ে থাকে, হাতে ঠেকলেই হাত যেন জ্বালা করে। ওয়াং আজ অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে উঠেছে। যৌবনের দিনগুলিকে বিফলতায় বইয়ে না দিয়ে কেমন করে সার্থক করে তুলবে সে ভাবনাও ওয়াং ভাবতে আরম্ভ ক'রেছে।

আগের মত সব কিছুই এখন আর ওয়াঙের ভালো লাগে না। যে চায়ের দোকানে পা দিতে গিয়ে সেদিনকার নিতান্ত সাধারণ গ্রামের মানুষ ওয়াং ভীরু কুণ্ঠায় সংকুচিত হয়ে যেত—আজের ওয়াং আর সে চায়ের দোকানে ধরে না—দোকানগুলি ওর মনে হয় বড় নোংরা, বড় সঙ্কীর্ণ, ওর অযোগ্য। সে কালে ওকে কেউ চিনত না—ওর প্রতি চা পরিবেশক ভৃত্যদের ব্যবহার ছিল উদ্ধত। আজ ওয়াং এলেই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। একদিন ও ওদের কাণাকাণি করতেও শুনেছিল: 'এই যে ওয়াং-পাড়ার ওয়াং এল। সেবার শীতে সেই আকালের বছর জমিদার বাড়ীর বুড়োকর্তা মারা গেলেন—তার সব জমিদারী এইতো কিনেছে। মস্ত বড়লোক এখন ওয়াং।' সেদিন ওয়াং পরম ঔদাস্যের ভান ক'রে বসে পড়েছিল, কিন্তু গোপনে অন্তর গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ স্ত্রীর উপর অনর্থক রাগারাগি ক'রে মনটা তিক্ত হ'য়ে রয়েছে। লোকের অযাচিত সম্ভ্রম আজ আর ভালো লাগল না। গুম্ হয়ে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় আর ভাবে: 'কই সংসারটা যত ভালো বলে মনে হ'য়েছিল, তত ভালো ত নয়।' তারপর হঠাৎ ওর মনে হয়: 'আমার এতগুলো জমি, ছেলেরা আমার সব পণ্ডিত, আমি কেন এই ট্যারা চোখ, বেজীমুখো লোকটার দোকানে বসে চা খাব? আমার ক্ষেতের একটা জনই তো ওর চাইতে বেশী কামায়!'

মনে হ'তেই ওয়াং উঠে পড়ে। চায়ের দামটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই হন্ হন্ ক'র বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়—মন যে কি চায় নিজেই বুঝতে পারে না। গল্প-বুড়োর চালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে পড়ে মুহূর্তের জন্য। মেলাই মানুষ। বেঞ্চিটার শেষ-প্রান্তে গিয়ে ব'সে প'ড়ে শোনে সেকালের সেই 'তিন রাজ্যের বীরদের' কাহিনী। তবুও ওর অস্বস্তি

ঘোচে না। অন্য শ্রোতাদের মত গল্পের যাদু ওয়াংকে মুগ্ধ ক'রতে পারে না। লোকটার অনবরত পেতলের ঘণ্টা পেটার শব্দে ওয়াং বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল।

সহরের বড় রেস্তরাঁ। দক্ষিণী একটা লোক নূতন খুলেছে দোকানটা। লোকটা এ সব ব্যবসা জানে ভালো। ওয়াং আগে অনেকবার দোকানটার পাশ দিয়ে যাতায়াত ক'রেছে। জুয়ায়, মদে, রমণীতে কি ক'রে লোক এমন ক'রে টাকা ঢালে ভেবে শিউরে উঠেছে। কিন্তু আজ ওয়াং ঐ দিকেই পা চালিয়ে দিল। হাতে কোনো কাজ না থাকায় মন তার অনবস্থিত,·· একটা কিছু অবলম্বন চাই। স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য অনুশোচনার গ্লানি মনে খচ্ খচ্ ক'রে বিঁধছে। আর কিছু ভাবতে পারে না—ওয়াং নিষিদ্ধ পথেই পা বাড়ায়। ওর বিক্ষিপ্ত অনবস্থিত মন আজ নূতন কিছু চাইছে।

নূতন চায়ের দোকানটাতে এসে উপস্থিত হ'ল ওয়াং। দরজা পেরিয়ে একটা আলোক দীপ্ত ঘর—রাস্তার দিকে খোলা। সারা ঘরটা ভরে টেবিল সাজান। দৃপ্ত-ভঙ্গীতে এসে ঘরে ঢুকল ওয়াং। অন্তরের দীন ভীরুতা চাপা দেবার জন্য ভঙ্গীটাকে দৃপ্তভর করার প্রয়াস ওর হাবে ভাবে বেশ স্পষ্ট। এই তো কদিন আগে ওয়াং ছিল দীন হ'তেও দীন—একটা দুটো রূপোর মুদ্রার বেশী সঞ্চয়ের সম্বল কখনও ওর ছিল না; দক্ষিণ দেশে পেটের দায়ে ওকে রিক্‌শও টানতে হ'য়েছে। একথা ওর মনে জেগে থাকে।

রেস্তোরাঁয় প্রবেশ ক'রে ওয়াং চুপ করেই থাকে। চা কিনে চুপ চাপ খায় আর অবাক হ'য়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। প্রকাণ্ড বড় হলটা। সোনার জলে কারুকার্য করা ছাদ। দেয়ালে সাদা সিল্কের ওপর আঁকা কতকগুলি মেয়ের পট ঝোলান। ওয়াং গোপন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে পটগুলি দেখে। ওর মনে হয়, মানবী নয় এরা, স্বপ্নচারিণী, কল্লোলোকে-বাসিনী—বাস্তব জগতে অমন অপূর্ব সৌন্দর্য কোনদিনও তো ও দেখেনি! প্রথম দিন ছবিগুলির দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি কোন মতে চা খাওয়া সেরেই বেরিয়ে আসে।

দিনের পর দিন যায়। বানের জল জমি হ'তে আর নামে না। ওয়াংও রোজ রেস্তোঁরাতে আসে, একা একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে, আর

চা খেতে খেতে নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। বাড়ীতে, ঘরে, ক্ষেতে মাঠে কোথাও কোনো কাজ নেই; ফেরার কোনো তাড়া নেই, কাজেই রেস্তঁরাতে প্রতিদিনই একটু একটু ক'রে বেশী সময় কাটে। এর বেশী আর কিছু হ'তনা হয়ত শেষ পর্যন্ত। কারণ ঐশ্বর্য ওর চেহারার গ্রাম্যতার ছাপ মুছে নিতে পারেনি। এই অভিজাত রেস্তঁরাটিতে একমাত্র ওর পরনেই সুতী কাপড়ের বেশ, এবং পিঠের ওপর একটি বিসপিত বেণী। সহরবাসীরা এই জিনিষটি একেবারেই বর্জন ক'রেছে,—বেণীর কথা আজ ওরা কল্পনাও ক'রতে পারেনা। কাজেই স্থানটা ওর পক্ষে তেমন অনুকুলও হ'তোনা—আর ওয়াংও হয়ত নিজের স্থান ক'রে নিতে পারতনা। কিন্তু বিপর্যয় ঘটে গেল সেদিন সন্ধ্যেবেলা। রোজকার মতই ওয়াং হলের একেবারে পেছনের দিকটায় একটা টেবিলে বসে অন্যমনস্কভাবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল। এমন সময় প্রায় শেষ প্রান্তে প্রাচীরের গা বেয়ে দোতালায় যে সংকীর্ণ সিঁড়িটি চলে যাচ্ছে তা দিয়ে কে একজন নেমে এল।

সহরে রেস্তেঁরার এই বাড়ীটিই কেবল মাত্র দোতলা। অবশ্য পশ্চিমের কাছে যে প্যাগোডাটি আছে সেটা আরো উঁচু—পাঁচতলা। তবে প্যাগোডাটি তলার দিক থেকে ওপরে ক্রমশঃ সরু হ'য়ে গেছে। আর এই বাড়ীটি নীচ ওপর সমান আয়তন।

রাতে, বিশেষ ক'রে মধ্যরাত্রের পর, নারী কণ্ঠের উচ্ছল সঙ্গীত, তরল হাসির টুকরো, তরুণীর কোমল হাতের অপূর্ব বীণার ঝংকারের মিশ্রিত ধ্বনি ওপর তলার জানালার পথে ভেসে এসে বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে প্লাবিত করে দেয়। নীচের তলায় ওয়াং যেখানে বসে সেখানে আরো বহুলোক চা খায়—তাদের উচ্চ কণ্ঠের কোলাহল, পেয়ালার ঠুনঠুন, জুয়ার টেবিলের ওপর ডাইস পড়ার শব্দ আর সব কিছু ছাপিয়ে ওপরে ওঠে।

এবং এইজন্যই, ওরই পেছনে সিঁড়ি বেয়ে যে মেয়েটি নেমে এল, তার পায়ের শব্দ ওয়াং একেবারেই শুনতে পেল না। তাছাড়া ও স্বপ্নেও ভাবেনি এখানে কেউ ওকে চেনে। কাঁধের ওপর কার মৃদু স্পর্শ পেতেই ও ভয়ানক চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকাতেই একটি সুন্দরী নারীমূর্তির সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল। কোকিলা না? হ্যাঁ, কোকিলাই তো। হোয়াঙের জমি কিনে এর হাতেই তো ওয়াং তার জহরৎগুলো তুলে দিয়েছিল।

বিক্রীর কবলায় নাম সই করবার সময় বুড়ো কর্তার হাত বড় কাঁপছিল, এই মেয়েই তো তার হাতটা সোজা ক'রে ধরেছিল। ওয়াংকে দেখে মেয়েটি হাসল —তীক্ষ্ণ চাপা হাসি।

'তাই তো, ওয়াং চাষী যে গো! তুমি এখানে?' একটু শ্লেষের সঙ্গে 'চাষী' কথাটার ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে কোকিলা বলে।

ওয়াঙের মনে হল, যে ক'রে হোক এ মেয়েটাকে বোঝাতেই হবে ওয়াং আজ সেদিনের গেঁয়ো চাষা নেই। হেসে একটু বেশী রকম উচ্চস্বরে বলল :

'সবাই পয়সা খরচ করতে পারে, আর আমার পয়সা কি অপরাধ করল? ভগবান দুটো দিয়েছেন খরচ করব না?'

এই কথায় কোকিলা থেমে গেল ; ক্ষুদ্র চোখ দুটি সাপের চোখের মত জ্বলে উঠল, কিন্তু স্বরটি অতি মোলায়েম, যেন হাঁড়ি থেকে তেল ঝরে পড়ছে। বলল :

'আহা, বেশ বেশ। কেই বা না শুনেছে তোমার কথা। তা খেয়ে পরে দুটো পয়সা হাতে থাকলে ফুর্তি টুর্তি করতে পুরুষ মানুষের একটু মন যায় বৈকি। ঠিক জায়গাই এসেছ। ফুর্তি করতে চাও তো এমন জায়গা আর পাবে না। সহরের যত বড়লোক জমিদার সবাইতো এখানে আসে। এখানকার মত অমন মদ কোথাও নেই। আমাদের এখানকার মদ একটু খেয়ে দেখেছ ওয়াং?'

অর্ধলজ্জিতভাবে ওয়াং জবাব দেয় : 'না আমি চা-ই খাই রোজ। মদও খাইনি, জুয়াও খেলিনি।'

'চা!' কর্কশভাবে হেসে ওঠে কোকিলা। উচ্চকণ্ঠে বলে : 'কত রকমারী ভালো ভালো দামী দামী মদ রয়েছে এখানে—চা খেতে যাবে কোন দুঃখে।'

ওয়াং মাথা নীচু ক'রে থাকে। কোকিলা স্বর নামিয়ে ধূর্তভাবে বলে :

'তা হ'লে আর কিছুও তোমার চোখে পড়েনি বলো!—ছোট ছোট হাত, ফোটা ফুলের মত গাল, কিছুই না?'

ওয়াঙের মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়ে। লজ্জায় মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। ওর মনে হয় আশ-পাশের সবাই বিদ্রূপ-ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আর মেয়েটার কথা শুনছে। কিন্তু সাহস করে একটুখানি

চোখ তুলে দেখল কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই, সবাই যে যার নিয়ে ব্যস্ত। নূতন ক'রে আর এক ঝলক ডাইসের শব্দ ওঠে। বিব্রত হয়ে ওয়াং বলে :

'না, না,—দেখিনি—কিছুনা—খালি চা—'

স্ত্রীলোকটি আবার হেসে ওঠে। তারপর দেয়ালে ঝোলান ছবিগুলোর দিকে ইসারা ক'রে দেখিয়ে দিয়ে বলে : 'দেখেছ? ঐ সেই তাদেরই ছবি সব : কাকে চাও বল—আর আমার হাতে টাকা ফেলে দাও—এই মুহূর্তে তাকে এনে সামনে হাজির ক'রে দিচ্ছি।'

'কী বলছ?' ওয়াং বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলে : 'আমি ভেবেছিলাম এগুলো খালি পট। সেই যে গল্পবুড়োরা বলে 'কুয়েন লুয়েন' পাহাড়ে সব দেবীরা থাকে তাদের পট।'

'যা বলেছ পটই বটে!' কতক অন্তরঙ্গতা কতক বিদ্রূপের সুরে কোকিলা বলে : 'কিন্তু রূপোর ছোঁয়া পেলেই এ পটগুলো সব জলজ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ হয়ে যায়, জানো!' ব'লে ওয়াঙের দিকে ইঙ্গিত ক'রে দেখিয়ে পরিচারকদের দিকে টিপে মাথা নেড়ে নিজের কাজে চলে যায়। ইসারায় যেন বলে যায় : 'গেঁয়ো ভূত কোথাকার।'

ছবিগুলো ওয়াংকে নূতন ক'রে আকর্ষণ করে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে : এই সংকীর্ণ সিঁড়িটার শেষে ওর ঠিক মাথার ওপরেই ঐ দোতালায়, এই এরাই সব রক্তমাংসের জ্যান্ত মানুষ হয়ে আছে! ওখানেই, ওদের কাছেই এ লোকগুলো সব যায়! ও ছাড়া সবাই যায়। পুরুষ তারা। কিন্তু ও যে গৃহস্থ, ওর বৌ আছে, ছেলেপুলে আছে। আচ্ছা তা যদি না হ'তো তবে এদের মধ্যে কাকে ওয়াঙের পছন্দ হতো! সত্যি করে তো চাইছে না—ওতো মিছেমিছি—যদি ছাপোষা গৃহস্থ মানুষ না হ'ত তবে কি করত তাই তো একটু পরখ করছে ওয়াং। শিশু যেমন বাস্তব নিয়ে খেলার ভান করে, তেমনি ক'রেই ওয়াং আজ ওর মন নিয়ে খেলতে বসল। প্রতিটি ছবি নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে আবেগ দিয়ে দেখে যেন ওটা ছবি নয়, মানুষ! যতক্ষণ নির্বাচনের প্রশ্ন ছিল না, প্রত্যেকটি সমান সুন্দর মনে হয়েছে ওয়াঙের। কিন্তু এখন যেন সৌন্দর্যের তারতম্য ওর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। গোটা কুড়ি ছবির মধ্যে তিনখানা ওর সব চাইতে সুন্দর বলে মনে হ'ল। তারপর সে তিনখানা ভালো করে যাচাই করে দেখল। এবং শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে একজন মাত্র চূড়ান্ত নির্বাচনের গৌরব পেল। অপূর্ব সুন্দরী—ছোট খাট, ছিপ্‌ছিপে গড়ন,

বেণুযষ্টির মত লঘু। ছোট মুখখানা বেড়ালছানার মুখের মতো ছুঁচলো,—এক হাতে একটি সবৃন্ত পদ্ম কোরক। হাতখানা নবোন্মেষিত ফার্ণের মত পেলব।

ওয়াঙের পলক পড়েনা। সুরার মত একটা তীব্র জ্বালা ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটু জোরেই: 'কি চমৎকার ঠিক যেন একটি কুইন্স ফ্লগ।'

স্বরটা কাণে যেতেই ও যেন ভয়ে লজ্জায় উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। টেবিলের ওপর টাকা রেখে বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে প'ড়ে বাড়ীর দিকে চল্‌ল।

বাইরে মাঠে, জলের বুকে জ্যোৎস্নার মায়া—রূপালী কুহেলির জালায়ন। ওর দেহের সুগোপনে রক্ত প্রবাহে জোয়ার জাগে, শিরায় শিরায় আগুন জ্ব'লে ও'ঠে।

এর ম:ধ্য বন্যার জল নেমে গেলে ওয়াঙের জীবনের মোড় ঘুরে যেত। রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশের প্রসন্ন দৃষ্টির নীচে সিক্ত বাষ্পায়িত মাটি গ্রীষ্মের রৌদ্রের স্পর্শে অল্পদিনের মধ্যেই চাষের উপযুক্ত হ'য়ে উঠত। চাষ করা, বীজ বোনার মরশুম পড়ে যেত। হয়ত তাহ'লে ওদিকটা আর ওয়াং মাড়াত না। কিংবা যদি কোন ছেলেপুলের অসুখ হত অথবা বৃদ্ধ হঠাৎ মরে যেত, তবে সেই ব্যস্ততায় পটে আঁকা সুন্দর মুখখানা আর বেণুযষ্টির মত লঘু তনু দেহখানার কথা ভুলে যেত।

কিন্তু কিছুই হ'লনা। ওয়াঙের হাতের কাজ মনের কাজ কিছুই জুটল না। চারিদিক শান্তি কেবল শান্তি,—সন্ধ্যার দিকে প্রশান্ত বায়ুমণ্ডল একটু দুলে ও'ঠে। জলের বুকে একটু হিল্লোল জাগে, তারপরেই আবার অচঞ্চল শান্তি, বৃদ্ধ বসে ঝিমোয়; বড় ছেলে দুটি সেই সকালে পাঠশালায় যায়, ফেরে সন্ধ্যায়। ওয়াং চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—ছটফট ক'রে কেবল এদিক ওদিক করে, তারপর ধপ ক'রে চেয়ারটায় বসে পড়ে। ওলান্ চা ঢেলে দেয়। চায়ে মুখ না দিয়ে তক্ষুনি আবার উঠে পড়ে, জ্বালান পাইপ অমনি পড়ে থাকে। ওলান্ স্বামীর দিকে চায়, কেমন একটা গভীর বেদনায় মেদুর হ'য়ে যায় ওর বোবা দৃষ্টি। ওয়াং সহ্য করতে পারে না।

ছটা মাস চলে গেছে। সেদিন দিনটা বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছিল ওয়াঙের, কিছু:তই যেন আর কাটছিল না। দিনের শেষে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল ওয়াং।

সন্ধ্যার বিলম্বমান আবছা আলো হ্রদের বুকের গুঞ্জিত নিশ্বাসে মুখর হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ ভিতরে গিয়ে নিঃশব্দে ওয়াং ওলানের তৈরী উজ্জ্বল কালো রংএর পোষাকী জামাটা পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। জলের ধার দিয়ে সরু মেঠো পথ বেয়ে চলে। পথের প্রান্তে সহরের অন্ধকার গেট পার হ'য়ে, কত পথ চ'লে ও রেস্তোঁরায় এসে পৌছল।

আলো জ্বালান হ'য়ে গেছে—উজ্জ্বল বড় বড় বিদেশী আলো সব। আলোকোদ্ভাসিত কক্ষটিতে কত লোক গান ক'রছে, গল্প ক'রছে। মাথার ওপর পাখা দুলছে—উজ্জ্বল স্বচ্ছ অকৃপণ, সঙ্গীতের মত সুমধুর হাসির লহর পথের প্রান্তে এসে ভেঙ্গে পড়ছে। ওয়াং তার চাষের কাজের মধ্যে এতদিন যত আনন্দ পেয়েছে—সব যেন এই ঘরখানার প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে। এখানে কাজ নেই, আনন্দ স্ফূর্তি। এখানে কেউ কাজ করতে আসে না,—আসে হাসি খেলার স্রোতে গা ঢেলে দিতে।

ওয়াং দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত: করে। ভিতরের অত্যুজ্জ্বল আলো খোলা দরজার পথে এসে ওকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। ওর রক্তে ঝড় বইছে, শিরাগুলি যেন ফেটে যাবে। তবুও ভীরু ওয়াং হয়ত ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে চলে আসত। কিন্তু আলোর প্রান্তে ছায়ায় অন্ধকারের মধ্য থেকে কে একটি রমণী বেরিয়ে এল। কোকিলা। এতক্ষণ দরজায় হেলান দিয়ে ও ঐখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। মানুষ দেখে সামনে এগিয়ে এল। ওর কাজই ঐ—এখানকার বারাঙ্গনা দলের জন্য শীকার ধরা। কিন্তু কাছে এসে ওয়াংকে দেখে নাক সিঁটকে উঠল: 'মর মুখপোড়া চাষার পো।'

কোকিলার স্বরের অবহেলার তীক্ষ্ণতা ওয়াঙের অন্তরে গিয়ে বেঁধে। রাগ হয় ভয়ানক, এবং হঠাৎ রাগ মনে সাহসও এনে দেয়। ও বলে ফেলল:

'কেন বাপু এত লোক আসে আর আমি কি অপরাধ করলাম?'

কোকিলা মুখ বাঁকা ক'রে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জবা'ব দেয়: 'তা এদের মত তোমার পয়সার মুরোদ থাকলে আসবে না কেন?' ওয়াং ওকে দেখাবে ও যে সে নয়। যা খুসি তা করার মত টাকার জোর ওর আছে। ট্যাঁকে হাত দিয়ে মুঠো ভরে রূপোর ডলার তুলে কোকিলাকে বলে: 'হ'লো? না এখনও হয়নি।'

কোকিলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে ওয়াঙের ডলার ভরা মুঠোটার দিকে

তাকিয়ে থাকে। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে : 'চলো, চলো। বলো দেখি কাকে চাই।' নিজের অজ্ঞাত সারেই ওয়াং বলে ফেলল : 'কি জানি—কিছু চাই না তো।' পরক্ষণেই কামনার সাগর উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। অনুচ্চার কণ্ঠে ওয়াং বলে : 'সেই যে ছোট্টটি—লম্বাটে মুখ, সরু থুত্‌নী, দুধে আলতায় রং আর কুইন্স ফুলের মত ছোট মুখ যার, হাতে একটা পদ্মের কুঁড়ি—তাকে।'

অবলীলায় মাথা হেলিয়ে ওয়াংকে আসতে ইঙ্গিত ক'রে টেবিলের ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে পথ ক'রে কোকিলা চলে। ওয়াং একটু দূরে দূরে থেকে অনুসরণ করে। প্রথমে মনে হয়েছিল সবাই বুঝি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সাহস ক'রে চোখ তুলে দেখল কেউ ওকে লক্ষ্যই করছে না। এক আধজন মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটছে—'রাত যেন দুপুর হয়ে গেছে, তাই উনি মেয়েমানুষের খোঁজে চলেছেন ছুটতে ছুটতে।' আর একজন বলে উঠল : 'তবু আর সইছে না, সাঁঝ না লাগতেই ছুটছেন মাগীর খোঁজে।'

ততক্ষণে ওরা সিঁড়িতে উঠছে। ওয়াঙের এই প্রথম সিঁড়ি-চড়া। একটু কষ্ট হচ্ছে। ওপরে উঠে দেখে মোটে মনেই হয় না যে মাটি থেকে ওপরে রয়েছে। যেতে জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে বুঝতে পারল যে অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। একটা অন্ধকার হলের মধ্য দিয়ে কোকিল ওকে নিয়ে চলল। এবং যেতে যেতে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল : 'কই গো সব, প্রথম নাগর এল, বৌনি কর'সে।'

চকিতে হলের চারদিকে কতগুলি দরজা খুলে যায়। খোলা দরজার ফাঁকে ফালি ফালি আলোর ঝলকে কতগুলি সুন্দর মুখ দেখা যায়—যেন বৃতির আড়াল ভেঙ্গে ফুল কলিরা প্রভাতী আলোয় ফুটে উঠল।

কোকিলা কঠিন কণ্ঠে ধমকে ওঠে : 'যা, যা, তোদের কে ডেকেছে লা পোড়ারমুখীরা। সুচাওএর লালমুখো সেই বেঁটে-বাঁদরী কমলির মানুষ লো, কমলির মানুষ।'

সমস্ত হলে একটা অস্পষ্ট বাঁকা হাসির জলতরঙ্গ খেলে গেল। আনারের মত টুকটুকে লাল রংএর একটি মেয়ে হেঁড়ে গলায় বলে উঠল : 'নিক্ বাবা কমলিই নিক্। যা চাষাড়ে চেহারা, আর যা রসুনের খোসবাই ছেড়েছে—ম্যাগো।'

ওয়াং শুনল কিন্তু জবাব দিল না, যদিও কথাগুলো ছুরির মত ওর মাংসের মধ্যে যেন কেটে বসল। হয়ত সত্যি চাষার চেহারা ওর ঘোচেনি। কিন্তু

ওয়াং বুক ফুলিয়ে চলল। টাকাই তো রয়েছে ট্যাঁকে ভয় কি! অবশেষে একটা ভেক্সান দরজায় কোকিলা এসে ঘা দিল। অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ফুল কাটা লাল রং এর গদি আঁটা বিছানায় বসে সেই পটের মেয়ে।

অমন ছোট ছোট হাতও মানুষের থাকে এ কথা ওয়াঙকে আগে কেউ বললে ও কিছুতেই বিশ্বাস করত না। অতটুকু হাত! অমন কচি সরু হাড়। অমন ক্রম-ক্ষীয়মান দীর্ঘ ছন্দ অংগুল—পদ্মরং-এর অমন সুন্দর রাঙ্গা নখ! আর অমন দু'খানি পা—একটা মানুষের মধ্যমা-প্রমাণ ছোট পা দুখান গোলাপী সাটিনের জুতো-জোড়ার মধ্যে ধরা দিয়েছে! বিছানার একধারে বসে ছেলে মানুষের মত পা দোলাচ্ছে মেয়েটি। ওর পা দুখানও ওয়াঙের কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু, পৃথিবীর মানুষের অমন পা থাকে একথা আগে ও কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারত না।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে কমলের দিকে তাকিয়ে ওয়াং বিছানার একধারে বসে রইল। নীচের হলে যে ছবিখান দেখেছিল তাই যেন মূর্ত হয়ে ওর সামনে এসেছে। ছবিটির সাথে ওয়াঙের পরিচয় এত অন্তরঙ্গ হ'য়েছিল যে মেয়েটিকে এমনি কোথাও দেখলেও অবলীলায় চিনে নিত। সেই ছবির মতই অমান সুকুমার পেলব চন্দ্রকলার মত দু'খানি হাত, তেমান দুগ্ধ-ফেন-শুভ্রতায় অপরূপ। বাঁকা কর-পল্লব-দু'খান পরস্পর সংলগ্ন হ'য়ে কোলের উপর পড়ে আছে! পরিচ্ছদের গোলাপী সাটীনের ওপর শুভ্র হাত দুখান—অপরূপ! অপরূপ! ওয়াং ভাবে এ হাত কি স্পর্শের যোগ্য?

পটখানিকে যে বিস্ময় নিয়ে দেখেছিল, বাস্তবের এই মানবীকেও সেই বিস্ময় নিয়েই দেখে ওয়াং। কাচুলী-আঁটা বেণু যষ্ঠির মত দেহ, সাদা ফারএর উঁচু কলারের ওপর জেগে রয়েছে ছোট মুখখানা প্রসাধনে সুন্দর—যেন পটে আঁকা। ওয়াং দেখে—এপ্রিকট ফলের মত সুগোল দুটি চোখ। এতদিনে ওয়াং বুঝতে পারল গল্প বুড়োরা যে সুন্দরীদের এপ্রিকট আঁখির কথা বলে সে কেমন। ওয়াঙের মনে হয় এ যেন মাটীর ধরণীর রক্তমাংসের মানুষ নয়, শুধু পটে-লেখা ছবি।

তরুণী ধীরে ধীরে তার বাঁকা চাঁদের মত হাতখানা তুলে ওয়াঙের কাঁধে রাখে, ধীরে ধীরে ওর অনাবৃত বাহু-দুটিতে স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। এই স্পর্শ খাল্লির মত এত লঘু, এত কোমল কোনও পার্থিব বস্তুর সাথে ওয়াঙের

পরিচয় ছিল না। হাতখানি চোখের সামনে না থাকলে ও হয়ত' বুঝতেই পারত না, গায়ের উপর কিছু নড়ে বেড়াচ্ছে। ওয়াং চোখ ভ'রে দেখে, হাতখানা ওর বাহুর উপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামে; যে পথে যায় আগুন ছড়িয়ে যায়—জামার আবরণ ভেদ ক'রে সে আগুন ওর বাহুর মাংসকে পর্যন্ত দহন করে। ওয়াং দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। হাতখানি ক্রমে ওর আস্তিনের শেষ প্রান্তে এসে, মুহূর্তের অভ্যস্ত দ্বিধায় অনাবৃত মণিবন্ধের কাছে এলিয়ে পড়ে যায়, এবং তারপর ওয়াঙের অগৌর শিথিল পুরুষ হাতের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ ক'রে দেয়। ওয়াং থর্ থর্ ক'রে কাঁপে; হাতখানাকে নিয়ে কি ক'রবে ভেবে পায় না।

হঠাৎ একটা তরল দ্রুত হাসির শব্দ ওর কানে এল, বাতাসের দোলায় প্যাগোডার রূপোর ঘণ্টাটি যেন বেজে উঠ্‌ল। টুকরো হাসির মতই একটা স্বরও কানে এল: 'নাক টিপলে এখনও দুধ বেরয় নাকি! বয়স বেড়েছে বাতাসে? সারারাত আমি তোমার সামনে এমনি ক'রে বসে থাকি আর তুমি বসে আমার রূপ গেল, ওতেই পেট ভরে!'

ওয়াং চমকে উঠে নিজের দুইহাতের মধ্যে হাতখানাকে চেপে ধরে—অতি সাবধানে—ভয় হয় পাছে কোমল হাতখানা ভেঙ্গে যায়। শুষ্ক পাতার মতই ভঙ্গুর হাতখানা। শুষ্ক, উত্তপ্ত। ওয়াঙের যেন চেতনা নেই। মিনতি ক'রে বলে আত্মহারার মত: 'আমি সত্যি কিছু জানি না, আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।'

তাই নেবে কমল, ওয়াংকে শিখিয়েই নেবে।

উনিশ

ওয়াঙের সমস্ত অস্তিত্ব একটা অসহ্য পীড়ায় পীড়িত হতে থাকে। ঝল্‌সান রোদে ও হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছে; মরুভূমির তুহিন-শীতল-হাওয়া ওর দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, দুর্ভিক্ষের দিনে অনাহার ও সয়েছে, ফলহীন শ্রমের নৈরাশ্য বুকে বয়ে দারুণ দেশের পথে পথে ঘুরেছে, কিন্তু এই এতটুকু হাতখানার যে যাতনা এ তো ওর অভিজ্ঞতায় ছিল না।

প্রতিদিন ওয়াং রেস্তরাঁয় যায়, যতক্ষণ না কমলের সময় হয় প্রতীক্ষা করে, তারপর কমলের ঘরে যায়—প্রতিদিন যায়। তবু প্রতিদিন ও সেই গ্রামের ওয়াং, সেই কিছু-না-জানা, দ্বারের কাছে এসে সেই কেঁপে-ওঠা, বিছানার এক প্রান্তে

তেমনি পাষাণ মূর্তির মত বসে থাকা, কমলের হাসির সঙ্কেতের জন্য সেই প্রতীক্ষা এবং আদিম ক্ষুধায় জর্জর হয়ে আজ্ঞাকারী ভৃত্যের মত এই নারীর ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে চলা—। কমল যেন ধীরে ধীরে একটি একটি ক'রে আপনার দল মেলে দেয়; তারপর আসে চরম মুহূর্ত—ফোটা ফুলের বৃন্তের বন্ধন ঘুচিয়ে মানুষের হাতে ধরা দেবার মুহূর্ত—। ওয়াঙের আলিঙ্গনে আপনাকে নিঃশেষ ক'রে দেবার জন্য কমল উন্মুখ হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু পারে না—ওয়াং কিছুতেই পারে না। পরিপূর্ণ ভাবে কমলকে পেয়েও যেন সবটা পায় না—কোথাও যেন ফাঁক থেকে যায়। কমল সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে ওয়াঙের হাতে ছেড়ে দেয়—তাও ওয়াং পারে না। ওয়াঙের ক্ষুধা মেটে না—একটা অতৃপ্ত কামনার তীব্র দাহ ওর দেহে চিত্তে বাসা বেঁধে থাকে। ওলান্ যখন ওর ঘরে এসেছিল তখন ওয়াঙের রক্তে ছিল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য। পশুর মত প্রচণ্ড দৈহিক ক্ষুধায় ও ওলান্‌কে কামনা করত। ক্ষুধা মিটে গেলে ওকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে গিয়ে ভরা মনে কাজ করত। কিন্তু এই মেয়েটিকে ভালবেসে কোথায় সেই তৃপ্তি, কোথায় সেই স্বাস্থ্য! রাতে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কমলের সেই কোমল ছোট হাত ছুখানিতে কোথা থেকে যেন হঠাৎ শক্তি আসে, শক্ত হ'য়ে ওর কাধের ওপর চেপে বসে ওকে বাইরের পথ দেখিয়ে দেয়। ওয়াং তাড়াতাড়ি ওর জামার মধ্যে টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসে। যে ক্ষুধা বয়ে এসেছিল সে ক্ষুধা বয়েই ফিরে যায়। ওয়াং রোজ যায়, অবাধ স্বাধীনতায় কমলকে হাতে পায়, কিন্তু অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসে। এমনিই রোজ ঘটে। এ যেন পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে আঁজলা ভরে সাগরের নোনা জল খাওয়া। সাগরের জল জল হ'লেও তৃষ্ণা মেটেনা, বেড়ে যায়। রক্ত পর্যন্ত যেন শুকিয়ে যায়—পিপাসা কেবলি বাড়ে, অবশেষে ঐ নোনা জলই প্রাণঘাতী হয়।

সারাটা গ্রীষ্ম এমনি ক'রেই কাটল। ওয়াং এই মেয়েটির সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না। যখন কমলের কাছে থাকে ও বড় একটা কথা কয় না। কমলের মুখে হাসি কথার অনর্গল স্রোত বয়ে যায়, ওয়াঙের কাণে যেন কিছুই যায় না। ও কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কমলের মুখ, ওর হাত, ওর দেহের অজস্র ভঙ্গিমা, ওর আয়ত চোখছুটির মাধুরীর অর্থ খোঁজে। দেখে, আর প্রতীক্ষা করে। কমলকে পেয়েও ওর যেন আর পাওয়ার শেষ হয় না—পাওয়ার পেয়ালা কিছুতেই ভরে ওঠে না। অতৃপ্ত দেহ মনের বোঝা বয়ে মুহ্যমানের মত রাতের শেষে বাড়ী ফেরে।

দিনগুলি যেন আর ফুরাতে চায় না। নিজের বিছানায় ওয়াং আর কিছুতে শুতে পারে না। গরমের ভান ক'রে বাইরে বাঁশঝাড়ের তলায় মাদুর বিছিয়ে বিকারগ্রস্তের মত খানিকটা ঘুমায়। তারপর ঘুম ভেঙ্গে যায়, শুয়ে শুয়ে বাঁশ-পাতার তীক্ষ্ণাগ্র-ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। কি যে তীব্র বেদনার সুখে ওর অন্তর বিধুর হয়ে ওঠে ওয়াং প্রকাশ ক'রতে পারে না।

কেউ কথা বলতে এলেই ওয়াং রেগে ওঠে—সে স্ত্রী হোক, ছেলেরাই হোক্। চিং এসে বলে: 'ভাই, জল তো শুকিয়ে এল, এবার চাষের ব্যবস্থা করতে হয়।'

ও যেন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার ক'রে ওঠে: 'যাও, যাও, আমায় জ্বালিও না।

ওয়াং আর পারে না। অহোরাত্র এ কি দাহ! বুকটা যেন ফেটে যায়, ভেঙ্গে চুর্ চুর্ হ'য়ে যায়। কেন, কেন কমল ওর ক্ষুধা মেটাতে পারে না!

দিনের পর দিন চলে যায়। দিন গিয়ে সন্ধ্যা আসবে, এই আশায়ই যেন ওয়াং সারাটা দিন কোনো মতে বেঁচে থাকে। ওলান্এর, ছেলেদের মুখ গম্ভীর; ওয়াং কারো দিক চায় না। ওকে দেখলেই ছেলেদের খেলা থেমে যায়। বুড়ো বাপ মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে: 'কি হলো রে তোর? মেজাজটা অত খিটখিটে হয়েছে কেন? চেহারাটাই বা তোর অমন পাংশুটে হচ্ছে কেন রে?' ওয়াং কোনো জবাব দেয় না, ফিরেও চায় না।

দিন যায়, রাত হয়। ওয়াং কমলের হাতে গিয়ে পড়ে। একদিন কমল ওর বেণীটি দেখে হেসে বলল: 'আমাদের এদিককার লোক অমন বানরের ল্যাজ মাথায় রাখে না।'

প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরে, অনেক যত্নে ওই বেণীটির প্রসাধন করেছে ওয়াং; বহু বিদ্রূপ, বহু সমালোচনায়ও বেণীতে কিছুতেই হাত দেয় নি। সেদিন নির্বিবাদে গিয়ে অত সাধের বেণীটিকে বিসর্জন দিয়ে এল। ওলান্ দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠল: 'সর্বনাশ, করলে কি? ও যে ভারী অমঙ্গল।'

ওয়াং গর্জন করে ওঠে: 'তুমি কি জান? সহরে সবাই ছোট ক'রে চুল ছাঁটে। আমি তোমাদের জন্য সারাজীবন গেঁয়ো ভূত হয়ে থাকব নাকি?' কিন্তু বেণীটি কাটার জন্য কেমন যেন একটা ভয়ও থেকে যায়। আবার এদিকে কমল বলেছে—অন্যথা চলে না। কমলের হুকুমে,—হুকুমে কেন, সামান্য একটু

ইচ্ছার ইঙ্গিতে প্রাণ দেওয়াও ওয়াঙের পক্ষে এমন বেশী ছিছু নয়। কারণ, সুন্দরী কমল ওর কালনা-সায়র, তাতে ও ডুব দিয়েছে।

সাধারণতঃ ওয়াং বড় একটা নায়না। খেটেছে, দর্‌দর্‌ ধারে ঘাম ঝরেছে এবং তাতেই ওর পিঙ্গলবর্ণ সুগঠিত দেহটা ধৌত স্নাত হয়েছে। জলের আর প্রয়োজন হয় নি। এখন রোজ স্নান করে, দেহটা নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে দেখে আর সকলের মত হল কিনা। ওলান্ চিন্তিত হ'য়ে ওঠে। একদিন বলে ফেলে: 'রোজ রোজ এমন ক'রে নাইলে মরবে যে গো।'

তারপর দোকান থেকে লাল রংএর কি একটা বিদেশী পদার্থ, সাবান না কি বলে, ওয়াং একদিন তাই কিনে এনে গায়ে বেশ ক'রে ঘ'সে ঘ'সে স্নান করে। কিছুতেই রসুন ছোয়ওনা, পাছে কমলের নাকে গন্ধ যায়। অথচ দু'দিন আগেও রসুন কি ভালোই না বাসত।

ব্যাপার কি কেউ বুঝতে পারে না।

এতদিন ওলান্‌এর হাতের তৈরী, ঢোলা ঢালা—মজবুৎ করার জন্য যেখানে সেখানে সেলাই করা জামাই ওয়াং সন্তুষ্ট চিত্তে প'রে এসেছে। এখন ও সেলাই, কাট-ছাট আর পছন্দ হয় না। পোষাকের জন্য ধূসর রংএর সিল্ক আর কালো সাটীন আসে। সহরের দরজীরা কেমন গাঁয়ের ঠিক মাপে মাপে সুন্দর জামা তৈরী করে, একটুও ঢিলে হয় না। সহুরে কায়দায় সহুরে দরজী দিয়ে ওয়াং তার পোষাক ক'রে দিল—সিল্কটা দিয়ে আচ্‌কান, আর কালো সাটীন দিয়ে আস্তিন-হীন একটা কোট, আচকানের ওপরে পরার জন্য। বুড়ো জমিদারের মত কালো ভেলভেটের একজোড়া জুতোও কিনে নিল। হাঁটলে গোড়ালীর দিকটায় বেশ শব্দ হয়।

কিন্তু ওলান্ আর ছেলেপুলের সামনে এসব কাপড় ওর পরতে লজ্জা করে। ব্রাউন কাগজে মুড়ে ও রেস্তরাতেই একজন কর্মচারীর কাছে রেখে আসে। কর্মচারীটির সঙ্গে ওর একটু ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে। সে ওয়াংকে কাপড় ছাড়ার জন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। অবশ্যি ওয়াঙের কিছু দিতে হয় লোকটাকে এজন্য। এছাড়া সোনার গিলটী করা একটা রূপোর আংটিও কিনে পরল। আস্ত একটা ডলার দিয়ে একশিশি সুগন্ধী বিদেশী মাথার তেলও কিনে নিল।

ওলান্ অবাক্ হ'য়ে ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছু যেন বুঝতে পারে না। একদিন দুপুর বেলা খাবার সময় ওলান্ অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে

থেকে বলল : 'তোমায় দেখে জমিদার বাড়ীর সোমত্ত বয়সের বাবুদের কথা মনে পড়ছে আমার।'

ওয়াং হো হো ক'রে হেসে জবাব দিল : 'ঠাকুরের কৃপায় একটু কপাল ফিরেছে। তুমি কি বল, এখনও সেই চাষাই থাকি।'

মনে মনে খুব খুশী হয় ওয়াং, এবং বহুদিন পরে ওলান্‌এর ওপর আজ একটু সদয় হ'য়ে ওঠে।

ওয়াঙের হাতের ফাঁক দিয়ে জলের মত অর্থ বেরিয়ে যেতে লাগল—সাধু-শ্রম দিয়ে যে অর্থ অর্জন করেছিল সেই অর্থ। ঘণ্টা হিসেবে কমলের ভাড়া রয়েছে, তা ছাড়া ওর অজস্র আব্দার রয়েছে। কি সুন্দর ক'রে মিষ্টি ক'রে আব্দার করে কমল! এমনভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, মনে হয়, ওর ইচ্ছা পূরণ না হ'লে ওর বুক বুঝি ভেঙ্গে যাবে।

ওয়াং আগে কমলের সামনে কথা কইতে পারত না। এখন শিখেছে। কমল যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হা-হুতাশ করে, ওয়াং ওর কাণে কাণে বলে : 'কি হয়েছে মণি?'

কমল বলে : 'যাও যাও সরে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। ঐ ওঘরের কেষ্টমণির মানুষ, কেমন ওকে সোনার চুলের কাঁটা দিয়েছে! আমার পোড়া কপালে সেই আদ্দিকালের রূপোরটাই। এটার ক্ষয়ও নেই, লয়ও নেই।'

ওয়াঙের মন বড় খারাপ হয়ে যায়। কমলের কাণের পাশ থেকে ঘন কালো মোলায়েম কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছটি সরিয়ে দেয়—ওর কাণ দুটি দেখতে ওয়াঙের বড় ভালো লাগে। কাণে কাণে বলে : 'ও: এই কথা। সোনার কাঁটা? তার জন্য ভাবনা কি মণি? আজই নিয়ে আসছি দেখ।'

ছোট শিশুকে যেমন ক'রে মানুষ প্রথম ভাষা শেখায়, তেমনি করেই কমল ওয়াংকে প্রেমের ভাষা শিখিয়েছে—ওয়াং ওর কাণে কাণে কইবে। ওয়াং বলতে যায়—মুখে বেধে যায়। এতটা কাল চাষী ওয়াং হাল-বলদ রোদ-জল আর মাটি-ফসলের কথাই বলে এসেছে। নূতন শেখা নূতন ভাষা তেমন ক'রে এখনও মুখে আসে না। তবু বলে—কিন্তু সবটা বলা হয় না।

প্রাচীরের গায়ে গর্ত ক'রে টাকা রেখেছিল—গর্ত শূন্য হ'ল; বস্তায় ভরে মেজের নীচে রেখেছিল—বস্তা শূন্য হ'ল। আগের দিন হ'লে ওলান্ বিনা দ্বিধায় ধম্‌কে উঠ্‌ত : 'ও টাকা নিচ্ছ কেন?' এখন কিছু বলে না। ক্লিষ্ট পীড়িত হৃদয়ে নীরবে কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—বোঝে, ওয়াঙের জীবনের

স্রোত মোড় ঘুরেছে—এবং বহু দূরে পড়ে রয়েছে ওলান্—বহুদূরে রইল ওর মাটি। কিন্তু ঠিক বোঝেনা স্রোতের গতি কোথায় গিয়ে পড়েছে। ওয়ান্ আজকাল স্বামীকে ভয় করে—যেদিন থেকে ওর কুরূপতা তার চোখে ধরা প'ড়েছে সেদিন থেকে বড় ভয় করে। কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস হয় না। সারাক্ষণই ওয়াং যেন ওর ওপর রেগে থাকে।

সেদিন ওলান্ পুকুরঘাটে কাপড় কাচ্ছিল। ওয়াং মেঠোপথ ধরে ঘরে ফিরছিল। ওলান্‌কে দেখে কাছে এসে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে রুক্ষভাবে বলল: 'মুক্তোদুটো কোথায়?' ওর মনে মনে ভয়ানক লজ্জা হচ্ছিল এবং সেই লজ্জা ঢাকার প্রয়াসেই স্বর অত কঠিন হ'য়ে উঠল।

ওলান্ কাপড় কাচা থামিয়ে ভীরু দৃষ্টি তুলে একবার তাকিয়ে উত্তর দিল: 'আছে। কেন?'

ওয়াং ওলান্‌এর দিকে তাকাতে পারে না। ওর শিরা-সংকুল ভেজা হাতের দিকে চোখ রেখে বলে: মিছেমিছি অমনি ও দুটো ফেলে রেখে লাভ কি হচ্ছে?' অতি ধীরে ওলান্ বলে: 'ভেবেছিলাম এক জোড়া দুল করব।' ওয়াং পাছে হাসে সেই ভয়ে তক্ষুণি আবার বলে: 'ছোট খুকীকে বিয়ের সময় দেব ভেবেছিলাম।'

ওয়াং কঠিন হয়ে ওঠে। কঠিন কণ্ঠে বলে: 'ওঃ, যা না মেটে রংএর ছিরি! তায় মুক্তোর দুল! রূপ খুলবে! মুক্তো ঐ চেহারায় পরে না। মুক্তো পরবে যাদের চেহারা আছে তারা।'

বলে কয়েকমিনিট চুপ ক'রে থেকে চীৎকার করে ওঠে: 'দাও শিগ্‌গির বের ক'রে দাও, আমার দরকার আছে।'

অতি ধীরে ভেজা কুরূপ হাতখানা দিয়ে জামার ভেতর থেকে ছোট একটা পুটলী বের ক'রে ওয়াঙের হাতে তুলে দিল ওলান্।

ওয়াং পুট্‌লীটা খোলে—ওলান্ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওয়াঙের হাতের মধ্যে মুক্তোদুটো সূর্যের আলো নিবিড়ভাবে অঙ্গে জড়িয়ে নেয়। ওয়াং হেসে ওঠে।

ওলান্ আবার কাপড় কাচা আরম্ভ করে। অশ্রুর ধারা ধীরে ধীরে ওর গাল বেয়ে ঝ'রে পড়ে। ওলান্ মোছেনা—পাথরের ওপরে ছড়ান ভেজা কাপড়গুলো কাঠের মুগুর দিয়ে আরো স্থির ভঙ্গিতে পিটিয়ে চলে।

বিশ

ওয়াং যে পথে চলেছিল—দেউলে না হওয়া পর্যন্ত হয়ত' থামত না। কিন্তু বাধা পড়ল। বলা নেই, কওয়া নেই, এতদিন কোথায় ছিল, কোত্থেকে এল, কোনো খবর নেই—হঠাৎ ওর কাকা এসে উপস্থিত। সেই আগের মতই শতছিন্ন বোতামহীন জামা-কাপড় কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল—যেন আকাশ থেকে টপকে পড়ল। চেহারায় তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, কেবল খানিকটা রোদ, জল আর বয়সের ছাপ পড়েছে। সবাই প্রাতরাশ খেতে বসেছিল। লোকটি এসে সকলের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের ক'রে এক গাল হাসল। ওয়াং বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। ও ভুলেই গিয়েছিল যে ওর কাকা বেঁচে আছে। ওর মনে হ'ল এ কাকা নয়, কাকার প্রেত—প্রেতপুরী থেকে ফিরে এসেছে। ওয়াঙের বাবা চোখ কচ্‌লে মিটমিট ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়েও চিনতে পারল না। কাকা নিজ থেকেই সবাইকে ডেকে বল্‌ল : 'কিগো দাদা, ওয়াং, বৌমা, নাতিনাতনীরা সব কেমন আছো?'

ওয়াং এবারে উঠল—ওর মনটা একেবারে মুষড়ে গেছে। তবুও মুখে হাসি টেনে, স্বর মোলায়েম করে বলল : 'তুমি খেয়েছ কাকা?'

'না, তোমার সঙ্গেই খাবখ'ন।' বলে বাটি, কাঠি আর খাবার টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল এবং কারো অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই ভাত, নোনামাছ, গাজরের আচার যা কিছু ছিল টেনে টুনে নিয়ে গো-গ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল যেন বহুকালের উপোসী। তিন বাটি ভাতের মণ্ড খেল, মাছের কাঁটা কড়মড় ক'রে চিবুল, বীন্ খেল একরাশ। সব চুপচাপ। কেউ একটাও কথা বলেনি এতক্ষণ। খাওয়া শেষ ক'রে দাবীর সুরে কাকা বলল : 'তিন তিনটে রাত্তির ঘুমাইনি। এখন একটু ঘুমুব।'

হতবুদ্ধি ওয়াং লাং কি যে ক'রবে ঠিক না পেয়ে কাকাকে বাবার বিছানায়ই নিয়ে গেল। লোকটা লেপ তুলে দেখল ধবধবে চাদর, মরণ পুরু তোষকের বিছানা। চারিদিকে নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে দেখল—চমৎকার খাটখানা, নতুন একটা টেবিল পাশে, মস্ত একটা সুন্দর কাঠের চেয়ার তার সামনে। এই সেদিন ওয়াং ওটা বাবার জন্ত কিনে এনেছে। সব দেখে শুনে

বলে : 'তা শুনেছিলাম বটে, তোর অবস্থা ফিরেছে—কিন্তু এত বড়লোক হয়েছিস ভাবিনি।'

তারপর ভয়ানক গরম সত্ত্বেও লেপ টেনে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল—যেন সব কিছু তারই এবং মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ওয়াং বিহ্বলের মত মাঝের ঘরে ফিরে আসে। ও বেশ বুঝতে পেরেছে কাকা এবার সহজে নড়ছে না, কারণ এবার তো আর দারিদ্র্যের অজুহাত চলবে না। খুড়ী আর তার পুত্রটিও তাহ'লে এল বলে। খুড়ীর কথা মনে আনতেও ওয়াঙের ভয় করে।

মিছে ভয় করেনি। কারণ সারাটা দিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ কাকা উঠল। সশব্দে তিনটে হাই তুলে কাপড় সামলাতে সামলাতে বাইরে এসে বসল : 'যাই ওদের সব নিয়ে আসিগে। তিনটে মাত্র মানুষ আমরা। তোর এত বড় বাড়ী আর এত লোকজনের মধ্যে আমরা যে আছি টেরই পাবিনা।'

ওয়াং আর কি করবে? কেবল একটা নিষ্ফল ক্রুদ্ধ দৃষ্টি লোকটার দিকে ছুঁড়ে মারে। স্বচ্ছল সংসার, তায় একেবারে আপন কাকা। তাড়ানো তো এমনিতেই চলে না। তারপর গাঁয়ে ওয়াঙের বেশ সম্মান—অমন একটা কাজ ক'রে বসলে কি আর মাথা তোলার জো থাকবে? কাজেই মুখ বুজে থাকতে হয়। কিষাণদের পুরাণো বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে, সদর দরজার পাশের ঘর দুটো খালি ক'রে দিল। সন্ধ্যে বেলা কাকা তার বৌ ছেলে নিয়ে এসে ঐখানে বাসা বাঁধল।

ওয়াং ভেতরে ভেতরে জ্বলে মরে। বেশী রাগ হয় একজন্য, যে সব কিছু নিঃশব্দে হজম ক'রে এদের সাথে হেসে কথা কইতে হয়, মিষ্টি কথায় আপ্যায়নও ক'রতে হয়। খুড়ীর চ্যাপ্টা, তেল চুকচুকে মস্ত বড় মুখটার দিকে চাইলেই ওর রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটতে থাকে। আর কাকার ধুরন্ধর ছেলেটার গুণ্ডা মার্কা চেহারাটা দেখলে গোটাকয়েক চড় কষিয়ে দেবার জন্য ওর হাত নিস্‌পিস্ করে। রাগে তিনদিন ও সহরেই গেল না।

তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে এল। ওলান্‌ও এসে বোঝায় : 'রাগ ক'রে লাভ কি বল! সইতে তো হবেই। না সয়ে আর উপায় কি?' ওয়াংও ভেবে দেখল যে এবার নিজেদের স্বার্থেই কাকা এবং তস্য পরিবার একটু সামলে চলবে। সুতরাং তেমন ভয়ের কিছু নেই।

ওয়াং একটু আশ্বস্ত হয় এবং আবার কমলের জন্য প্রবলভাবে উচাটন হয়ে ওঠে ওর মন। নিজের মনে মনে যুক্তি দেখায় ওয়াং : 'বাড়ীতে যত সব বুনো কুকুরের মেলা। মানুষের একটা দম ফেলার জায়গা চাইতো।'

আগের মতই তীব্র কামনার আগুন—অতৃপ্ত কামনায় জর্জরিত হওয়া।

ওলান্‌এর সরলতা, তার শ্বশুরের বার্ধক্য আর চিংএর বন্ধু প্রীতি যা দেখতে পায় নি, মুহূর্তেই ওয়াঙের খুড়ীর চোখে তা ধরা প'ড়ে গেল। বাঁকা চোখে বাঁকা হাসি মেখে সেদিন সে বলেই ফেলল : 'বাপধন যে আবার অন্য ফুলের মধু খেতে সুরু করেছে।'

ওলান্ বোঝেনা, নম্র দৃষ্টি তুলে খুড়ীর দিকে তাকায়। খুড়ী হেসে আবার বলে : 'আচ্ছা মেয়ে তো! তরমুজটা কেটে একেবারে দু'ফাঁক ক'রে তবে তোকে দানা দেখাতে হবে? তা'হলে একেবারে সাদা কথায়ই শোন্, তোর কর্তাটি আর এক মাগী নিয়ে মেতেছে—বুঝেছিস্?

ভোর হয়েছে সবে—ওয়াং ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ঘরে শুয়েছিল। একটু তন্দ্রাও এসেছিল। খুড়ীর কণ্ঠে ওরং তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। উঠানে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। ওয়াং শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পেল। অবাক হ'য়ে গেল—কি তীক্ষ্ণ চোখ ঐ স্ত্রীলোকটির! আরো কাণ পেতে শুনতে লাগল ওয়াং। যেন হাঁড়ি থেকে তেল ঢালা হ'চ্ছে এমনিভাবে মোটা গলা থেকে মোটা স্বরের কথাগুলি অনর্গল বেরিয়ে আস্‌তে লাগল : 'অনেক দেখেছি লো, অনেক দেখেছি। দেখতে দেখতে বুড়ো হ'লাম। ব্যাটাছেলের অমন টেরী বাগানো অমন ফুলবাবুটি হ'য়ে সাজা! পেছনে মেয়ে মানুষ না থেকে যায়!'

বুকভাঙ্গা একটা চাপা আর্তনাদ ওলান্‌এর মুখ থেকে বেড়িয়ে আসে। ওয়াং বুঝতে পারলনা কথাগুলো। কিন্তু শুনতে পেল খুড়ী আবার বলছে : 'মরদগুলোর কি খালি মাগ নিয়ে সাধ মেটে লো! বোকা মেয়ে! তারপর সংসারে খেটে খেটে যে মাগের গতর প'ড়ে গেছে—তার দিকে তো ওরা ফিরেও দেখে না। আনচান্ ক'রে এদিক ওদিক যায় – মেয়ে মানুষ জুটিয়ে নেয়। আবাগী তোর কি রূপ আছে যে মরদকে ঘরে বেঁধে রাখবি? তুই তো ওর হালের বলদ, ওর গেরস্তালীর হাল ঠেলবি খালি। তা এখন বাছার হাতে যা হোক দু'পয়সা আসছে, যোয়ান মরদ—ও যদি আর একটাকে ঘরে আনেই তার জন্য তুই হেদিয়ে মরবি কেন? ও সব মিন্‌সেরাই করে। আমার

মিন্‌সেই কি কম যায়! শুধু ট্যাকটি ফাঁকা, নইলে—হুঃ, পিণ্ডিই জোটে না আবার মেয়ে মানুষ।'

আরো অনেক কিছু বলল খুড়ী, কিন্তু ওয়াঙের কাণে আর কিছু গেল না। ওর মনের গতি যেন হঠাৎ থেমে গেছে। হঠাৎ যেন ওর সামনে একটা পথ খুলে গেল। কমলের জন্য এই যে অসহ্য যাতনা, এই অতৃপ্ত ক্ষুধা, এই যে রক্তশোষী পিপাসা—ও অহর্নিশ বহন ক'রে বেড়াচ্ছে এ মেটাবার সহজ পথ তো ওর সামনেই রয়েছে! টাকা ফেলে দিয়ে কমলকে বাড়ী নিয়ে আসবে একেবারে—একেবারে নিজস্ব ক'রে। অন্য পুরুষ আর ভাগীদার হতে আসবে না! ও আপন ইচ্ছামত ওকে খাওয়াবে, পরাবে, যত্ন করবে। তবে তো ওর মন ভরবে! উঠে পড়ে বাইরে গিয়ে খুড়ীকে ইসাড়ায় ডাকল। খুড়ী এলে তাকে সঙ্গে ক'রে চুপি চুপি একেবারে বাড়ীর বাইরে খেজুর গাছটার তলায় এল যেখানে বেশ নিরিবিলিতে কথা কওয়া চলে।

ওয়াং বলল: 'উঠোনে দাঁড়িয়ে কি বলছিলে সব শুনেছি। ঠিক কথাই বলেছ। আচ্ছা তুমিই বলো, ওকে নিয়ে চলে কখনও? আর মাটির দৌলতে আমার তো আর পয়সার অভাব নেই—আমি এমনি থাকবই বা কেন বলতো?

ব্যস্ত ভাবে ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে খুড়ী বলে: 'সত্যি তো বাছা। যাদের গাঁটে পয়সা আছে সবাই করে অমন। গরীবের উপায় নেই, চিরকাল এক ঘটিতেই জল খেতে হয়।' এর পর যে ওয়াং কি বলবে স্ত্রীলোকটি বেশ ভালো করেই জানে। ওয়াং বলল: 'কিন্তু আমার হ'য়ে কেই বা গিয়ে একটু চেষ্টা ফিকির করে। একটা পুরুষ মানুষ তো কিছু আর হুট্‌ ক'রে একজন মেয়ে মানুষকে বলে বসতে পারে না—ওগো চলো আমার বাড়ী।' ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খুড়ী জবাব দেয়: 'ভেবোনা বাছা। আমার হাতে ছেড়ে দাও সব। কেবল বাতলে দাও কোনটি। বাস?'

ভীরু দ্বিধায় কমলের নামটি উচ্চারণ করল ওয়াং—সহজ ভাবে পারল না। কারণ আজ পর্যন্ত ও নাম ও কারো সামনে উচ্চারণ করেনি। ওর মনে হয় কমল বিশ্বেবিশ্রুতা—নাম ছাড়া অন্য পরিচয় ওর ক্ষেত্রে বাহুল্য। ও ভুলে গেছে যে একটা মাস আগে, কমল বলে একটী প্রাণী যে সংসারে আছে তা ও নিজেই জানত না। সুতরাং খুড়ী যখন জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি থাকে কোথায়—ও ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। একটু উষ্ণ ভাবেই জবাব দিল:

'কোথায় আবার! বড় রাস্তার ধারের রেস্তরাঁয়।'

'ওঃ পুষ্প-কাননে? তাই বল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তো—আবার কোথায়?'

খানিক চিন্তা ক'রে, নীচের ঠোঁটটি বাকিয়ে খুড়ী বলে: 'ওখানে কাউকে তো চিনি না। খোঁজ করতে হবে। আচ্ছা মেয়েটার মালিক কে?'

ওয়াং কোকিলার পরিচয় দেয়। কাকী হেসে বলে: 'তাই বলোনা কেন? জমিদার বুড়ো ও মাগীর বিছানায় শুয়েই তো পটল তুলল। তার পর থেকে এই করছে বুঝি? এ ছাড়া আর করবেই বা কি?'

বলে আবার হিঃ হিঃ ক'রে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল। তারপর বেশ সহজ হ'য়ে বলে: 'ও—কোকিলা! তাহলে তো ভাবনাই নেই। কাজ হয়েই গেছে মনে কর। কোকিলাকে যা বলব সব করবে। টাকা পেলে ও মাগী পাহাড়ও তুলে আনতে পারে।'

ওয়াঙের গলা যেন শুকিয়ে আসে। স্বর বেরুতে চায় না। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে: 'টাকা! যত চাও দেব। জমা জমি সব কবুল।'

কমলের জন্য ওয়াঙের যে আবেগ তা এখন একটা চিত্র রূপ নিল ও বিচিত্র ধারায় বইতে লাগল। সব ব্যবস্থা শেষ হবার আগে ও আর রেস্তরাঁতে গেল না। মনে মনে বলল যদি কমল এখানে আসতে রাজী না হয় তবে ও আর কোনোদিন ওমুখো হবে না। কিন্তু এই 'যদি'-টি মনে আসতেই ভয়ে ও যেন কাঠ হয়ে যায়। বার বার কাকীর কাছে দৌড়ে যায় আর বলে: 'বুঝেছ খুড়ী, টাকার জন্য না আটকায় দেখো। কোকিলাকে ব'লো যেয়ে—যত চাই দেব। আর এও তাকে ব'লো যে আমার এখানে তাকে কুটোটি নাড়তে হবে না। সিল্কে মুড়ে রেখে দেব, আর হাঙরের পাখ্না* খাওয়াব।'

শুনতে শুনতে একদিন কাকীর আর ধৈর্য থাকে না। চোখ ঘুরিয়ে চীৎকার জুড়ে দেয়: 'হয়েছে বাপু, খুব বেহায়াপনা হয়েছে। আমি কি কচি খুকী? না আমার এই হাতে খড়ি? শেখাতে এসো না বলছি। বহুদিন বলেছি—যা করার আমি করব। কথা কয়োনা একটি।'

* ছোট জাতীয় এক রকম হাঙরের পাখ্না—চীনাদের উপাদেয় খাদ্য।—অনুবাদিকা।

কমলের থাকার ব্যবস্থা করা আর বসে বসে আঙুল কামড়ান ছাড়া আর কোন কাজ রইল না এখন ওয়াঙের হাতে। ঝাড়া ধোয়া পোছা লেগে যায়। ওয়াং ওলানকে তাড়া দিয়ে দিয়ে নানা কাজ করায়। আসব্যাব পত্র এদিকে থেকে ওদিকে যায়—একটা হুলুস্থুল পড়ে যায়। ওয়াং কিছু বলেনি, কিন্তু ওলান্‌এর বুঝতে বাকী থাকে না। বেচারা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ওলান্‌এর সঙ্গে আর ওয়াং কিছুতে এক শয্যায় শুতে পারে না। মনে মনে হিসেব করে: বাড়ীতে এখন দু'জন মেয়ে মানুষ—সুতরাং আরো ঘর চাই। একেবারে একটা আলাদা মহলই ভালো: তাহলে আর কোনো হাঙ্গামা থাকে না—ও একেবারে সারা সংসার থেকে সরে যেয়ে একান্তে প্রেম-সাগরে ডুব দিতে পারবে। এই ভেবে একেবারে মজুর ডাকিয়ে মাঝের ঘরের পেছন দিকটায় আর একটা মহল তৈরীর কাজে লাগিয়ে দিল। একটা বড় ঘর হবে, তার দু'দিকে দু'টো ছোট—এই তিনটে ঘর। মজুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করারও সাহস হয় না। ওয়াংও কিছু বলে না। কাজের তদারক ও নিজেই করে। কাজেই চিংএর সঙ্গেও এ বিষয়ে কোনো সম্বন্ধ নেই।

সব কটা ঘরের মেজেই পাকা হল। দরজায় লাল পরদা ঝুলল। একটা নূতন টেবিল আর দুটো কারুকার্য্য করা চেয়ার এল। চেয়ার দুটো টেবিলের দুদিকে সাজিয়ে রাখা হল। পাহাড় ও নদীর দৃশ্য আঁকা দু'খানা ছবিও টেবিলের ওপর দিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল।

তারপর ঢাকনা দেওয়া একটা গালার ডিস কিনে আনল ওয়াং। তাঁতে নানা রকম সুস্বাদু খাবার ভরে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল। পুরু গদীওয়ালা বেশ বড় একটা কারুকার্য করা খাট কিনল। ছোট ঘরটার পক্ষে খাটটা একটু বড়ই হল। ফুলকাটা পরদা কিনল খাটের চারিদিকে ঝোলাবার জন্য। ওলানকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে ওর বড় লজ্জা করে। অথচ নিজে পুরুষ মানুষ, সব জানেও না, বোঝেও না। রোজ সন্ধ্যেবেলা খুড়ী আসে, পরদা-টরদা টাঙ্গিয়ে অন্যান্য কাজ কর্মও ক'রে দিয়ে যায়।

এদিকের সব কাজই শেষ হয়ে গেল। আর কিছু বাকী নেই। অথচ পনেরটা দিন চলে গেল। ওদিকের কোনো ব্যবস্থাই হল না। ওয়াং নূতন মহলের আঙ্গিনায় একা একা ঘুরে বেড়ায়। ওর মনে হয়, উঠানটার মাঝখানে একটা পুকুর মত করলে যেন বেশ ভালো দেখায়। মজুর ডেকে দু'হাত লম্বা

দু'হাত চওড়া একটা চৌবাচ্চা করিয়ে পাকা করে বাঁধিয়ে নিল। তারপর সহরে গিয়ে পাঁচটা সোণালী মাছ কিনে এনে চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিল। বাস্—এক হ'য়ে গেল। তারপর আর কোনো কাজের কথা মনে আসে না। এখন কেবল অধীর হ'য়ে প্রতীক্ষা করে।

এ কয়দিন কারো সঙ্গেই ওয়াং কোনো কথা বলেনি। কেবল মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের নোংরা থাকার জন্য গাল দিয়েছে—আর ওলান্ কেন চুলে তেল দেয় না সে কথা নিয়ে ওর সাথে চ্যাচামেচি করেছে। অবশেষে একদিন ওলান্ কেঁদে ফেলল,—ভয়ানক কাঁদল। এর আগে ওয়াং কখনও ওকে কাঁদতে দেখি নি! সেবার যখন দিনের পর দিন অনাহারে কেটেছে ওলান্এর—তখনো না। কিন্তু ওয়াং আরো কঠিন হয়ে ওঠে: 'ও সব আমি মোটে পছন্দ করি না। চুল তো না, ঘোড়ার ল্যাজ, তাতে আবার চিরুণী ছোঁয়াবার ফুরসুৎ হয় না। বললেই যত হাঙ্গাম!'

ওলান্ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বার বার বলতে থাকে: 'তোমার সন্তান যে পেটে ধরেছি। তোমার সন্তান…'

ওয়াঙের বাক্য রোধ হয়ে যায়। কি রকম অস্বস্তি বোধ হয়! ওলান্এর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর ভয়ানক লজ্জা করে। আস্তে আস্তে সেখানে থেকে চলে যায়। ও ভেবে দেখে, আইনতঃ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ওর কোন নালিশ নেই, থাকতে পারে না। কারণ তিন তিনটী সুস্থ সবল পুত্রের জননী ওলান্। সুতরাং ওয়াঙের তরফ থেকে বলার কিছু নেই। কিন্তু চঞ্চল চিত্তকে যে কিছুতেই ঠেকাতে পারেনা ওয়াং।

কয়েকদিন পরে খুড়ী এসে জানাল: 'নাও বাপু, সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেছে। তবে রেঁস্তরার মালিকের পক্ষ হ'য়ে কোকিলাই ক'রছে কর্মাচ্ছে কিনা, তার হাতে গুণে একশ'টি ডলার তুলে দিতে হবে, নইলে মাল ছাড়বে না। আর তোমার কমলের চাই একজোড়া জেড্এর দুল, সোনার আংটি, দু'প্রস্থ সাটিনের পোষাক—আর দু'প্রস্থ সিল্কের জুতো, একজোড়া। বিছানাটিও সিল্কের না হ'লে চলবে না।'

এ সব কিছুই ওয়াঙের কানে যায় নি। ও খালি শুনেছে: 'সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে।' উত্তেজিত স্বরে ওয়াং বলে ওঠে এবং তক্ষুণি বাড়ির ভিতর গিয়ে কতকগুলো ডলার এনে খুড়ীর হাতে ঢেলে দিল।

অত্যন্ত গোপনেই দিল কারণ দিনে দিনে বছরে বছরে সঞ্চয় করা, মাটির দান এই অর্থ—তার অপঘাতের সাক্ষী কেউ হয় এ ইচ্ছা ওয়াঙের ছিল না। খুড়ীকে হাত খরচের জন্ত গোটাদশেক ডলার ও থেকে তুলে রাখতে বলল। স্থূল দেহটাকে খানিক মোচড় দিয়ে, মাথাটাকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে হেলিয়ে চাপা স্বরে খুড়ী বলে: 'ছিঃ ছিঃ কি যে বলিস্ বাছা ঠিক নেই। তুই আমার পেটের ছেলের মত। ছেলের জন্য মা করে কি পয়সার লোভে!'

কিন্তু ওয়াঙের চোখ এড়ায়না—ওদিকে খুড়ীর হাত এগিয়ে এসেছে। সেই বাড়ানো হাতে ওয়াং ওর মহা-অর্থ, ওর মাটির দান অবলীলায় ঢেলে দিল। আজকের এ অর্থব্যয় যে অপব্যয় নয়, অত্যন্ত রকম সার্থক এবং সঙ্গত ব্যয় ওর এ বিশ্বাসে কোনো রকম দ্বিধার ফাঁক রইল না।

নিজে বাজারে গিয়ে শূয়র ও গরুর মাংস, ম্যাণ্ডেরিণ মাছ, বাদাম, বাঁশের কোঁড়, শুট্‌কী হাঙ্গরের পাখনা এবং আরো যত রকম রসনার রসবস্তু পেল কিনে নিয়ে এল। তারপর অবকাশ—প্রতীক্ষা—।

ওয়াং বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত। অদম্য অধীরতা—

গ্রীষ্মান্তের উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। দূর থেকে ওয়াং দেখতে পেল একখানা ঘেরা টোপে ঢাকা বাঁশের সীডান্ চেয়ার মাঠের বুকে সর্পিল সরু পথটি বেয়ে আসছে। পেছনে কোকিলা। ভেতরে কমল বসে। বাহকের দেহের দোলায় চেয়ার খানি দুলছে। ওয়াঙের বুকটা কেমন একটা ভয়ে দুর দুর ক'রে উঠল—'এ কাকে নিয়ে এলাম আমি?' অভিভূতের মত ছুটে চলে গেল জীবনের এই সুদীর্ঘ বছরগুলি স্ত্রীর সাহচর্যে যে-ঘরে কেটেছে সেই ঘরে। খিল এঁটে দিল ওয়াং। সব যেন কেমন গোলমাল এলোমেলো হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। শুনতে পেল, ওদিকে খুড়ী হাঁক লাগিয়েছে ওর জন্য।

ধীরে ধীরে ওয়াং বেরিয়ে আসে। একরাশ লজ্জা এসে ওকে ঘিরে ধরে। আজ এই যেন প্রথম দেখা—কমলকে যেন এর আগে কখনও দেখেনি। মাথা তুলতে পারে না—এদিক ওদিক চায়, কিন্তু সামনের দিকে চাইতে দৃষ্টি নেমে আসে।

কোকিলা কণ্ঠে খুশির ঢেউ তুলে ওয়াংকে অভ্যর্থনা করে : 'এসো, এসো। তারপর তোমার সঙ্গে যে আমার এমন কাজ কর্মের ব্যাপারও করতে হবে সে দিন কে আর জানতো বল ?'

চেয়ারটা বাহকেরা নামিয়ে রেখেছে। কোকিলা কাছে এসে পরদা তুলে কলকণ্ঠে বলল : 'এসগো পদ্ম ফুল, বেরিয়ে এসো। বাড়ী ঘর-দোর আর কর্তাটিকে বুঝে শুনে নাও।'

ওয়াঙের চোখ প'ড়ে যায়, বাহকদের মুখে বিশ্রী হাসি। মনটা কেমন ক'রে ওঠে। কিন্তু মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে—কোথাকার ছোট লোক সব, ওদের হাসিতে বড় এল আর গেল! আবার ভয়ানক রাগও হয়, কেন ওর মুখ চোখ অমন লাল, অমন গরম হ'য়ে উঠল ?

পরদা তুলে ফেলতে নিজের অজ্ঞাতসারেই ওয়াঙের চোখ পড়ে গেল চেয়ারটার নিভৃত ছায়ায়। ফোটা লিলি ফুলটির মতই কমলের সযত্ন প্রসাধিত সুন্দর মুখখানা। ওয়াং সব ভুলে গেল। ভুলে গেল একটু আগেই ও রেগেছিল ; এই সহরে লোকগুলি যে একটু আগেই দাঁত বের ক'রে অমন ক'রে হেসেছিল তাও মনে রইল না। সব ভুলে গেল কেবল এটুকু অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ওর মনে গেঁথে রইল যে এই মেয়েকে আজ ও রীতিমত মূল্য দিয়ে ঘরে এনেছে। এ ঘরেই সে চিরকালের মত বাঁধা থাকবে। ওর মূল্যের বিনিময়ে কমল আজ থেকে ওর নিজস্ব। ওয়াং প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে—সমস্ত দেহ থর্ থর্ ক'রে কাঁপে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওয়াং। কমল উঠে দাঁড়ায় যেন একখানি হাল্কা হাওয়ার ঝলক ফুলের বুকে দোলা জাগিয়ে গেল। ওয়াং চোখ ফেরাতে পারে না। কোকিলার হাত ধরে কমল বেরিয়ে আসে মাথা নীচু ক'রে। তারই ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে টলে টলে এগিয়ে আসে। ওয়াঙের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কিন্তু কমল ওর সাথে একটি কথাও কইল না—কেবল কোকিলাকে জিজ্ঞাসা করল ও থাকবে কোথায়। ছোট ছোট পা দুখানির 'পর ওর লঘু দেহ খানি দোল খায় চলতে গিয়ে।

খুড়ী আর কোকিলায় মিলে ওকে নূতন মহলে নিয়ে এল। বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। সুতরাং কমলের আগমন কারোও চোখেই পড়ল না। ওয়াং আগেই চিং ও অন্যান্য লোকজনদের অনেক দূরের একটা ক্ষেতে কাজ করতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওলান্‌ও ছোট ছেলে মেয়ে দুটিকে নিয়ে কোথায়

যেন গেছে। বড় দুই ছেলে স্কুলে; বাবা দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমোয়, তা ছাড়া এমনিতেই সংসারের কিছুই তার চোখে পড়ে না, কাণেও যায় না। হাবা মেয়েটা মা আর বাবাকে ছাড়া সংসারে কিছুই বোঝে না! কমল ভেতরে চলে গেলে কোকিলা পরদা টেনে দিল।

কিছুক্ষণ পরে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি মেখে, দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে খুড়ী বাইরে এল, যেন হাতে কিছু লেগেছে। হাসতে হাসতে বলল: 'গায়ে যা ভুর্‌ভুরে গন্ধ, ম্যাগোঃ! তারপর একটু কথার ধারকে আর একটু বাঁকা, আর একটু তীক্ষ্ণ ক'রে বলে: 'যতটা কাঁচ দেখায়, তত কচি নয় বাছা। বয়সে ভাটা পড়ে এসেছে, দু'দিন পর আর কোনো মরদই চোখ তুলে ওর দিকে চাইত না। নইলে হাজার জেডের দুল দাও, সোনার গহনা দাও, আর সিল্ক-সাটীনে গা মুড়ে দাও, শত বড় লোক হ'লেও চাষার ঘরে আসত না ও আরো কিছু!' ওয়াঙের মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। খুড়ী তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়: 'তাও বলি বাছা, চেহারায় ওর পায়ের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে? কত ঘুরেছি, কত দেখেছি, অমন একখানা মুখই তো দেখি নি কোথাও! ওই চোকপানা বাঁদীটার সঙ্গে এত বছর তো ঘর করলি! এবার যাহোক একটু মুখ বদলাবে।'

ওয়াং কোনো কথা বলে না। অস্থির ভাবে সারা বাড়ীময় এদিক ওদিক ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়ায়—কি শুনবার জন্য কেবলি কাণ পাতে আর চঞ্চল হয়। তারপর সাহস ক'রে পরদা তুলে নূতন মহলে ঢুকে পড়ে এবং আরো সাহস ক'রে কমলের ঘরে পা বাড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যার আগে ও আর বেরুল না।

সারাটা দিন ওলান্ বাড়ী এল না। সেই কোন্ সকালে দেয়াল থেকে নিড়ানীটা পেড়ে নিয়ে, খানিকটা বাসি খাবার পদ্মপাতায় জড়িয়ে ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সন্ধ্যের পর সারা গায়ে ধুলোমাটি মেখে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ী ফিরল। মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে দুটীও নিঃশব্দে এল পেছনে পেছনে। ওলান্ কাউকে কিছু বলল না। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে রোজকার মত খাবার তৈরী ক'রে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। বৃদ্ধ শ্বশুরকে ডেকে এনে খাওয়াতে বসাল, হাতে খাবার কাঠি তুলে দিল। বোবা মেয়েটাকে খাওয়াল, নিজেও একটু মুখে দিল ছেলেদের সঙ্গে। সকলেই এক এক ক'রে শুতে চলে গেল। ওয়াং কি যেন

স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে টেবিলে বসে রইল। ওলান্ পা ধুয়ে রোজকার মত ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ শয্যায়।

এখন দিবারাত্র প্রেমের ভরা পেয়ালা ওয়াঙের মুখের কাছে ধরা—আকণ্ঠ পান করে ওয়াং। আলস্যের সুষমায় কমল শয্যায় এলিয়ে প'ড়ে থাকে। ওয়াং আসে—পাশে বসে— দৃষ্টি দিয়ে যেন ওকে গণ্ডুষ ভ'রে ভ'রে পান করে। শরতের বাতাসে তখনও উত্তাপ রয়েছে, কাজেই কমল বাইরে আসে না। কোকিলা উষ্ণ জল দিয়ে ওকে স্নান করিয়ে, তেল দিয়ে দেহ পরিমার্জিত ক'রে দেয়, সুবাসিত তেল দিয়ে চুল বেঁধে দেয়। কোকিলাকে কমল ছাড়েনি, জোর ক'রে ধরেছিল যে ওকে না হ'লে ওর চলবে না। তারপর কমলের মুক্ত হস্ত—কোকিলা বিবেচনা ক'রে দেখেছিল যে দশের পরিচর্যা ছেড়ে একের পরিচর্য্যায় অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে লোকসানের ভয় নেই। কাজেই শেষ পর্যন্ত সে ঐ নির্জন প্রবাসে আসতে রাজী হ'ল।

সবুজ রংএর গ্রীষ্মোপযোগী সিল্কের তৈরী পায়জামা এবং কোমর পর্যন্ত লম্বা সাঁটা একটা জামা পরে কমল, দরজা-জানালা-বন্ধ ঘরখানার সুশীতল অন্ধকারের মধ্যে সারাটা দিন কাটায়। মাঝে মাঝে ফলটা মিষ্টিটা থেকে একটু খুঁটে খুঁটে মুখে দেয়। ওয়াং দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়।

দিনের বেলা ঠোঁট ফুলিয়ে আব্দারের সুরে ও ওয়াংকে ঘর থেকে যেতে অনুরোধ করে। তারপর আবার স্নান, প্রসাধন। নূতন ক'রে সজ্জা, সাদা মিহি সিল্কের অন্তর্বাসের ওপর গোলাপী রংএর পরিচ্ছদ, পায়ে ফুল তোলা জুতা। কমল ধীরে ধীরে আঙিনায় এসে চৌবাচ্চার ধারে ব'সে সোনালী মাছের খেলা দেখে। ওয়াঙের কাছে কমল পরম বিস্ময়ের বস্তু। পাশে দাঁড়িয়ে ও কেবলি দেখে—সমস্ত সত্তা দিয়ে দেখে। ছোট দু'খানি পায়ের ওপর অতটুকু দেহখানা কেমন দুলে দুলে চলে— ছোট পা দু'খানি মাথার দিকটায় কেমন চমৎকার সরু হয়ে গেছে। এলিয়ে পড়ে থাকা চন্দ্র কলার মত হাত দু'খানি…ওয়াঙের মনে হয় বিশ্বের সৌন্দর্য দিয়ে তিল তিল ক'রে গড়া হয়েছে ঐ হাত ঐ পা, ঐ দেহ।

ওয়াঙের অধিকারে আজ আর কেউ অংশীদার নেই। ও একাই ওর এই পরম ঐশ্বর্য ভোগ করে। পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে ওর সকল দাহ শান্ত হয়ে যায়।

একুশ

যদি কেউ ভেবে থাকে কমল ও তার পরিচারিকা কোকিলাকে ওয়াঙের এ বাড়ীতে নিয়ে এসে বসানোর ব্যাপারটা একেবারে চুকে গেল—কোনো আলোড়ন, বিলোড়ন, আক্ষেপ বিক্ষেপ কিছুই হল না—তবে সেটা ভুল, কারণ তা হয় নি। আলোড়ন যথেষ্টই হ'ল!—যেহেতু স্ত্রীজাতির একের অধিক সংখ্যা যেখানে—সেখানে ঠোকাঠুকি অনিবার্য। ওয়াং আগে অতটা তলিয়ে দেখেনি, বুঝতেও পারেনি। ওলান্‌এর মুখের ভাব এবং কোকিলার ঝাঁঝালো কণ্ঠে মাঝে মাঝে চমক, দেখে মনে হয়েছে কোথাও তালভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু তত লক্ষ্য করে নি—করার অবসরও ছিল না। কারণ ওর নিজের মধ্যেই আলোড়ন,—বাইরের আলোড়নের দিকে তাকাবার সময় কোথায়?

কটা দিন গেল। ধীরে ধীরে নেশার প্রথম ঘোর কেটে ওয়াং চোখ মেলে চেয়ে দেখল—যেমন দিনের পর রাত এবং রাতের পর আসে প্রভাত—প্রভাতে ওঠে সূর্য এবং চাঁদও যথানিয়মে আকাশে হাজিরা দেয়—এ সত্যের মতই সত্য হ'য়ে কমল ওর বাড়ীতে, ওর একেবারে হাতের কাছে রয়েছে এবং ইচ্ছা হ'লেই ও তাকে ধরতে পারে, ছুঁতে পারে, পরম ঘনিষ্ঠতায় কাছে পেতে পারে। সুতরাং ওয়াং নিশ্চিন্ত হয়, এবং এই নিশ্চিন্ততায় ওর ভেতরের চাঞ্চল্য অনেকটা শান্ত হ'য়ে আসে। এতদিন চোখের সামনে থেকেও যা চোখে পড়েনি এবারে তা চোখেও পড়ে।

এবার ওয়াং স্পষ্টই দেখতে পায়—ওলান্ আর কোকিলাতে বনছে না। কিন্তু বড় অবাক হয়। কমলকে ওলান্ সইতে পারবে না এ ও জানত। এবং এর জন্য প্রস্তুতও ছিল। সতীনকে কোন্ মেয়েই বা সইতে পারে। গলায় দড়ি দিয়ে মরে পর্যন্ত মেয়েরা সতীন ঘরে এলে। তা ছাড়া বেচারা স্বামীদের লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় দুর্দশার অন্ত থাকে না—সে কথা বলাই বাহুল্য। এ সব কাহিনী ওয়াং বহু শুনেছে। সে জন্যই, ওলান্‌এর যে বেশী কথা কওয়ার অভ্যাস নেই তাতে ও খুশী এবং অনেকটা নিশ্চিন্তও। আর যাই হোক্ অন্ততঃ ওর সঙ্গে ওলান্ ঝগড়া ঝাটি করবেনা।

কিন্তু এদিকে ওর সাথে ঝগড়া ঝাটি না ক'রে কমলকে কিছু না বলে ওলান্ কোকিলার উপর এমন খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠবে—এ ওয়াং ভাবতে পারেনি কখনও। তাছাড়া, আসার আগে কমল চোখের জলে ভাসিয়ে আব্দার ধরে বসেছিল—কোকিলাকে সাথে নেবার জন্য! একে তো কমলের কথায় ওয়াঙের তখন প্রাণ দিয়ে ফেলাটাও কঠিন মনে হত না, এমনি অবস্থা। তারপর মেয়েটা একেবারে আঁতে ঘা দিয়ে বসল—'সংসারে কেই বা আর আছে আমার—সেই এতটুকু রেখে তো বাপ মা চলে গেল। একটু বড় হ'তেই চেহারাখানা ভালো হ'ল দেখে কাকা দিলে বেচে। সেই থেকে তো এই ঘেন্নার জীবন চলছে। কোকিলা থাকলে তবু একটু ভালো লাগে। তা ছাড়া আমার কাজ কর্মও করে দিতে পারবে।'—বলতে বলতে কমলের চোখ জলে ভ'রে এসেছিল। অবশ্য ওর সুন্দর চোখ দুটির কোণে জলের ভাণ্ডার সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তবুও ওর চোখের জল ওয়াং সইতে পারে না। তা ছাড়া ভেবেও দেখল, সত্যিইতো বেচারা বড় একা পড়বে। ওর জন্য ঝিও লাগবে একজন, কারণ ওলান্এর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা না করাই ভালো—সে হয়তো সতীনের ছায়াও মারাবে না। এক রয়েছে খুড়ী। কিন্তু একেও ওয়াঙের বিশেষ ভরসা হয় না। একবার ফাঁক পেলে এসে একেবারে জুড়ে বসবে। আর ওরই খাবে ওরই পরবে আর ওরই শ্রাদ্ধ করবে বসে। তার চাইতে কোকিলাই ভালো। আর কেউ তো ওয়াঙের জানাও নেই, যাকে আনা যেতে পারে। কাজেই সাত পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত ওয়াঙ কোকিলাকে নিয়ে এল কমলের সঙ্গে।

কোকিলাকে প্রথম দেখেই ওলান্ আগুনের মত জলে উঠেছিল। অত রাগ এ নীরব মানুষটির মধ্যে ওয়াং কখনও দেখেনি, বা অত রাগ যে ওলান্এর মধ্যে আছে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কোকিলা অবশ্য ওলানএর মন জুগিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে! কেননা এখন ওয়াং ওর প্রভু আর ওলান্ প্রভুপত্নী। জমিদার বাড়ী থাকতে না হয় সম্পর্কটা ঠিক উল্টো ছিল। প্রথম দিন এসে কোকিলা ওলান্‌কে ডেকে আপ্যায়নের স্বরে বলেছিল:

'আবার এক ঘাটে এসে মিল্‌লাম। কিন্তু অদৃষ্টের ফের দেখ। এবারে তুমি গিন্নী—আবার মালিক, আর আমি হ'লাম তোমার দাসী বাঁদী।'

ওলান্ কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ছিল খানিকক্ষণ,

তারপর কোকিলাকে চিনতে পেরে একটি কথা না কয়ে ছুটে চলে গেল মাঝের ঘরে—একেবারে সোজা ওয়াঙের কাছে। বিনা ভূমিকায়, একেবারে সাদা সোজা ভাষায় জিজ্ঞাসা ক'রে বসল :

'ওই দাসী মাগী এখানে এল কি ক'রে ?'

ওয়াং ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। হঠাৎ মুখে কিছু যোগাল না। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কেবল। খুব শক্ত ক'রে মুখের ওপর বলে দিতে চাইল এ বাড়ী ওর, সুতরাং যাকে খুসী তাকে আনবে। ওলান্ কথা বলার কে ? কিন্তু মানুষটা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। কেমন যেন লজ্জা হ'ল ওয়াঙের। কথা বেধে গেল। একটি কথাও বেরুল না। এবং বেরুল না বলেই ভয়ানক রাগ হ'ল। বিচার ক'রে দেখল—লজ্জার কোনো হেতুই নেই। আর দশটা মরদ হাতে পয়সা থাকলে যা করে—ও তাই করেছে। নতুন কিছু বা বেশী কিছু করেনি।

যুক্তি দিয়ে আত্ম-সমর্থন হওয়া সত্ত্বেও ওয়াং কিছু বলতে পারল না। আবার একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাল, যেন পাইপটা প'ড়ে গেছে এমনি ভাবে জামা কাপড় ঝেড়ে ঝেড়ে খুঁজতে লাগল। কিন্তু ওলান্ তার ধ্যাব্ড়া ধ্যাব্ড়া পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগল। এবং যখন দেখল ওয়াং কিছু বলছে না, তখন আবার প্রশ্ন করল : ওই দাসী মাগী আমাদের এখানে কেন ?'

ওয়াং দেখল জবাব না পেলে ওলান্ নড়বে না। বলল বটে : 'তাতে তোমার কি ?' কিন্তু কথায় একটুও জোর ফুটল না।

ওলান্ বলল : 'দেখ জমিদার বাড়ী যতদিন ছিলাম ওর চোখ-রাঙানী ঢের সয়েছি। যখন তখন, দিনের মধ্যে হাজার বার রান্নাঘরে ঢুকে ওর হাজার ফরমাস—এই চা দাও, এই খাবার দাও, এটা বেশী গরম, ওটা ঠাণ্ডা হিম, এ রান্নাটা ভালো হয় নি, আমার চেহারা কালো কুচ্ছিৎ, আমি কাজ করতে পারিনা কত কি।'

তবুও ওয়াং নিরুত্তর, উত্তর কি দেবে ভেবেই পেল না। ওলান্ দাঁড়িয়ে রইল। কোনো উত্তরই না পেয়ে ওর দু'চোখ উষ্ণ অশ্রুতে ভরে গেল—বাধা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করল। তারপর নীল জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলল : 'এখন নিজের বাড়ীতে দাসীর চোখরাঙানী সইব কি ক'রে ? বাপের বাড়ীও নেই যে চ'লে যাব।'

ওয়াং তবু নীরব। নীরবে পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল। ওলান্ তার সেই অদ্ভুত বোবা চোখ দুটি ওয়াঙের দিকে তুলে ধরল। গভীর বিষাদে বিধুর হ'য়ে উঠল দৃষ্টি—এ যেন ভাষাহীন মূক পশুর দৃষ্টি!

চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল—কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে দরজা আন্দাজ ক'রে বেরিয়ে গেল ওলান্।

যতক্ষণ দেখা গেল, ওয়াং ওলান্এর দিকে তাকিয়ে রইল। চলে যেতে একা থাকতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এখনও ওর লজ্জা ঘুচল না, এবং লজ্জা করছে বলেই ওর রাগ হ'তে লাগল। যেন কারো সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে, এমনি ভাবে জোরে জোরে নিজে নিজেই বলতে লাগল ঝাঁঝ দিয়ে: 'বেশ করেছি। সবাই করে। আমি আর এমন কি করেছি। তাও ওকে তো কিচ্ছুটি বলিনি, মাথায় ক'রে রেখেছি। কতজন তো আরো কত কি করে!' অবশেষে ও সাব্যস্ত ক'রে নিল, ওলান্‌কে সয়েই থাকতে হবে।

ওলান্ ভেঙে পড়ল না। নীরবে সে তার কাজ ক'রে যেতে লাগল। ভোরে উঠে বরাবরের মত জল গরম ক'রে শ্বশুরকে দেয়; ওয়াং যদি ও মহলে না থাকে তবে তাকেও চা দেয়। কিন্তু কোকিলা যখন তার মনিবের জন্য গরম জল নিতে আসে, কড়া প্রায় শুকনো। হাজার চীৎকারেও ওলান্ একটি কথা বলে না। সুতরাং মনিবের গরম জলের দরকার হলে কোকিলার নিজহাতে গরম ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু পরক্ষণেই প্রাতে খাবার মণ্ড তৈরী করার সময় হয়ে যায়। কড়ায় এক বাটিও বেশী জল ধরে না—নির্বিকার ভঙ্গিতে ওলান্ মণ্ড চড়িয়ে দেয়। কোকিলা বৃথাই চেঁচিয়ে মরে: 'ঐ তো শরীর, শরীরে কি কিছু আছে? এককোঁটা গরম জলও জুটবে না ভোর বেলা? গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে বিছানায় মরে পড়ে থাকতে বলো নাকি?'

ওলান্ একেবারে নির্বিকার। নির্বিকার চিত্তে উনুনের মুখে ঘাস পাতা দেয় ধীরে ধীরে একটি একটি ক'রে, আগের মত হিসাব ক'রে—যখন ওদের অস্বচ্ছল সংসারে একটি শুকনো পাতারও দাম ছিল, ঠিক তেমনি ক'রে।

কোকিলা চীৎকার ক'রতে ক'রতে গিয়ে ওয়াঙের কাছে নালিশ করে। ওয়াং রঙীন নেশায় মশগুল, এসব খুঁটিনাটি বাজে ঝামেলা ভালো লাগে না। চটে গিয়ে ওলান্‌কে গালাগালি করে: 'কড়ায় একটা বাটি বেশী জল দিতে কি তোমার হাত খসে যায়?'

ওলান্‌এর মুখ আরো বেশী থম্‌থমে হ'য়ে ওঠে: 'এ বাড়ীতে বসে বাঁদীর বাঁদীপনা ক'রতে পারব না—'জবাব দেয়।

ওয়াং আর আপনাকে সংযত করতে পারে না। ছুটে গিয়ে ওলান্‌এর টুটি চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে: 'ন্যাকা আর কি, কিছু যেন জানেন না। বাঁদী যার কথা বলছ সে বাঁদী নয়—বাঁদীর মুনিব, বুঝেছ।'

ওলান্‌ নীরবে সব সহ্য করে। একটি কথাও বলে না। তারপর ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে বলে: 'ওকেই বুঝি মুক্তো দুটো দিয়েছ?'

ওয়াঙের হাত শিথিল হ'য়ে পড়ে যায়। মুখে কথা সরে না, রাগ একেবারে উবে যায়। লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে গিয়ে কোকিলাকে বলে: 'দেখ, এখানেই আর একটা রান্নাঘর ক'রে দেব না হয়। এ তো যা তা মুখে দিতে পারে না, আর ওর শরীরেও সইবে না। বড় বৌ ভাল রান্না ক'রতে একেবারেই জানে না। কাজেই আলাদা রান্না ঘরই ভালো। তুমি নিজের হাতে খুসীমত রান্না ক'রে নেবে, নিজেও একটু মুখে দিতে পারবে।'

মিস্ত্রী লাগিয়ে দিল আর একটা রান্নাঘর আর উনুন তৈরী করতে। বেশ ভালো দেখে একটা কড়াও কিনে নিয়ে এল। ওয়াং নিজে বলেছে খুসীমত রান্নাবাড়ি ক'রে নিও—কোকিলাও খুসী হ'ল।

ওয়াং লাং ভাবল যাক এবারে ঝামেলা মিটে গেল। কোকিলা আর ওলান্‌ দু'জনে দু'জায়গায় নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবে। এবং ওয়াংও কমলকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে। নূতন ক'রে ওয়াঙের মনে হয়—এমনি ক'রেই ও চিরকাল কমলের ভালোবাসায় ডুবে থাকতে পারবে। কোনোদিন ক্লান্তি আসবে না—আসবে না—। ওই ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান—অভিমানে আয়ত চোখ দু'টির ওপর পল্লব দু'টির নেমে আসা—যেন সন্ধ্যা বেলায় পদ্মের পাপড়ি মুদে আসা। হাসিতে ঝল্‌মল্‌ চোখে অমন ক'রে চাওয়া—আসবে না, কোনো দিন ওয়াঙের ক্লান্তি আসবে না।

কিন্তু সমস্যা মিটল না। বরং নূতন রান্নাঘরের ব্যাপারটা মাংসের মধ্যে কাঁটার খোঁচার মত হয়ে রইল। কারণ কোকিলা রোজ নিজে বাজারে যায়, আর ইচ্ছেমত দক্ষিণ দেশের আমদানী যত দামী দামী জিনিস কিনে আনে। অনেক জিনিষের নামই ওয়াং কখনও শোনেনি। খরচের পরিমাণ দেখে ওয়াঙের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়: 'আমার

মাংস চিবিয়ে খাচ্ছ তোমরা।' কিন্তু সামলে নেয়। ভয় করে পাছে কোকিলা রাগ করে;—তা'হলে তার মনিবের কানে যাবে এবং সেও কিছু খুসী হবে না। কাজেই নিরুপায় হ'য়ে ওয়াংকে ট্যাঁক থেকে বিনা প্রশ্নে টাকা বের ক'রে দিতে হয়। কিন্তু মনটায় দিনরাত বড় খোঁচা লাগে। কাউকে বলতেও পারে না। দিনের পর দিন কাঁটাটা যেন আরো বেশী গভীর হ'য়ে ফুটে বসে। কমলের প্রতি ভালোবাসায় একটু একটু ক'রে ভাটা পড়ে আসে।

প্রথম কাঁটাটি থেকে আর একটি কাঁটার সৃষ্টি হ'ল। ওয়াঙের খুড়ীর লোভী রসনা ঠিক খাওয়ার সময় তাকে এ মহলে টেনে নিয়ে আসে। ক্রমে এ মহলে তার গতিবিধি স্বচ্ছন্দ এবং অবাধ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও নিজের আত্মীয়, তবুও এ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কমলের এত ঘনিষ্ঠতা ওয়াঙের একেবারেই পছন্দ হয় না। এরা তিনজনে মিলে দিব্যি চর্ব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয় খায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল হাসি, গল্প কাণাকাণি করে। পরমানন্দে আছে ওরা—। খুড়ীকে খুব ভালো লাগে কমলের। ওয়াঙের মোটেই সহ্য হয় না।

কিন্তু নিরুপায়—কিছু বলতে পারে না। বলতে গেলেই অনর্থ বাধে। সেদিন বড় আদর ক'রে ওয়াং বলেছিল: 'শুনছ গো আমার কমল, আমার পদ্মফুল—তোমার সবটুকু সুধা বুঝি ওই ধুমসী বুড়ীটার জন্যই খরচ করবে! আমার জন্যে একটুখানি রেখো। ভারী ধড়িবাজ বুড়ী জানো। ওযে সকাল-সন্ধ্যে এখানে জমে বসে থাকে আমার একটুও ভালো লাগে না।'

কমল চটে উঠেছিল। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে, ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গরম হ'য়ে জবাব দিয়েছিল: 'আমি অত্তি প্যাঁচার মত থাকতে পারিনে বাপু। চিরটা কাল মানুষ-জন হাসি-হল্লোড়ের মধ্যে কাটিয়ে এসেছি। এখানে আর কে আছে শুনি? এদিকে আছ তুমি। আর ওখানে তোমার বড় গিন্নি, আর হতচ্ছাড়া ছেলেগুলো। তিনি তো ঘেন্নায় আমার মুখই দেখেন না—আর ছেলেগুলো। হাড় জ্বালিয়ে খেলে আমার। কার সাথেই বা একটা কথা বলে বাঁচি।'

কান্নার সুরে অনুযোগ করে: 'তুমি আমায় একটুও ভালোবাস না।, ভালবাসলে আমার কষ্ট একটু বুঝতে।'

তারপর একেবারে মোক্ষম্ অস্ত্র ছাড়ে—সে রাতের মত শয়ন গৃহ হ'তে নির্বাসন।

ওয়াং একেবারে এতটুকু হ'য়ে যায়। অনুশোচনায়, উদ্বেগে, ব্যাকুল হ'য়ে বলে: 'থাক্ থাক্, তোমার যা ভালো লাগে করো।' তবে ক্ষমা ভিক্ষা পায়।

সেদিন থেকে কমলের কোনো ইচ্ছার বিরোধিতা ক'রতে ওয়াঙের আর সাহস হয় না। বড় ভয়ে ভয়ে চলে। সেদিন থেকে কমলের সাহস বেড়ে যায়। খুড়ীর সাথে গাল গল্প ক'রছে বা খাচ্ছে—এমন সময় ওয়াং যদি এসে পড়ে তবে নির্বিকার চিত্তে সে ওকে বাইরে অপেক্ষা ক'রতে বলে। এখন কমল রীতিমত তাচ্ছিল্য করে ওয়াংকে। ওয়াং বোঝে খুড়ী যখন থাকে ওর আসা কমল একেবারেই পছন্দ করে না। ভয়ানক রাগ হয়, বেরিয়ে চলে আসে। এমনি ক'রে ওয়াঙের অজ্ঞাতসারেই ওর ভালোবাসায় ভাটা পড়ে।

আরো বেশী রাগ হয় যে অত খরচ ক'রে কমলের জন্য যে খাবার কেনা হচ্ছে—তা খেয়ে খেয়ে বুড়ীর দেহের চর্বি বাড়ছে। কিন্তু ওয়াঙের কিছু বলার সাহস নেই। তাছাড়া খুড়ীও চতুর কম নয়। ওয়াং ঘরে এলেই উঠে দাঁড়ায়, কত বিনয় দেখায়—মিষ্টি মিষ্টি কথা ব'লে তোষামোদ ক'রে একেবারে ভিজিয়ে দেয়। রাগ দেখাবার পথ থাকে না।

যে ভালোবাসা একদিন ওয়াঙের সমস্ত সত্তাকে, সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, সেই পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে এল নানা ঘাত প্রতিঘাতে। সব কিছু আজ ওয়াংকে নীরবে নিজের মধ্যেই পরিপাক ক'রে নিতে হয় –প্রকাশের উপায় নেই, স্থানও নেই! নানা প্রতিকূলতায় ক্ষণে ক্ষণে যে ক্রোধ ওয়াঙের মনের মধ্যে জমে ওঠে,তা অন্তরে অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে হয়। অবরুদ্ধ থেকে তার উত্তাপ ক্রমশঃ বেড়ে যায়। একটু সান্ত্বনার আশায় ওলান্‌এর কাছে গিয়ে যে দাঁড়াবে, ওলান্‌এর কাছে গিয়ে যে নিজেকে খুলে ধরবে, সে পথও নেই! উভয়ের বিচ্ছিন্ন জীবনের মাঝখানে আজ দুস্তর সাগর। বড় রাগ হয় ওয়াঙের। কেন অমন ক'রে ওর সকল দিক রুদ্ধ হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত এই রাগই ওর প্রেমকে ক্ষত-বিক্ষত খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দেয়।

একটি মূল থেকে যেমন সহস্র কাঁটার সৃষ্টি হ'য়ে বিস্তীর্ণ ভূমিকে আকীর্ণ ক'রে দেয় তেমন ওয়াঙের জীবনও কমলকে কেন্দ্র ক'রে সহস্র দুর্গতিতে ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল।

এতদিন ওয়াঙের বাবা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার জরাগ্রস্ত সত্তা নিয়ে সংসারে একধারে পড়েছিল। সেদিনও অভ্যাস মত রোদে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল বৃদ্ধ। হঠাৎ কি হল—জেগে উঠে সেবার জন্মদিনে ওয়াঙের দেওয়া ড্রাগন মুখো লাঠিটায় ভর দিয়ে স্থবির দেহটাকে টানতে টানতে নূতন আর পুরানো মহলের মাঝখানের দরজাটার কাছে এসে উপস্থিত হল। এ দরজাটা এতদিন বৃদ্ধের চোখে পড়েনি, মহলটা যখন তৈরী হয়েছিল তখনও কিছু বুঝতে পারেনি। ছেলে যে আর এক বৌ ঘরে এনেছে তাও বাপকে বলেনি। কারণ, বলতে গেলে জগৎ সংসারকে শুনিয়ে বলতে হয়—নইলে বৃদ্ধের বধির কাণে কোনো কথা প্রবেশ করে না।

দরজাটা দেখে বৃদ্ধের কৌতূহল হল এবং পরদা সরিয়ে ভেতরে এল। বিকেল বেলা। এ সময়টা ওয়াং ও কমল রোজ আঙ্গিনায় বেড়ায়। আজও ওরা বাইরে চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়েছিল। কমল দেখছিল সোনালী মাছের পুচ্ছ তাড়না, আর ওয়াং দেখছিল কমলের গ্রীবাভঙ্গি। ঠিক এই সময় বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হ'ল এবং ছেলেকে একজন যুবতীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাগে আগুন হ'য়ে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করতে লাগল:

'বেশ্যা! আমার বাড়ীতে বেশ্যা!

ওয়াং ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, কমল হয়ত এক্ষুণি রেগে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। কারণ, কমল মানুষটি ছোট হলেও রাগ হ'লে তার চীৎকার, হাত পা ছোড়ার পরিমাণ মানুষটার দেহের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। কাজেই এগিয়ে এসে বাবাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করল। বোঝাতে চাইলে যে এ বেশ্যা নয়, দ্বিতীয়া স্ত্রী। কিন্তু কোনো ফল হল না। ওয়াঙের কথা তার কাণে গেল কিনা কে জানে, বৃদ্ধ কেবলি চীৎকার করতে লাগল: 'বেশ্যা, বেশ্যা; আমার বাড়ীতে বেশ্যা!' তারপর ওয়াং লাং-এর ওপর চোখ পড়তে বলে উঠল: 'বাপুহে, আমার ছিল এক বৌ, আমার বাপের ছিল এক বৌ। আমরা জমি চষেছি আর এক বৌ নিয়ে ঘর করেছি—' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার চীৎকার ক'রতে আরম্ভ করে: 'বেশ্যা, আলবৎ বেশ্যা!'

কমলের প্রতি একটা প্রবল ঘৃণা বৃদ্ধের জরাগ্রস্ত চেতনার ওপর জেগে রইল। এখন মাঝে মাঝেই কমলের মহলের দরজায় গিয়ে সে বেশ্যা বলে হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠে। নয়তো পরদা ঠেলে ভেতরে গিয়ে আঙ্গিনায় থু থু ফেলে,

বা টিন কুড়িয়ে নিয়ে চৌবাচ্চায় সোনালী মাছগুলির গায় ছোঁড়ে। এমনি ক'রে ছোট ছেলেদের মত বৃদ্ধ তার রাগ প্রকাশ করে।

এই ব্যাপারকে অবলম্বন ক'রে একটা ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হ'ল। এদিকে বাবাকে কিছু বলতে লজ্জা করে, আবার ওদিকে কমলের মেজাজের ভয় রয়েছে সামান্য কারণেই কমল যা অনাসৃষ্টি ঘটায়! কমলের রাগ ঠেকাতে হলে বাবাকে ঠেকাতে হয়। এবং এই ঠেকানোর ব্যাপারে ওয়াং নিজেই ঠেকে ঠেকে মনের দিক দিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই হলো আর একটা কারণ যাতে ওর ভালোবাসা ক্রমে জীবনের বোঝা হয়ে দাঁড়ালো।

একদিন কমলের মহল থেকে একটা ভয়ানক চীৎকার ওর কাণে এল। গলাটা কমলেরই। ওয়াং ছুটে গিয়ে দেখে ওর যমজ ছেলে মেয়ে দু'টিতে মিলে তাদের বোবা দিদিকে টানতে টানতে ওখানে নিয়ে এসেছে। ভেতরের মহলের অধিবাসিনী সম্বন্ধে ওদের চার ভাই বোনেরই বড় কৌতূহল। বড় দু'জন বোঝে ব্যক্তিটি ওখানে কি ক'রে এল এবং ওদের বাবার সাথে তার সম্পর্কটাই বা কি। ওরা লজ্জা পায় একটু। সুতরাং অতি গোপনে নিজেদের মধ্যে ছাড়া কমলের নামও কখনো উচ্চারণ করে না। কিন্তু উঁকি মেরে, কাণাকাণি ক'রে ওঘর থেকে ভেসে আসা সুগন্ধ বাতাস নাক ভরে টেনে নিয়ে, কোকিলা এঁটো বাসন নিয়ে যাবার সময় তাতে একটু আঙুল লাগিয়ে চেটে দেখেও ছোট দুটির কৌতূহল মেটে না।

ছেলেদের উপদ্রব সম্বন্ধে বহুবার কমল ওয়াঙের কাছে নালিশ ক'রেছে— যাতে ওরা আর এদিকে এসে ওকে বিরক্ত ক'রতে না পারে সেজন্য ওদের বন্ধ ক'রে রাখার ব্যবস্থাও দিয়েছে' কিন্তু ওয়াং কিছুতে রাজী হয়নি। হাসতে হাসতে বলেছে: 'ওদের বাবার মত ওরাও সুন্দর মুখখানা না দেখে থাকতে পারে না কিনা, কি করবে বলো!'

ওয়াং ছেলেদের এ'দিকে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছে। বাপের চোখের সামনে ওরা এদিকে আর আসে না, তবে চোখের আড়াল হলেই আর কথা নেই। বোবা মেয়েটা কেবল এসবের ধার ধারে না, সে নিজের জায়গায় পাঁচিলে হেলান দিয়ে রোদে ব'সে তার কাপড়ের ফালিটি নিয়ে খেলা করে।

আজ দাদারা স্কুলে চলে গেল দু'জন ভাবল বোবা দিদিটা তো ও-মহলের মানুষটিকে দেখেনি, তাকে একবার দেখাতে হয়। তাই তারা দু'জনে মিলে দুদিক থেকে হাত ধরে টানতে টানতে বোবা দিদিকে নিয়ে এসে হাজির করল

একেবারে কমলের সামনে। কমল এর আগে কখনও একে দেখেনি। বোবা দিদি ব'সে প'ড়ে অচেনা মানুষটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে। কমলের পরনের ঝল্‌মল সিল্কের পোষাক আর কাণে জেডের দুল দুটি দেখে ওর মনে কি একটা বিচিত্র আনন্দ উথলে ওঠে। দু'হাত বাড়িয়ে দুলের উজ্জ্বল সবুজ রঙগুলো ধরতে গিয়ে খল্ খল্ ক'রে হেসে উঠল। হাসির বদলে ওর মুখ থেকে কেবল একটা অর্থহীন বিকৃত শব্দ বেরুল। কমল ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। সেই চীৎকার শুনেই ওয়াং ছুটে এসেছিল। এসে দেখল কমল রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘরময় ছুটোছুটি ক'রছে। খুকী তখনও হাসছিল। ওয়াং আসতেই খুকীকে দেখিয়ে আস্ফালন ক'রে কমল চীৎকার ক'রে উঠল :

'আমি চলে যাব। ঐ ওটা যদি আমার সামনে আসে, এক মুহূর্ত এ-বাড়ীতে থাকব না—থাকব না। কে জানতো বাবা এখানে রাজ্যের যত সব ভূত-পেত্নীর আড্ডা! আগে জানলে কি আর পা বাড়াই এদিকে! ছিঃ কি নোংরা ভূতের মত ছেলেগুলো।'

ছোট ছেলেটা যমজ বোনটির হাত ধরে কমলের কাছটিতেই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েছিল অবাক হয়ে। তাকে কমল এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল।

সন্তান-গত-প্রাণ ওয়াঙের বাৎসল্যে ঘা লাগল। প্রচণ্ড রাগে ওর আপাদ মস্তক জ্বলে উঠল। কঠোর ভাবে কমলকে বলল :

'খবরদার আমার ছেলেদের অমন ক'রে শাপ মন্যি ক'রো না। আর যেন কোনো দিন না শুনি। হোক হাবা বোবা, আমার মেয়েকে কখনও গাল দেবে না বলে রাখছি। পেটে তো একটা ছেলে ধরার মুরোদ হল না, আবার শাপ মন্যি করা!'

তারপর ছেলেমেয়েদের কাছে টেনে বলল : 'যা তো বাছারা, যা এখান থেকে, আর এখানে আসিসনে। ও তোদের ভালোবাসে না। আর, যে তোদের ভালোবাসে না তোদের বাপকেও সে ভালোবাসে না।' তারপর বড় খুকীকে গভীর আদরে ভরে বলে : 'হাবা মা আমার, চল্‌তো তোর নিজের জায়গায় বসবি চল।' খুকী হাসল একটু, ওয়াং ওর হাত ধ'রে বেরিয়ে গেল।

বিশেষ ক'রে এই দুর্ভাগিনী মেয়েটাকে যে কমল অমন ক'রে গাল দিতে সাহস ক'রেছে এ জন্য ওর রাগ হয়েছে আরো বেশী। এই অভিশপ্ত মেয়েটার জন্য নূতন ক'রে একটা গভীর বেদনা ওর বুকে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। দিন দুই ও

আর কমলের কাছে গেলেই না। ছেলেদের সঙ্গে খেলা ক'রে কাটিয়ে দিল। সহরে মেয়েটার জন্য লজেঞ্চুষ কিনে নিয়ে এল। খাবার জিনিস হাতে পেয়ে অবোধ মেয়েটার মুখে যে আনন্দ ফুটে উঠল, তা দেখে ওয়াঙের মনের মেঘ কেটে গেল।

এরপর ওয়াং যখন আবার কমলের ঘরে গেল, এ দুদিনের না-আসা নিয়ে দু'জনের মধ্যে কোন কথাই উঠল না। কমল আজ ওয়াংকে খুশী ক'রতে উঠে প'ড়ে লাগল।

খুড়ী ওর সাথে চা খাচ্ছিল। ওয়াং আসতেই কমল উঠে পড়ল। এবং খুড়ী চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ওয়াঙের কাছে এসে ওর হাত নিয়ে চুমো খেল। ওয়াঙের প্রসন্নতা ফিরে এল বটে, কিন্তু সেই অতলস্পর্শী, পূর্ণাবয়ব প্রেম আর ফিরল না।

গ্রীষ্ম শেষ হ'ল। ভোরের স্বচ্ছ আকাশে সাগরের নীলিমা জেগে ওঠে। শরতের বাতাস প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে মাঠের ওপর দিয়ে হু হু ক'রে বয়ে যায়। একটা গভীর সুপ্তি থেকে ওয়াং যেন জেগে ওঠে। ক্ষেত্রগুলির দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। বানের জল নেমে গেছে। শরতের শীতল বাতাসের নীচে ব্যগ্র রবির কনক-কিরণপাতে মাটি যেন জ্যোতিষ্মতী হয়ে উঠেছে।

মাটির আকুল আহ্বান ওর অন্তরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কমলার প্রতি প্রেম, জীবনের যত চাওয়া যত পাওয়ার রাগিণী, সব ছাপিয়ে সে আহ্বান যেন রণিত হয়ে ওঠে। ওয়াং ছিঁড়ে ফেলল তার আজানুলম্বী বিলাস বসন, ছুঁড়ে ফেলে দিল মখমলের জুতো আর সাদা মোজা। লম্বা পায়জামার পা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিল। ব্যগ্রতায় উচ্চারিত অনাবৃত বলিষ্ঠ দেহে ওয়াং যেন একটা মিথ্যার খোলস কেটে আজ আলোয় বেরিয়ে এল।

'কোথায় হে—, লাঙল কোদাল সব কোথায়?—ওয়াং হাঁক দিল: 'গমের বীজগুলো কোথায়? চিং ভাই এসো, সবাইকে ডেকে গিয়ে চলো, আমি এগুচ্ছি।'

বাইশ

ওয়াং দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরে আসার পর সেখানকার অবাঞ্ছিত জীবনের সমস্ত পীড়া, সমস্ত বেদনা ওর মাটির স্পর্শে ঘুচে গিয়েছিল। জীবনে যে কালো অধ্যায়টি সেখানে রচিত হ'য়েছিল তারি দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অপূর্ব সান্ত্বনায় ওর যত দাহ সব স্নিগ্ধ হয়েছিল। এবারেও মাটিই ওর হৃত-স্বাস্থ্য মনকে রোগমুক্ত ক'রে দিল। পায়ের তলায় ভেজা মাটির স্পর্শ, চষা-জমির সোঁদা গন্ধ নিশ্বাসের সাথে বুক ভ'রে গ্রহণ করে ওয়াং। জন-মজুরদের হুকুমের পর হুকুম ক'রে দশদিনের কাজ একদিনে করিয়ে নেয়। প্রায় সারাটা মাঠেই চাষ পড়ে গেল! প্রথম লাঙ্গলখানায় ওয়াং নিজেই গিয়ে দাঁড়াল। চাবুক হাতে বলদ তাড়িয়ে ও আগে আগে চলে, যখন তখন সপাং সপাং ক'রে বলদের পিঠে চাবুক পড়ে। লাঙ্গলের ফাল গভীর হ'য়ে মাটির মধ্যে বসে যায়—ওয়াঙের বড় ভালো লাগে। খানিক পরে চিংএর হাতে বলদের দড়ি তুলে দিয়ে নিজে মুগুর নিয়ে ঢেলা ভাঙতে বসে যায়। একেবারে অণু অণু ক'রে ফেলে বড় বড় ঢেলাগুলো। ভিজে কালো মাটি নরম কালো চিনির মত হ'য়ে ওঠে। আজ ওয়াং প্রয়োজনের তাগিদে কাজ করে না, আজ ওর কাজে রয়েছে আনন্দের আমন্ত্রণ। ক্লান্ত হ'লে মাটির ওপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। মাটির স্বাস্থ্য ওর দেহের রক্ত মাংসে মিশে ওর যা কিছু পীড়া সব হরণ করে নিল।

সূর্য ডুবে যায়; রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তারপর ওয়াং বাড়ী ফেরে—শ্রম-ক্লান্ত দেহে জয়ের মহিমা লেখা। দুই মহলের মাঝখানের পরদাটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। কমল বাইরেই ছিল—ওয়াঙের মাটিমাখা মূর্তি দেখে চীৎকার ক'রে উঠল। ওয়াং কাছে যেতেই শিউরে উঠে সরে গেল।

ওয়াং হেসে উঠে বাঁকা চন্দ্র কলার মত হাত দু'খানি নিজের নোংরা হাতের মধ্যে নিয়ে প্রবল বেগে হাসতে হাসতে বলে:

'দেখছ তো কার ঘরে এসেছ। চাষা, চাষা একেবারে একটা আস্ত চাষা গো—চাষার বৌ!'

কমল রুখে জবাব দেয়: 'ওঃ বয়ে গেছে আমার চাষার বৌ হ'তে। তোমরা যা খুসি তাই থাকো, আমার তাতে কি?'

ওয়াং আবার হেসে ওঠে এবং অত্যন্ত সহজভাবেই ওখান থেকে চলে যায়।

গায়ে পায়ে মাটি নিয়েই ও ভাত খায়। শোবার আগে হাত পা ধুতে হয়, কিন্তু তাও নেহাৎ অনিচ্ছায়। পা ধুয়ে আর একবার খুব হেসে নেয়—কেন না আজ ও মুক্তি পেয়েছে—আজ আর কোন রমণীর জন্য ওকে নাইতে হয়নি।

ওয়াঙের মনে হয় যেন বহুদিন এখানে ছিল না, তাই মেলাই কাজ জমে গেছে। জমিগুলি যেন প্রতিমুহূর্তে চাষ করা, বীজ বোনার জন্য সশব্দ দাবী জানায়। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওয়াং। এ কয় মাসের আলস্য এবং দৈহিক ও মানসিক পীড়ার ফলে ওর বর্ণে যে পাণ্ডুরতা জেগেছিল রোদে পুড়ে পুড়ে তা আবার গাঢ় পিঙ্গল বর্ণ হয়ে ওঠে। হাতের কড়াগুলো মিলিয়ে গিয়ে জায়গাগুলো নরম হ'য়ে এসেছিল। লাঙ্গল কোদালের ঘষায় সেগুলো আবার শক্ত হ'য়ে গেল।

দুপুর রাতে ঘরে ফিরে ওলান্‌এর রান্না ভাত তরকারী, রসুন আর রুটি পরম তৃপ্তি ভরে খায়। ওয়াং কাছে এলে কমল নাক টিপে সরে যায়। ওয়াং হেসে এক মুখ হাওয়া নিয়ে হুস্ করে ওর মুখের ওপর ছেড়ে দেয়। যা ভালো লাগে তা ও করবে বৈকি! কমলকে তা বরদাস্ত করতে হবেই। ওয়াঙের দেহ-মনের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরেএসেছে। কাজেই এখন সহজভাবেকমলের কাছে যেতে পারে এবং প্রয়োজন মিটিয়ে নিতান্ত সহজভাবে ফিরে এসে কাজে মন দিতে পারে।

ওলান্ এবং কমল দু'জনেই নিজ নিজ স্থানে রইল। কমল তার রমণীয় এবং রমণীয়ত্ব নিয়ে ওয়াঙের ভোগের খেলনা হ'য়ে; আর ওলান্ ওর কর্মের সহচরী, সন্তানের জননী, ওর গৃহিনী, ওর নিজের, ওর সন্তানদের, বৃদ্ধ পিতার অন্নদায়িনী, পালিকা, ধাত্রী।

কমল গাঁয়ের লোকের ঈর্ষ্যার এবং সেই হেতু ওয়াঙের গর্বের বস্তু। অর্থাৎ ও যেন অতিকষ্টে আহৃত কোনো দুর্লভ রত্ন, বা বহুমূল্য কোনো খেলার বস্তু, বা এমনি ধারা একটা কিছু যা বাস্তবিক পক্ষে একেবারে প্রয়োজনের ছাপহীন এবং সাংসারিক পরিভাষায় একবারে 'বাজের' কোঠায়। অথচ আর একদিকে যার মূল্য আছে। অর্থাৎ মানুষ যে কেবল খাওয়া-পরা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজনকেই একমাত্র কাম্য ও অর্থ-ব্যয়ের বিষয় না ক'রে ইচ্ছা ক'রলে আনন্দের জন্য অর্থ-ব্যয় করতে পারে অকাতরে—এরা তারই জীবন্ত সাক্ষ্য।

ওয়াঙের সৌভাগ্য-কীর্তনে ওর কাকাই বেশী মুখর। লোকটা প্রসাদলোভী কুকুরের মত হ'য়ে উঠেছে আজকাল। প্রায়ই আস্ফালন করে বেড়ায়:

'আমার ওয়াং কি যে সে ছেলেরে বাপু। বুঝলে কিনা! মেয়ে মানুষ

রাখবি তো অমনি। যা একখানা ঘরে এনেছে—ওরকম আমরা চাষা ভুষো মানুষ কখনও চোখেই দেখিনি। গিন্নী বলে বড়লোকের বাড়ীর বৌদের মত নাকি খালি সিল্ক আর সাটিনেই মুড়ে রেখে দেয় তাকে। ভাইপোটি আমার কি তোমার-আমার মত মানুষ! দেখছ কি! একবারে জমিদারী গুছিয়ে ফেলেছে! ওর ব্যাটারা হবে জমিদারের ব্যাটা, খেটে আর খেতে হবে না তাদের! পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে।'

ওয়াংকে গ্রামের লোকেরা বড় সম্ভ্রমের চোখে দেখে। তারা ওর সঙ্গে এক ভূমিতে দাঁড়াবার অযোগ্য মনে করে নিজেদের। ধনী ওয়াং ওদের কাছে বহু উচ্চ স্তরের মানুষ। তারা ওয়াঙের কাছে সুদে টাকা ধার চায়, ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ নেয়। জমির সীমানা নিয়ে বিবাদ বাঁধলে ওকে মধ্যস্থ মানে—ওয়াং মীমাংসা ক'রে দেয়। ওয়াঙের বিচার নির্বিচারে সকলে শিরোধার্য করে।

আজকাল এসব নিয়েই ডুবে থাকে ওয়াং। যথা সময়ে বৃষ্টি হয়, গম এসে খামারে ওঠে। দাম না চড়া পর্যন্ত বের করে না, তারপর শীতের সময় বাজারে চালান করে। এবার বড় ছেলেকে ওয়াং সঙ্গে নিয়ে গেল।

ওয়াং পিতার গর্ব নিয়ে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ওর ছেলে…প্রথম ছেলে কত বড় হয়েছে, কাগজের বুকে লেখা ঐসব কেমন গড়গড় ক'রে জোর জোরে পড়ে যায়, আবার নিজেও তুলি টেনে খস খস ক'রে লিখে দেয়। যে কেরাণীরা একদিন ওর অজ্ঞতায় হাসত, তারাই এখন ছেলের লেখা দেখে বলে 'বাঃ চমৎকার হাতের লেখা তো! খাসা ছেলে!' ওয়াং একটুও হাসে না। এমন খাসা ছেলে থাকা যে একেবারে সাধারণ মামুলী কথা এমনি একটা ভাব ওর গাম্ভীর্যে ফুটিয়ে তুলতে চায়। ছেলে যখন আবার অন্যের লেখায় ভুল ধরে, ওয়াং যেন গর্বে ভেতরে ফেটে যায়। পাছে ওর মনের গর্ব চোখে পড়ে সেজন্য তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে কাশতে আরম্ভ করে, আর মেজেতে থুথু ফেলে ছেলের কৃতিত্ব দেখে কর্মচারীরা যখন অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ওয়াং নির্লিপ্ত স্বরে বলে: 'ভুল টুল যা থাকে দে বাপু ঠিক ক'রে, ভুলের মধ্যে যেন আবার সইটা না পড়ে দেখিস্।'

ছেলে তুলি নিয়ে একটানে লেখাটা ঠিক ক'রে দেয়। ওয়াং ভয়ানক অবাক হয়ে দেখে।

তারপর রসিদ বিক্রির চালান প্রভৃতিতে বাবার নাম লেখা হয়ে গেলে ছেলে

বাপ এক সঙ্গে ঘরে ফেরে। পথে আসতে আসতে ওয়াং ভাবে, ছেলে তো সোমত্ত হয়ে উঠছে,—আর এই বড় ছেলে—বাপের কর্তব্য ক'রতে হয় এবার। একটি মেয়ে দেখে বিয়ের কথাটা পাকা ক'রে ফেলতে হয়। ওয়াঙের মত তার ছেলে কে আবার বড়লোকের দুয়ারে ভিক্ষে মেগে, ওদের ফেলা ছড়া, চোষা ছিবড়ে যা পেল এনে বৌ ব'লে ঘরে তুলতে না হয়। গরীব ওয়াঙের অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু ওর ছেলে তো গরীবের ছেলে নয়। তার বাপের তো অতগুলো জমি জমা রয়েছে—ভাগের নয় জোতের নয়, একবারে নিজ খাসের।

সুতরাং ওয়াং মেয়ে খুঁজতে লেগে যায়। কাজটা বড় সহজ নয়। কারণ সাধারণ ঘরের মামুলী মেয়ে ওয়াঙের কিছুতেই মনে ধরে না।

সেদিন মাঝের ঘরে বসে এক সঙ্গে এ মৌসুমের চাষের জন্য কি কি বীজ লাগবে তার হিসেব ক'রতে ক'রতে কথাটা ওয়াং চিংকে বলল। সাহায্যের আশায় বলল, তা নয়। চিং সরল সোজা মানুষ, কুকুরের মত বিশ্বাসী আর প্রভুভক্ত—এমন মানুষের কাছে মন খুলে সুখ আছে। তাই বলল।

ধনী ওয়াঙের সামনে চিং কিছুতেই বসে না। সম্ভ্রমে দাঁড়িয়েই শুনছিল। কথা শেষ হ'তে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বভাব-কুণ্ঠায় চাপা-স্বরে বলল :

'বড় মেয়েটা থাকলে বিনা পনে অমনি তোমার হাতে তুলে দিতাম। তোমার খেয়েই তো বেঁচে আছি।'

ওয়াং ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু মনে কথা চেপে যায়। চিং ভালো লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তার নিজের ব'লতে এক সুতোও মাটি নেই। পরের জমিতে মাইনে খাটে। তার মেয়েকে ওয়াং বৌ করবে না।

আর কাউকে কিছু বলল না ওয়াং। রেঁস্তরায় যায় সেখানে আলাপ আলোচনায় কান পেতে শোনে সহরের কোণ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ের সন্ধান পায় কিনা। নিজের ব্যাপারে খুড়ীর শরণ ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু ছেলের জন্য পাত্রী খোঁজার কথা বলল না। কারণ, ওয়াং ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছে ওসব ব্যাপারেই খুড়ীর হাত পাকা, বিয়ের ঘটকালী তার কর্ম নয়।

তারপর বরফ আর হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়ার মধ্যে নূতন বছরের উৎসব এসে পড়ে। খাওয়া দাওয়া, আসা যাওয়া, দেখা শোনার ধুম প'ড়ে যায়। ওয়াঙের সঙ্গে দেখা ক'রতে মেলাই লোক আসে। খালি নিজের গাঁয়ের লোকই নয়, সহর থেকেও বহু লোক এসে শুভ কামনা জানিয়ে যায়।

ওয়াং সিল্কের পোষাক পরেছে, দু'পাশে দুই যোগ্য ছেলে, তাদেরও

পরণে সিল্কের পোষাক—টেবিলে সাজানো কত রকমের মিষ্টি পিঠে, তরমুজের বীজ, মেওয়া, ঘর দোরে সব জায়গায় লাল রংএর মঙ্গল-পত্রী। চারিদিকেই সৌভাগ্যের চিহ্ন। ওয়াঙের মনের তারে তারে তারি ভরা-সুর বাজে :

তারপর বসন্ত আসে! উইলো গাছের শাখায় শাখায় সবুজের স্বপ্ন জাগে—পীচ্ গাছ গোলাপী কুঁড়িতে ছেয়ে যায়। কিন্তু ওয়াং ভাবী পুত্রবধুর সন্ধান পায় না।

বসন্তের দীর্ঘায়িত আতপ্ত দিনগুলি গ্রাম-চেরীর সুবাসে ভ'রে ওঠে, উইলো গাছে নব পল্লবের জড়িমা ধীরে ধীরে খুলে যায়, গাছে গাছে সবুজের সাগর উথলে ওঠে, ভেজা মাটি আর ফসলের সুগন্ধে বাতাস ভ'রে যায়। ওয়াঙের বড় ছেলেও যেন অকস্মাৎ সীমা ছাপিয়ে যায়। সর্বদা কেমন যেন মেজাজ খিটখিটে, মন ভার, মুখ ভার—বইয়ে মন বসে না, খায় না। ওয়াং ভয় পেয়ে যায়। কি হয়েছে বুঝতে না পেরে ডাক্তারের শরণ নেয়!

কোন রকমেই ছেলেকে শোধরানো যায় না। কেবলি পিঠ চাপড়িয়ে চলতে হয়। নইলে অনর্থ। ওয়াং হয়তি' বলল: 'খাওয়া নিয়ে গোলমাল করোনা, খেয়ে নাও।' কথাও হয়ত পিঠ চাপড়ানোর সুর না হ'য়ে একটু অন্য সুর বাজল, ছেলে অমনি মুখ গোমরা ক'রে জেদ ধরে গুম্ হ'য়ে বসে রইল। আর ওয়াং রাগ করলে তো উপায় নেই—সে অমনি কেঁদে কেটে ঘর থেকে চলে যায়।

ওয়াং এর কোনো খেই পায় না, অবাক হয়ে যায়। তারপর ছেলের পিছনে পেছনে গিয়ে যথাসাধ্য নরম সুরে বোঝাতে বসে: 'ছিঃ বাবা, অমন করে না। বল্‌তো আমাকে কি হ'য়েছে তোর!'

ছেলে কেবলি কাঁদে—আর জোরে জোরে মাথা নাড়ে।

আর এক মুস্কিল হ'ল। সে ভোরে বিছানা থেকে উঠবেও না, ইস্কুলেও পৌছুতে যাবে না। ওয়াঙকে চীৎকার ক'রতে হয় রোজ, ক'খনও মেরেও বসে। মারধর খেয়ে হয়ত' মুখ ভার ক'রে বেরিয়ে যায় কিন্তু ইস্কুলে যায় না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ওয়াং সারাদিন কিছুই টের পায় না। সেদিন রাতে মেজ ছেলে দাদা ইস্কুলে যায় না আর তাকে যেতে হয় এই রাগে নালিশ করে—'দাদা আজ ইস্কুলে যায়নি বাবা।'

ওয়াং রেগে চেঁচামেচি করে: 'টাকাগুলো কি আমি মিছেমিছি জলে ফেলব?'

তারপর একটা বাঁশ নিয়ে ছেলেকে ধরে মারতে আরম্ভ করে। ওলান শুনতে পেয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ওয়াং কিছুতেই থামে না, এদিক ওদিক ঘুরে ওলান্‌কে ঠেলে দিয়ে লাঠি চালায়। মারগুলি সব ওলান্‌এর পিঠে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—যে ছেলে মুখের কথায় কেঁদে ভাসিয়েছে সে আজ ওই বাঁশের ঘা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পিঠ পেতে নেয়! থমথমে বিবর্ণ মুখখানা যেন খোদাই করা পাথরের মুখ! ওয়াং লাং ভেবে কুল পায় না—এ কি? রাত দিন কেবল ঐ কথাই ওর মনে হয়।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা ইস্কুলে না যাবার জন্য ছেলেকে খুব মারল ওয়াং। খাওয়ার পর রাতে বসে ওই কথাই ভাবছিল। ওলান্ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল। ওয়াং বুঝতে পারে ওলান্ কিছু বলতে চায়

'কিছু বলবে?'—ওয়াং জিজ্ঞাসা করে।

'বলছিলাম কি, মিছেমিছি মারধোর করছ। আমি জমিদার বাড়ীতে দেখেছি ছেলেরা সোমত্ত হয়ে উঠলেই অমনি হয়। তারপর হয় তারা নিজেরাই দাসীদের মধ্যে ব্যবস্থা ক'রে নিত, নয়ত, কর্তাই করে দিতেন। দুদিনে সব ঠাণ্ডা।'

'ও সব চলবে টলবে না। আমারও একদিন ঐ বয়স ছিল—কই মনে তো পড়ে না, অমন মেজাজ, অমন ঠোঁট ফোলান, আর মন গুমরাণী কোনোদিন ছিল! মেয়েমানুষও সাতজন্মে দরকার হয়নি।'

ওলান্ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বলে: 'অবশ্যি ওবাড়ীর বাবুদের ছাড়া আর কারো ওরকম হ'তে দেখিনি। এটা কেন বোঝ না তোমায়, খেটে খেতে হয়েছে। কিন্তু ওযে বাবুর মত বসে খায়।'

ওয়াং অবাক হ'য়ে শোনে। তারপর ভেবে দেখে—ওলান্ ঠিক কথাই বলেছে। ও যখন ঐ বয়সের ছিল, মুখ হাঁড়ি ক'রে মন গুমরে থাকার সময় তখন ওর কোথায়? সাত সকালে উঠে তো হাল-বলদ, খুরপী, কোদাল নিয়ে মাঠে গেছে। খাটতে খাটতে পিঠ বেঁকে গেছে। কাঁদলেই বা দেখতে গেছে কে? ওর ছেলে ইস্কুলে পালায়, কিন্তু ওর কি কাজ পালালে রক্ষে ছিল! খাবে কি? কাজেই ওকে খাটতে হয়েছে। সব কথাই ওয়াঙের মনে পড়ে যায়। তুলনা করে দেখে: ওর ছেলে ওর মত নয়। কত নরম,

কত দুর্বল। হবেই তো, ওয়াঙের বাপ ছিল গরীব, আর এর বাপ বড়লোক। ওয়াঙের কত লোক খাটছে ক্ষেতে, ওর ছেলের তো আর গিয়ে হাল ঠেলার দরকার নেই! তাছাড়া লেখা-পড়া শিখে পণ্ডিত হয়েছে ছেলে। তাকে আর নিয়ে হালে জোতা যায় না।

ছেলের গর্বে ওয়াঙের মনটা গোপনে ভরে যায়।

'তা কি করবে বলো!' ওয়াং বলে: 'ছেলের যদি একটু বড়মানুষী ধরণ হ'য়েই থাকে, কি আর করা যায়। কিন্তু তাই বলে আমি দাসী-টাসি জোটাতে পারব না বলে দিচ্ছি। বরঞ্চ বিয়েরই জোগাড় দেখছি।'

ব'লে, উঠে কমলের ঘরে চলে গেল।

তেইশ

কমল লক্ষ্য করে ওয়াং কেমন অন্যমনস্ক। ওর সুন্দর মুখখানা ছাড়া অন্য কি যেন ওর মন জুড়ে আছে। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে:

'আগে যদি জানতাম একটা বছরের মধ্যেই তুমি আমায় অমন হেলা-ফেলা ক'রবে, তাহ'লে কি আর আসি! সেই রেস্তরাঁই আমার ভালো ছিল।' ব'লে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে অপাঙ্গে ওয়াঙের দিকে দেখতে লাগল। ওয়াং হেসে ফেলে কমলের হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের চোখে মুখে বুলায়, হাতখানার সুবাস অনুভব করে। বলে:

'জামার মধ্যে হীরের বোতাম থাকলে মানুষ তো সেই কথাই জপে না সারাক্ষণ; হারালে তবে তখন টনকে নড়ে। বড় খোকা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। ও যেন কেমন হ'য়ে গেছে। বুঝতেই পাচ্ছ কি চায়। বিয়ে হওয়া দরকার, কিন্তু পাত্রী তো পাচ্ছি না। আমাদের এই গাঁয়ের কোনো মেয়ের ওর বিয়ে হয় আমি চাই না। তা ছাড়া, ঠিকও হবে না—কারণ, এখানে সবাই তো একই জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, সবাইর তো ওয়াং-গোত্র। সহরেও তো কাউকে চিনি না। পেশাদার ঘটকীদের কাছে ও যেতে ইচ্ছে করে না। অনেক সময় মেয়ের বাপের টাকা খেয়ে কাণা খোঁড়া মেয়ে চালিয়ে দেয় মাগীরা।'

দীর্ঘছন্দ সুকুমার মূর্তি তরুণ নাং এনের ওপরে কমলের পক্ষপাত ছিল একটু। ওর নাম হতেই কমল একটু সোজা হয়ে বসল। একটু ভেবে বলল:

'ওখানে যখন ছিলাম এক ভদ্রলোক আসত আমার কাছে। প্রায়ই মেয়ের গল্প করত। একেবারে আমার মত নাকি দেখতে। তবে তখন তো খুবই

ছোট ছিল। সেই ভদ্রলোক বলত আমি নাকি এত বেশী তার মেয়ের মত দেখতে যে আমাকে অন্য চোখে সে কিছুতেই দেখতে পারে না। এবং এ জন্য সে যেতো ঐ ধুমসী লাল মুখো 'ডালিম ফুলের' কাছে। অবশ্য ভালো আমাকেই সব চেয়ে বেশী বাসত।'

'লোকটা কেমন, কি করে, জানো কিছু?'

চমৎকার লোক আর কি দরাজ হাত। কোনো জিনিষ দেব বলে ভাঁড়ায়নি কখনও। যেমন মুখ দিয়ে কথা বেরনো অমনি কাজ। আমাদের সকলেরই বড় ভালো লাগত একে। টাকা পয়সা নিয়ে কোনদিনই কাঁইকুঁই করেনি, কোনো মেয়ে পুরো সময় দিতে না পারলে অন্য ব্যাটাদের মত ঠকিয়েছে ঠকিয়েছে বলে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করেনি। আস্তে ক'রে পুরো টাকাটি হাতে তুলে দিয়ে কি সুন্দর ক'রে বলতো 'আচ্ছা তাহলে আমি এখন যাই। তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম ক'রে সুস্থ হয়ে নাও।' কি কথা, কেমন চমৎকার ব্যবহার সকলের সাথে! যেন রাজপুত্র বা কোন খুব বড় বনেদী ঘরের ছেলে!'

ব'লে কমল যেন কি ভাবতে লাগল। কমল আবার তার পুরানো জীবনের স্মৃতির পাঁক ঘাটতে বসে এ ওয়াঙের ভালো লাগল না। ওর চিন্তার খেই ছিঁড়ে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল: 'খুব বড়লোক তাহলে! কি করত জানো?'

ঠিক জানি না,' কমল বলে: 'তবে মনে হচ্ছে যেন গোলাদারী ব্যবসা না কি আছে। কোকিলা ঠিক বলতে পারবে। যতলোক ওখানে আসতো সকলের হাঁড়ির খবর কোকিলা রাখত।' বলেই কমল তালি বাজায়। কোকিলা আগুনের আঁচে লাল চোখমুখ নিয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে। কমল জিজ্ঞাসা করে:

'সেই যে একজন মোটা-পানা ভালোমানুষ মত এক ভদ্রলোক ছিল—, আগে আমার কাছেই আসত, তারপর আমি তার মেয়ের মত ব'লে ডালিম ফুলের কাছে যেতে সুরু করল—। খুব ভালো বাসত আমাকে। তার নামটা কি যেন—তোমার মনে আছে?

'লিউ-র কথা বলছ? সেই যে গোলাদার! কোকিলা জবাব দেয়: 'সত্যি বড় চমৎকার মানুষ। অমন আর হয় না। আমায় দেখলেই, হাতে টাকা গুঁজে দিত।'

ওসব মেয়েলী কথা অতটা গায়ে না মেখে একটু নির্লিপ্ত ভাবেই ওয়াং জিজ্ঞাসা করে: 'থাকে কোনদিকটায়?'

'ষ্টোনব্রিজ রোডে!' কোকিলা বলে।

কোকিলার কথা শেষ না হতেই ওয়াং আনন্দে হাততালি দিয়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

'আরে আমার কাজও তো ঐ পট্টিতেই! এতো খুব ভালো সম্বন্ধ।' এবারে ওয়াঙের আগ্রহ জেগে উঠল। ওরই মাল কেনে এমন লোকের সঙ্গে যদি কুটুম্বিতে হয় সে তো খুব সৌভাগ্যের কথা।

ইঁদুর যেমন চর্বির গন্ধ পায়, কোনো কাজের কথা হ'লেই কোকিলা আগে থাকতে টাকার গন্ধ পায়। তাড়াতাড়ি এপ্রণে হাতটা মুছে নিয়ে বলে: 'বলেন তো দেখতে পারি চেষ্টা ক'রে।'

ওয়াং সন্দিগ্ধ ভাবে কোকিলার ধূর্ত মুখের দিকে তাকায়। কমল খুসি হয়ে বলে: হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো। লিউ তো কোকিলাকে চেনেই,—ওই যাক্। কোকিলা চালাক চতুর আছে, ঠিক কাজ হাসিল ক'রে আসতে পারবে। ভালো ক'রে কাজ ক'রলে ঘটকী বিদায় না হয় ওকেই দেওয়া যাবে।'

গভীর আন্তরিকতার সুর টেনে কোকিলা বলে: 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ঠিক ক'রে দেব, হাতের তেলোতে কতগুলো ঝক্‌ঝকে রূপোর ডলার কল্পনা ক'রে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কোকিলা। এপ্রণটি খুলতে খুলতে খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে: 'আমি এক্ষুণি হয়ে আসিগে। তরকারী পাতি সব কোটা ধোয়া রয়েছে। মাংসও সেদ্ধ হয়ে কষা হযে রয়েছে, খাবার সময় একেবারে গরম গরম রান্না ক'রে দেব।'

কিন্তু ওয়াং তখনও ভালো ক'রে ভেবে দেখেনি, আর তাড়াতাড়ি করারও কিছু নেই। কোকিলাকে ডেকে বলল: 'দেখ, আমি তো এখনও কিছু ঠিক করিনি। কদিন একটু ভালো ক'রে ভেবে নি, তারপর যা হয় তোমায় বলব'খন।'

কমল কোকিলা, দুজনেই এক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। কোকিলা প্রাপ্তির আশায়; আর কমল একটা নূতন কিছু হবে, দুদিন ফূর্তির খোরাক জুটবে, এই আশায়! ওয়াং বলতে বলতে বেরিয়ে গেল: 'তোমরা সবুর কর একটু। ছেলে আমার, আমায় একটু ভাবতে দাও!'

ভাবতে ভাবতে হয়ত' বহুদিন গড়িয়ে যেত। কিন্তু মাঝখানে বিঘ্ন ঘটে ওয়াঙের ভাবনা সূত্র ছিন্ন করে দিল। সেদিন ভোর বেলায় লাং এন্ মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে কোথেকে বাড়ী এল। এর আগে বাড়ীর তৈরী

খুব হাল্কা, জোলো ভাতের মদ ছাড়া আর কখনও খায় নি। এসেই হুমড়ি খেয়ে উঠনে পড়ে গেল। শব্দ শুনে ওয়াং ছুটে এল। এসে দেখে ছেলে উঠনে ধূলোয় পড়ে বমি ক'রছে আর কুকুরের মত বমিতেই গড়াগড়ি ক'রছে।

ওয়াং ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে ওলান্‌কে ডাকল। তারপর দুজনে ধরে ওকে তুলে ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে ওলান্‌এর ঘরে এনে শুইয়ে দিল। শোয়াবার আগেই নাং এন্ ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন মড়ার মত পড়ে রইল। ওয়াঙের একটা কথারও উত্তর দিতে পারল না।

ওয়াং উঠে নাং এন্ আর নাং ওয়েনের শোবার ঘরে গেল। নাং ওয়েন্ হাই তুলতে তুলতে এবং আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বই গোছাচ্ছিল স্কুলে যাবার জন্য। ওয়াং ওকে জিজ্ঞাসা করল: তোর দাদা কাল এখানে শোয়নি?

'না—' অনিচ্ছাসত্ত্বে ওয়েন্ জবাব দেয়। ওয়াং লক্ষ্য করল ছেলের চোখে মুখে ভয়ের ছায়া। কঠোর হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল:

'কোথায় ছিল তবে?'

ওয়েন জবাব দিল না। ওয়াং ওর ঘাড় ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চীৎকার ক'রে উঠল: 'শিগ্‌গির, বল্ পাজী কোথাকার! বল, কোথায় ছিল?'

ওয়েন্ ভয়ে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল: 'দাদা আমাকে বলতে মানা ক'রে দিয়েছে যে! বল্‌লে ছুঁচ পুড়িয়ে ফুটিয়ে দেবে। আর না বললে পয়সা দেবে বলেছে।'

ওয়াং আর রাগ সামলাতে পারে না।

'বল শিগ্‌গির, নইলে খুন করে ফেলব।' গর্জন ক'রে ওঠে।

ওয়েন্ চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, রক্ষা করার কেউ নেই। না বললে বাবা ওর টুটি ছাড়বে না, টিপ্‌তে টিপ্‌তে মেরেই ফেলবে। কাজেই মরীয়া হয়ে বলে ফেলল:

'তিন রাত্তির ধরেই তো দাদা বাড়ী আসে না। কোথায় যায় আমি কি ক'রে জানব? যায় তো কাকার সঙ্গে।'

ওয়াং ছেলের টুটি ছেড়ে একদিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দুম্‌দাম ক'রে পা ফেলে কাকার ঘরে এসে উপস্থিত হল। দেখল কাকার ছেলেরও ওই একই হাল। চোখ মুখ লাল—যেন আগুন বেরুচ্ছে। তবে সে নাং এন্‌এর চাইতে বয়সে বড়; আর এদিকটায় একটু পেকেছেও, কাজেই একটু শক্ত

আছে, অত কাহিল হয় নি। ওকে দেখেই ওয়াং চীৎকার ক'রে উঠল : 'বল্ আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি !'

বেহায়া ছেলেটা ভ্রূকুটি ক'রে জবাব দিল : 'সে কচি খোকা নয়, নিয়ে যাবার দরকার হয় না, নিজেই রাস্তা চেনে।'

ওয়াঙের ইচ্ছা হয় বকাটে মুখটাকে থেঁতলে ভোঁতা ক'রে দেয়। গর্জন ক'রে উঠে : 'কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিল সে ?'

ওয়াঙের গলার স্বরে কাকাব ছেলে ভয় পেয়ে গেল। উদ্ধত চোখ দুটো নীচু ক'রে নেহাৎ অনিচ্ছায় রাগে গডগড ক'রতে ক'রতে জবাব দিল : 'ওই জমিদার বাড়ীতে একটা ঘরে একজন মেয়ে-মানুষ থাকে, তার ওখানে গিয়েছিল।'

কথাটা কানে যেতেই ওয়াঙের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ও বেশ্যাকে চেনে না এমন লোক নেই। নেহাৎ কুলি মজুর ছাড়া ওর কাছে কেউ যায় না, কারণ ওর মরশুম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, কাজেই ওর কাছে সস্তায় বেশীর কারবার। না খেয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে গেল ওয়াং। গেট পেরিয়ে মাঠে এসে পড়ল। একবারও তাকিয়ে দেখল না মাঠে কি ফসল ফলেছে, কেমন ফলেছে ! এরকম ঘটনা ওর জীবনে আজ এই প্রথম। ছেলের চিন্তায় বিধুর ওয়াঙের আজ আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। ওর দৃষ্টি আজ ওর মর্মে নিবিষ্ট। সহরের গেট পেরিয়ে ও সোজা গিয়ে উপস্থিত হ'ল বিলুপ্ত-মহিমা জমিদার বাড়ীর দরজায়।

বিশাল কপাট দুটো সম্পূর্ণ খোলা। লোহার বড় বড় কব্জার ওপর মোচড় দিয়ে কেউ আর এ কপাট বন্ধ করে না। ভদ্রেতর-সাধারণ সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। ওয়াং ভেতরে চলে গেল ! ঘর আর মহলগুলোতে সাধারণ স্তরের মানুষ কিলবিল ক'রছে। এরা সব ভাড়াটে। এক একটা ঘরে এক একটা গোটা পরিবার এঁটে সেঁটে গা ঘেঁসে দিন কাটায়। বাড়ীটা একেবারে নরককুণ্ড হয়ে আছে। বুড়ো পাইন গাছগুলোকে কেটে ফেলা হ'য়েছে—যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারাও মরণ-পথ-যাত্রী। পুকুরগুলি আবর্জনায় প্রায় বুজে এসেছে।

এ-সব কিছুই ওয়াঙের চোখে পড়ল না। বাইরের মহলের উঠনে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ডাকল : 'য়ান্ কার নাম এখানে ?'

তিন পেয়ে একটা টুলে বসে একজন স্ত্রীলোক জুতোর সুকতলী সেলাই

করছিল। সে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে একটা দরজার দিকে দেখিয়ে দিয়ে এমনভাবে নিজের কাজে মন দিল যেন ঐ একই প্রশ্ন বহুবার শুনেছে সে এবং এই শোনাটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট দরজার কাছে যেয়ে ঘা দিতেই একটা খনখনে রুক্ষস্বর ভেতর থেকে জবাব দিল: 'কোন্ মুখপোড়া মরতে এল আবার! যাও যাও এখন আর পারব না, আর গতরে দেবে না। সারারাত পর এই তো সবে একটু বিছানায় গতর ঠেকেয়েছি। আমাদের কি আর ঘুম টুমের দরকার নেই গা?'

ওয়াং কথা কয় না। কেবলি ধাক্কা দেয়। অবশেষে একটা খস্ খস্ শব্দ কাণে আসে! একটি স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দেয়। স্ত্রীলোকটির বয়স নেহাৎ কম নয়, মুখে গভীর ক্লান্তির ছায়া। দু'টি ঝুলে পড়া পুরু ঠোঁট: কপালে সাদা আর গালে-ঠোঁটে লাল রংএর পুরু পালিশ। তখনও ধোয়া হয়নি। ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে মেয়েটি বলল: 'কতবার বলব যে এখন হবে না। ওবেলা যত শিগ্গির চাও এসো। কিন্তু এখন কিছুতেই পারব না! বিরক্ত ক'রো না, এখন ঘুমোতে দাও দিকি!'

মেয়েটার চেহারা দেখেই এবং এখানের এ নরকের মধ্যেই ওর ছেলেটা আসে মনে হ'তেই ওয়াঙের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। মেয়েটার কথার মাঝখানেই কর্কশ ভাবেবলে উঠ্ল; 'আমার কোন দরকার নেই, এসেছি আমার ছেলের জন্য। নইলে এসব জায়গায় আমরা আসি না।' একটা জমাট-বাঁধা কান্না যেন তাল পাকিয়ে ওয়াঙের গলার কাছে উঠতে লাগল।

'তোমার ছেলের কি হ'লো আবার?'

'কাল রাতে সে এখানে ছিল? ওয়াঙের স্বর কাঁপে।

'কত লোকই তো কাল এসেছিল—কে তোমার ছেলে কি ক'রে জানব।'

'একটি ছোট ছেলে, বয়সের আন্দাজে একটু লম্বা বেশী,' ওয়াং মিনতি করে: 'দেখ, দেখ, একটু মনে করতে চেষ্টা কর—দেখতে বড় হয়ে গেছে, কিন্তু বড় কচি বয়স! আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি এ-বয়সেই সে মেয়ে মানুষ ধরবে!'

অনেকক্ষণ ভেবে মেয়েটি বল্ল: 'হ্যাঁ দু'জন এসেছিল। একজন বেশ যোয়ান সোমত্ত গোছের—ঝুনো নারকেলটির মত চেহারা, নাকের ডগাটা

উপরের দিকে উল্টানো। টুপিটা এক কানের দিকে একটু হেলান আর আর একজন, ঐ যেমন বললে—ডাগর ডোগর দেখতে, কিন্তু মুখখানা কচি। ভাব দেখলে মনে হয় যেন বড় হবার জন্য ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ঐতো আমার ছেলে।' ওয়াং অধীর হ'য়ে ওঠে।

'তোমার ছেলে তো বুঝলাম। কিন্তু হ'য়েছে কি বল না।'

ওয়াং ব্যগ্রভাবে বলে: 'আমি বলছিলাম যে, সে যদি আবার আসে, তাকে তুমি তাড়িয়ে দিও। দোহাই তোমার, আসতে দিও না—ব'লো, ছেলেমানুষ তোমার চলে না। বলো, বলো, কথা রাখবে? যদি রাখো, যতবার সে আসবে আর যতবার তুমি তাকে তাড়িয়ে দেবে—তোমার যা দস্তুর তার দুনো আমি গুণে তোমার হাতে তুলে দেব। বলো, রাখবে?'

স্ত্রীলোকটি হেসে উঠলো। হঠাৎ ওর মেজাজ সপ্তম থেকে একেবারে নিখাদে নেমে এল। মোলায়েম স্বরে নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল: 'কাজ না ক'রে পয়সা পেলে কে আর ফেলে? যা বলছ তাই হবে। যা বলেছ—কচি খোকাদের নিয়ে ফূর্তি জমে না।' বলতে বলতে ওয়াঙের দিকে কটাক্ষ হেনে মাথা নাড়ে।

কুৎসিৎ মুখটা ওয়াং আর সহ্য করতে পারে না। ঘৃণায় ওর ন্যক্কার আসে। তাড়াতাড়ি 'আচ্ছা আমি চল্লাম—'বলে হন্ হন্ ক'রে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিল। মেয়েটার কথা মনে হ'তেই ওর সারা গা ঘিন ঘিন করে। সারা পথ থুথু ফেলতে ফেলতে আসে।

সেদিনই এসে কোকিলাকে বলল: 'যাও তো দেখি, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যেয়ে কথাবার্তা কয়ে এসো। মেয়ে পছন্দ হ'লে পণ ভালই দেব—তবে দেখো ওদের দাবীটা যেন খুব বেশী না হয় আবার।'

তারপর এসে ঘুমন্ত ছেলের পাশে বসল। কি সুন্দর শান্ত, ঘুমন্ত মুখখানা! কি কচি; কি সুকুমার! তারপর সেই রংমাখা, পুরু ঠোঁটওয়ালা বীভৎস মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রাগে, ঘৃণায় ওয়াঙের সমস্ত দেহ মন ক্লিষ্ট হতে থাকে।

ওলান্ আসে। ছেলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলের সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। ওলান ভিনিগার আর গরম জল এনে ওর গা মুছিয়ে দিল। ওলান্ দেখেছে জমিদার বাড়ীর তরুণ বাবুদের অমনি হ'ত মদ খেয়ে—অমনি ক'রেই ভিনিগার দিয়ে তাদের গা মোছান হত। ওয়াং বিহ্বল হ'য়ে

তাকিয়ে থাকে—ঐ কচি মুখ। কিন্তু কি গভীর নেশা! এত নাড়া চাড়িতেও ঘুম ভাঙল না। ওয়াং উঠে পড়ে। রাগে জ্বলতে জ্বলতে কাকার ঘরে এসে উপস্থিত হয়। এই লোকটা যে ওরই পিতৃসহোদর, পরম সম্মানের পাত্র একথা ওয়াং ভুলে যায়। ওর হীরের টুকরো ছেলের সর্বনাশ যে সয়তান করেছে, সেই পাষণ্ডের জন্মদাতা এ লোকটা একথাই ওর মনে জেগে থাকে। নিজেকে সামলাতে পারে না, চীৎকার ক'রে ওঠে: সাপ! দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছি। আমার খাচ্ছ আর আমাকেই ছোবল মারছ।'

টেবিলের ওপর ঝুকে পড়ে কাকা তখন প্রাতরাশ নিয়ে ব্যস্ত। কাজকর্ম নেই, দুপুর পর্যন্ত ঐ খানেই বসে থাকে বৃদ্ধ। ওয়াঙের কথা শুনে অলস নির্লিপ্ত ভাবে বলল: 'কি হলো রে?'

ওয়াং লাং কোনরকমে সব কথা বলে ফেলে। ওর যেন দম আটকে আসে। কাকা শুনে একটু হেসে বলল: 'ছেলে কি চিরকাল মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাবে? বড় হবে না? দেখিসনি—কুকুরের বাচ্চা ধাড়ী হলেই মাদী দেখলেই পেছু নেয়!'

কাকার ওই হাসিটি কাণে যেতেই, একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের মধ্যে বহু পুরাণো স্মৃতি ওয়াঙের মনে ভিড় ক'রে এল। এই কাকার জন্য কত দুর্ভোগই না ওকে ভুগতে হয়েছে। ওকে দিয়ে জমিগুলো বেচবার জন্য কত ফিকির করল সে বছর।...কিছু করবে না, তিনজনে মিলে কেবল খেয়ে খেয়ে ফুল্‌বে। কমলের জন্য ও অত খরচ ক'রে ভালো খাবার আনে। ঐ ধুম্‌সী বুড়ী খেয়ে সবই উজাড় করে। আবার এখন এই বুড়োর গুণধর ছেলে ওর ছেলেটার মাথা খেতে বসেছে। ওয়াং রাগে ঠোঁট কামড়ে জিভ কামড়ে বলে:

'আর না—খুব হয়েছে। এখন পথ দেখ সবাই। আজ থেকে তোমাদের এখানকার অন্নজল উঠল। তোমাদের মত লোকদের বাড়ীতে জায়গা দেবার চাইতে বরং বাড়ী জালিয়ে দেব। যত নিমক-হারামের দল!'

নির্বিকার চিত্তে কাকা খেয়েই চলে। ওয়াঙের কথায় কোন ভ্রুক্ষেপই নাই। ওয়াং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফোলে। অবশেষে আর সহ্য ক'রতে না পেরে হাত তুলে এগিয়ে আসে। এবারে কাকা মাথাটা একটু তুলে বলে:

'তাড়া দেখি কেমন মুরোদ!'

ওয়াং গর্জে উঠল: 'হ্যাঁ, তাড়াবই তো—কি করবে?—'

কথা শেষ হবার আগেই কাকা কোট খুলে লাইনিংএর তালাটা খুলে ধরে।

লাল দাড়ি একটা, আর একখণ্ড লাল কাপড় !!

ওয়াং লাং যেন পাথর হয়ে গেল। নিমেষে ওর রাগ একেবারে জল। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। ওর মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

লাল দাড়ি, লাল কাপড় ডাকাত দলের চিহ্ন!

এরা কত যে ঘর জ্বালিয়েছে এ অঞ্চলের; পুরুষদের দরজার সাথে বেঁধে রেখে মেয়েদের নিয়ে গেছে পরের দিন দেখা গেছে বাঁধা অবস্থায় লোকগুলো হয় উন্মাদ হয়ে প্রলাপ বকছে, নয়ত' তাদের মৃতদেহ ঝুলছে—ঝলসান, পোড়ান—যেন অল্প আঁচে বেশ ক'রে রোষ্ট করা।

ওয়াঙের চোখে যেন কোটর হ'তে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়। একটি কথা না বলে নিঃশব্দে ওয়াং ফিরে আসে। কাকা আবার ভাতের বাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে। আসতে আসতে কাকার চাপা হাসি ওয়াঙের কানে এসে বেঁধে।

ওয়াঙের যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জালে জড়িয়ে পড়ল। এমনটা হবে ও ভাবতেও পারেনি। কাকা ঠিক তেমনি আছে। খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ির ফাঁকে দাঁত বের করা হাসি; সেই এলোমেলো ছেঁড়া ময়লা কাপড় কোন মতে দেহের সঙ্গে জড়ান। ওকে দেখলেই ওয়াঙের রক্ত যেন হিম হয়ে জমে যায়। নেহাৎ দরকার হলে দুএকটা কথা অতি বিনীতভাবে বলা ছাড়া আর কথা বলতে ওয়াঙের সাহস হয় না। কে জানে ভয়ঙ্কর লোকটা কি ক'রে বসে। কিন্তু সুদিনে দুদিনে কোন সময়েই ওয়াঙের বাড়িতে একদিনও ডাকাত পড়েনি এ কথা ঠিক। এক এক সময়ে, কিভাবে দিন গেছে। কমলের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত ও একেবারে সাদামাটা পোষাক পরেছে, বেশে-বাসে কিছুতে ঐশ্চর্যের কোন চিহ্ন রাখেনি। অতি সাবধানে পরিহার ক'রে চলেছে। পাড়া পড়শীদের কাছে ডাকাতের গল্প যেদিন শুনেছে রাতে ওর ঘুম হয়নি। সামান্য শব্দে ও জেগে উঠেছে। কিন্তু কোনদিন ডাকাত পড়েনি।

ক্রমে ওয়াঙের ভয় চলে যায়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়—ওঃকে রক্ষা ক'রেছেন দেবতারা—ওর এত ধন সেও দেবতারই দান। দেবতাদের সম্বন্ধেও ধীরে ধীরে ও উদাসীন হয়ে ওঠে। বিনা সাধনায় দেবতার প্রসন্নতা পেয়ে পেয়ে একটু ধূপ, একটা দীপ ঠাকুরের সামনে দেবার কথাও ওয়াং ভুলে যায়। সব ভুলে নিজের বিষয় চিন্তায় ও ডুবে গেল। আজ এসব কথা মনে হ'তে

ওর বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে—দর দর ক'রে শীতল ঘাম ঝরতে থাকে। আজ ও বোঝে কার দক্ষিণ হস্ত ওকে এতদিন রক্ষা ক'রেছে। কাকার জামার মধ্যে লুকানো যা দেখেছে কাউকে বলতে সাহস হয় না কথা।

কাকাকে বাড়ী থেকে চলে যাবার কথা আর বলে না। কোথায় জোর ক'রে আগ্রহের সুর মাখিয়ে খুড়ীকে বলে: 'ও ঘরে গিয়ে দুটো ভাল মন্দ মুখে দিও খুড়ী।' হাতে মাঝে মাঝে টাকাও গুঁজে দেয়, বলে: হাত খরচ ক'রো, রেখে দাও।'

কাকার ছেলের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলে: 'তোদের যোয়ান বয়েসে, এ দিকে ওদিকে খরচ ক'রতে লাগে তো, ধর টাকা কটা।' বলতে গিয়ে ওয়াঙের গলার স্বর যেন বন্ধ হ'য়ে যায়—তাল পাকিয়ে গলার কাছে কি যেন উঠতে থাকে!

কিন্তু নিজের ছেলেকে অতি সাবধানে চোখে চোখে রাখে। সন্ধ্যার পর কোনো কারণেই বাড়ী থেকে বেরুতে দেয় না। সে রাগে চীৎকার ক'রে হাত পা ছুঁড়ে ছোট ভাই বোনদের মেরে ধরে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসে। চারিদিকে ওয়াঙের আর ঝঞ্ঝাটের অন্ত থাকে না।

নানা ঝঞ্ঝাটে, দুশ্চিন্তায় ওয়াং প্রথমটা কাজে একেবারেই মন বসাতে পারে না। একবার ভাবে দিই কাকাকে দূর ক'রে। তারপর সহরে চলে যাই। চারদিকে উঁচু পাঁচিল—রাত্তিরে গেট থাকে বন্ধ। কি ক'রবে ডাকাতে? তারপর মনে হয়, না—তাহলে তো রোজ অতটা দূর হেঁটে ক্ষেতে আসতে হবে। তারপর ক্ষেতে কাজ করবার সময় যদি কিছু হয়? তখন তো আর কেউ কাছে থাকবে না। কিন্তু তাহলে তো জমি-জমা ছেড়ে ওকে সহরেই গিয়ে ঘরে রাতদিন হুড়কো এটে বসে থাকতে হবে। সে পারবে না ওয়াং—ক্ষেত জমি ছেড়ে ও বাঁচবে না। তা ছাড়া আকাল দুর্দিনও রয়েছে। আর সহরেই কি রেহাই আছে। জমিদার বাড়ীতেই তো কতবার ডাকাত পড়ল। পাঁচিল আর গেট পারল ডাকাত আটকাতে? আর এক কাজ অবিশ্যি করা যায়, ওয়াং আবার ভাবে। সহরে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলে আসি যে আমার কাকা লালদেড়েদের দলের লোক। কিন্তু ওকে কে বিশ্বাস করবে? আপন কাকা—বাপের সাক্ষাৎ ভাই, তার সম্বন্ধে যে অমন সর্বনেশে কথা বলতে পারে তাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। মাঝে থেকে গুরুজনকে অসম্মান করবার জন্য ও-ই মার

খেয়ে মরবে কাকার—কিছুই হবে না। আর ডাকাতরা পেলে তো আর কথাই নাই, জান নিয়ে শোধ তুলে ছাড়বে।

ওদিকে আর এক মুস্কিল হ'ল। কোকিলা ফিরে এসে জানাল লিউএর সঙ্গে কথাবার্তা একরকম ভালোয় ভালোয় হ'য়ে গেছে। কিন্তু তার মেয়ে বড় ছোট, সবে এই চৌদ্দ বছর মাত্র বয়েস। কাজেই তার ইচ্ছে নয় যে বিয়ে এখন হয়। কথা পাকা পাকি হ'য়ে থাক, বিয়ে বছর তিনেক পরে হবে। ওয়াং লাং বসে পড়ল—আরো তিন তিনটে বছর ছেলের ঐ মেজাজ সইতে হবে! কিছু করবেও না হতভাগা ছেলে—দশদিনের মধ্যে দুটো দিনও যদি স্কুলে যায়। হাত পা খুঁটে বসে থাকবে আর কোঁস কোঁস্ করবে!

রাতে খেতে বসে ওলান্‌কে বলল:

'দেখ, সব কটা ছেলের পাত্রী ঠিক ক'রে ফেলি যত শিগ্‌গির পারি। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। যেই বড় হয়ে উঠে একটু আনচান আরম্ভ করবে, অমনি বিয়ে দিয়ে ফেলব। বাস্ নইলে আরো তিনবার এরকম আদিখ্যেতা দেখতে হবে।'

রাতে ওয়াঙের ভালো ঘুম হ'ল না। ভোরে উঠেই সখের লম্বা আচকান খুলে ফেলে দিল—জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিল আর একদিকে। কোদাল হাতে নিয়ে চলল মাঠের দিকে। তারপর সংসারে অশান্তি হ'লে ও যা ক'রে থাকে—সদর দিয়ে যাবার সময় দেখল বড় খুকী বসে বসে ন্যাকড়ার ফালি নিয়ে খেলা করছে আর আপন মনে হাসছে। ওয়াং মনে মনে বলল: 'এ মেয়েটাই আমার সব জ্বালার শান্তি।

এর পর কদিন রোজই ওয়াং লাং মাঠে গিয়ে নিয়মিত কাজ করল। আবার মাটি আর রোদে মিলে ওর সব ক্লেশ হরণ করে নিল। গ্রীষ্মের উষ্ণ বায়ু ওর সর্বাঙ্গে মেখে দিল স্নিগ্ধ শান্তি।

সেদিন দক্ষিণ দিক হতে ছোট একখানি হালকা মেঘের টুকরো আকাশের প্রান্তে দেখা দিল। বুঝি ওর সব জ্বালা, সব অশান্তির মূলোচ্ছেদ করবার জন্যই প্রথমে মেঘটা খানিকটা কোয়াসার মত দিগন্তের প্রান্তে ঝুলে রইল স্থির হ'য়ে। এমনি তো মেঘ বাতাসে ভেসে যায় কিন্তু এ মেঘখানা একটুও নড়ল না। তারপর গোটান পাখা যেমন ক'রে খুলে যায় তেমনি ক'রে হঠাৎ সারা আকাশে ছড়িয়ে গেল।

গ্রামবাসীরা দেখে, অবাক হয়ে আলোচনা করে। আতঙ্কের ছায়া পড়ে

সকলের মুখে। পঙ্গপাল নয়তো? তাহ'লে তো সর্বনাশ! মাঠে একটা ঘাসও থাকবে না! ওয়াং ও দাঁড়িয়ে দেখছিল। ঝট্‌কা বাতাসে হঠাৎ কি যেন একটা উড়ে এসে ওদের পায়ের কাছে পড়ল। একজন তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে কুড়িয়ে নিল—

একটা মরা পঙ্গপাল··।

ওয়াং সব ভুলে গেল। কালকের কত দুশ্চিন্তা,—ওলান্‌-কমল-খুড়ী-ছেলে-খুকী-কাকা, সব ভুলে গেল।

ভীত শঙ্কিত গ্রামবাসীদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার ক'রে সকলকে বলতে লাগল: 'ভয় নাই, চল সব মাঠে চল। আকাশের ঐ শত্রুর সঙ্গে লড়্‌তে হবে।' কয়েকজন প্রথম থেকেই নিরাশ হ'য়ে বসে পড়েছিল। তারা মাথা নেড়ে বলে: 'মিথ্যে চেষ্টা ভাই! এবার আমাদের না খাইয়ে মারাই ঠাকুরের ইচ্ছে। উপোস ক'রে মরতেই যখন হবে, তখন এখন থেকেই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়ে শক্তি ক্ষয় করবে কেন?'

স্ত্রীলোকেরা কাঁদতে কাঁদতে সহরে গেল গাঁয়ের ছোট মন্দিরে ক্ষেত্র-দেবতাদের পূজো দেবার জন্য ধূপ-ধুনো কিনতে। কেউ কেউ গিয়ে সহরের বড় মন্দিরের স্বর্গের দেবতার ঠাঁই ধন্না দিল। গাঁয়ে আর সহরে, পৃথিবীর আর স্বর্গের দেবতাদের প্রসন্নতা লাভের সাধনা চলতে লাগল।

কিন্তু দেবতা শুনলেন না। পঙ্গপাল এল পালে পালে। আকাশ ছেয়ে গেল, ক্ষেতগুলির ওপর বায়ুমণ্ডল ছেয়ে গেল।

ওয়াং তার নিজের কিষাণ জন-মজুরদের ডেকে নিল। চিং আদেশের প্রতীক্ষায় নীরবে এসে পাশে দাঁড়াল। অন্যান্য চাষীরাও এল। মাঠ আলো করা গমের রাশ—প্রায় পেকে এসেছে। নিজহাতে ওরা আগুন ধরিয়ে দেয়। মাঠের চারিদিকে বড় বড় নালা কেটে কূয়ো থেকে জল তুলে এনে ভরে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, ওদের হাত পা দেহ চলতেই লাগল। ওলান্‌ খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল। কিষাণদের বৌরা তাদের স্বামীদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। দিন রাত অবিরত পরিশ্রম ক'রে ক'রে ওদের তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পশুর ক্ষুধা নিয়ে গোগ্রাসে ওরা গেলে।

তারপর আকাশ একেবারে কালো হয়ে গেল। কোটি কোটি উড়ন্ত কীটের ডানার শব্দ—একটা একটানা চাপা গভীর মহাগর্জনে বাতাস ভরে গেল। পঙ্গপালের দল নীচে নেমে আসে, কোনো ক্ষেতের ওপর দিয়ে চ'লে যায়,

আবার কোন ক্ষেতে নেমে সব নিঃশেষ ক'রে খেয়ে ধূসর শূন্যতা রেখে চলে যায়। সকলে কাঁদে, বুক চাপড়িয়ে ভাগ্যের দোহাই দেয়। কিন্তু এক ওয়াং লাঙ যেন দশ হয়ে ওঠে। ও যেন ক্ষেপে যায়, একটা হিংস্রতায় ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠে। পঙ্গপাল গুলিকে বাঁশ দিয়ে আঘাত ক'রে ক'রে মাটিতে ফেলে, তারপর দুই পায়ে মাড়িয়ে মারে। ওর লোকজনরা শস্য মাড়াই করার মাড়ানী দিয়ে শূন্যে আঘাত করে। দলে দলে পঙ্গপাল নীচে পড়ে। কতক পড়ে আগুনে, কতক নালার জলে। মরে কোটি কোটি—কিন্তু যা বেঁচে রইল তার কাছে মৃতের সংখ্যা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

ওয়াঙের প্রাণপণ সংগ্রাম বৃথা গেল না। ওর সব চাইতে ভালো ক্ষেত গুলি বেঁচে গেল। কালো মেঘটা আকাশের বুক থেকে সরে গেলে তবে ওরা হাঁফ ছাড়ার অবসর পায়। ওয়াঙের গম কিছু বেঁচেছে, কেটে ঘরে তোলা যাবে। ধানের চারাগুলোও বেঁচেছে। তৃপ্তিতে ওয়াঙের মন ভরে গেল। অনেকে আগুনে ঝলসানো পঙ্গপাল নিয়ে গেল। ওয়াং খেতে পারল না—এই বীভৎস প্রাণীগুলো ওর সোনা-ফলা ক্ষেত গুলোর যে সর্বনাশ ক'রে গেল, কি ক'রে ওয়াং ওগুলো মুখে তুলবে! ওলান্ কতক গুলো নিয়ে গিয়ে তেলে ভাজল—কিষাণেরা কুর্মুর্ ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে খেল, ছেলেরা খেল বীভৎস বড় চোখগুলো দেখে ভয় ক'রতে ক'রতে। ওয়াং কাউকে কিছু বলল না, শুধু নিজে খেল না।

যাইহোক পঙ্গপাল ওয়াঙের একটা উপকার করে দিয়ে গেল। সাতদিন ওয়াং আর কিছু ভাবল না, কেবল ওর জমির কথা ভাবল। ওর যত অশান্তি, যত ভয়, যত ব্যথা, সব হাওয়ায় উড়ে মন একেবারে নিরাময় হয়ে গেল। অতি শান্ত, ধীরভাবে মনকে ও বলতে পারল এখন :

দুঃখ কষ্ট কার জীবনে না আসে! ওরও এসেছে, আরো আসবে। সব সয়ে, মানিয়েই চলতে হবে। কাকা বুড়ো হয়েছে, কদিনই বা আর বাঁচবে। ছেলের বিয়ে? থাকনা তিনটে বছর, ওরা যেমন চায়। ও দেখতে দেখতে চলে যাবে। কেন অমন ভেবে ভেবে আত্মহত্যা করব!

গম কাটা হল। বৃষ্টি হ'তে, প্লাবিত ক্ষেতে ধানের চারা তুলে লাগিয়ে দিল। দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম এসে গেল!

চব্বিশ

কয়েকদিন পরে একদিন দুপুরবেলা ওয়াং মাঠ থেকে আসতেই বড় ছেলে নাং এন্ বলল :

'বাবা ভাল ক'রে লেখা-পড়া শিখতে হ'লে তো আর এ বুড়োর কাছে চলছে না।'

রান্না ঘর থেকে একটা পাত্র ক'রে খানিকটা গরম জল এনে সবে ওয়াং তোয়ালেটা তাতে ডুবিয়েছিল। ভেজা তোয়ালেটা মুখের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করল : 'কি বলছিস?'

নাং একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল ; 'ভালো ক'রে লেখাপড়া শিখতে হ'লে আমার ইচ্ছে দক্ষিণে গিয়ে কোনো বড় স্কুলে পড়ি, এখানে তো আর হচ্ছে না।'

ভেজা তোয়ালে দিয়ে ওয়াং চোখ মুখ কান ঘাড় মুছে নিল। মুখ হ'তে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মাথা খারাপ হয়েছে তোর?' ওয়াং বলে। দেহটা বড় ক্লান্ত—স্বরটাও তাই পরুষ হয়ে গেল। 'যাওয়া টাওয়া হবে না কোথাও, এই বলে দিলাম। যা শিখেছিস্ ঢের হয়েছে। ওতেই এখানে বেশ চলে যাবে। যা এখন, আর বিরক্তি করিস না।'

ওয়াং আর একবার তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়ে নিল। নাং এন্এর চোখ তার বাবার দিকে—দৃষ্টিতে ঘৃণা। নিজের মনে অস্পষ্টভাবে কি যেন বলল। ওয়াং বুঝতে না পেরে চটে গিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল :

'যা বলতে চাস্, পরিষ্কার ক'রে বল।'

ছেলেও জলে উঠে বলল :

'যাবই আমি। কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকব না, সারাদিন কচি খোকার মত নজর-বন্দী হ'য়ে আমি থাকতে পারব না। আর এটা সহর তো ভারী, এর চাইতে গাঁ ভালো। তোমাকে বলে দিলাম আমি যাবই। ভূতের মত কোণে পড়ে থাকব না। আমি দেখে শুনে শিখতে চাই।'

ওয়াং একবার ছেলের দিকে, একবার নিজের দিকে চায়। ছেলের পরনে ফিকে গ্রে রংএর মিহি কাপড়ের লম্বা আচ্কান। তার ওপরের ওষ্ঠের ওপরকার মিহি কালো রেখায় নব যৌবনের লেখা। সুমসৃণ দেহের বর্ণে কাঞ্চনের কান্তি। আস্তিনের বাইরে বেরিয়ে থাকা হাত দু'খানা গড়নে সৌষ্ঠবে একেবারে নারীর

হাত। ওয়াং নিজের দিকে চোখ ফেরায়—শক্ত বলিষ্ঠ চওড়া চওড়া গড়ন—সর্বাঙ্গে মাটির ছাপ। বেশের মধ্যে—হাঁটু পর্যন্ত লম্বা মোটা নীল কাপড়ের তৈরী পাজামা। কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গে আর কোন আবরণ নেই। ওকে দেখলে কে বলবে ঐ ছেলে ওর। বরঞ্চ ওকে ঐ সুঠাম সুদর্শন যুবকের ভৃত্য বলেই বেশী মনে হবে।

ছেলের সুঠাম সুদর্শন মূর্তির ওপর ওয়াঙের কেমন একটা ঘৃণা হয়। এবং ঘৃণায় ওয়াংকে নির্মম ক'রে তোলে।

'যা দেখি একবার মাঠে। বেশ ক'রে গায়ে মাথায় মাটি মেখে আয়। নইলে' উগ্রস্বরে ওয়াং চীৎকার করে: 'ঐ চেহারায় লোকে মেয়েমানুষ ঠাওরাবে। আর ভাত যে গিলছিস, বলি, সে ভাত আসে কোত্থেকে! খেতে হলে গতর খাটাতে হয়।'

ছেলে কত বড় পণ্ডিত, কেমন সহজে কালি তুলি দিয়ে কাগজের ওপর লেখা টেনে যায়, এ যে একদিন ওয়াঙের গর্বের বস্তু ছিল, আজ তা একবারে ভুলে গেল। আজ গর্বের স্থানে ছেলের তরুণ সুকুমার মূর্তির প্রতি একটা দ্বেষ এবং সেই দ্বেষের অভিব্যক্তি অসংযত ক্রোধে। হাত পা ছুঁড়ে দুমদাম ক'রে পা ফেলে মেঝেতে কুৎসিত ভাবে থুথু ফেলতে ফেলতে ওয়াং চলে গেল।

ছেলে তীব্র ঘৃণায় চেয়ে রইল! ওয়াং আর একবার ফিরে চাইল না।

রাতে ওয়াং যখন ঘরে এল কমল কথায় কথায় যেন অতি তুচ্ছ কথা এমনি ভাবে বলল: 'তোমার বড় ছেলে যে কোথাও যাবার জন্ম অস্থির হয়ে উঠেছে।'

ছেলের ওপর আবার নূতন ক'রে রাগ হয়। রুক্ষ ভাবে ওয়াং জবাব দেয়: 'তোমার তাতে মাথা ব্যথা কেন; সে বুঝি এখনই এখানে আনাগোনা শুরু করেছে; নইলে তুমি জানলে কি ক'রে?'

কমল প্রায় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয়; 'না, না, আমি কিছু বলিনি। কোকিলা বলছিল কিনা!'

কোকিলা দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল। সেও ক্ষিপ্রভাবে জবাব দিল:

'সকলেরই চোখ আছে গো। সকলেই দেখতে পায়। ছেলের চেহারা আছে, উঠতি বয়েস। এখন সে চুপচাপ হাত-পা কামড়ে বসে থাকতে পারে কখনও?'

এ কথায় ওয়াং দমে গেল। কোন জবাব খুঁজে পেলনা। কিন্তু ছেলের ওপর রাগও রয়েছে তখনও।

'না, কিছুতেই যাওয়া হবে না। খামখা কতগুলো টাকা আমি জলে ফেলব না।' ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে ওয়াং চুপ ক'রে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল এ বিষয়ে সে আর কোন আলোচনা ক'রতে নারাজ। কমল দেখল ওয়াঙের মেজাজটা আজ বিগড়ে আছে। তাই কোকিলাকে ঘর থেকে পাঠিয়ে দিল।

এর পর বহুদিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠল না। ওয়াং লক্ষ্য করে, নাং এন্‌এর মেজাজটা হঠাৎ খুসি হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু স্কুলে যেতে কিছুতেই রাজী নয়। ওয়াংও এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করে না, ছোট তো আর নেই। আঠারো বছরের ছেলে। মায়ের মতই চওড়া কাঠামো হয়েছে—বেশ বড় সড় হয়ে উঠেছে। ওয়াং যখনই বাড়ী আসে দেখতে পায় ছেলে নিজের ঘরে বসে পড়ছে! ও খুব খুসি হয়, ভাবে: সব দুদিনের ছেলেমানুষী খেয়াল। দুদিনেই ব্যস্ পরিষ্কার। ওদের কি দরকার তাকি ওরা নিজেরা বোঝে! থাক্—তিনটে তো মোটে বছর। কিছু টাকা খসালে, তিন বছরই কমে দু'বছর হয়ে যাবে। আর একটু হাত খুললে, চাই কি, হয়তো এক বছরেই নেমে যাবে। ফসল টসল কাটা হ'য়ে গেলে শীতের গম বুনে তারপর যা হয় কিছু একটা করা যাবে'খন।

পঙ্গপালে নষ্ট করার পরও ফসল যা পাওয়া গেল বেশ ভালোই। ওয়াং কাজের ভিড়ে ছেলের কথা ভুলে গেল। কমলের পেছনে যা খরচ হয়েছিল একমাসে সব উঠে যায়। আর একবার অর্থ ওয়াঙের কাছে পরমার্থ হয়ে ওঠে। ওযে কেমন ক'রে একটা স্ত্রীলোকের পেছনে জলের মত অত টাকা খরচ ক'রতে পেরেছে ভেবে ও নিজেই এক এক সময় অবাক হয়ে যায় এখন।

এখনও মাঝে মাঝে কমল ওয়াঙের মনটাকে নাড়া দেয়। তবে আগের সে তীব্রতা আর নেই। কিন্তু সম্পত্তি হিসেবে কমল ওয়াঙের গর্বের বস্তু। খুড়ী যা বলেছিল তা ঠিকই, দেখতে ছোটখাট হলেও কমলের বয়স খুব কম না—যে বয়েসকে যৌবন বলে, সে বয়স নেই কমলের। মাতৃত্ব-গৌরবেও কমল বঞ্চিতা। কিন্তু এর জন্য ওয়াঙের বিশেষ আফশোষ নেই কারণ ভগবানের কৃপায় ওর ছেলে মেয়ের দুঃখ নেই। সুতরাং থাক না কমল—ওর 'ভালো লাগার' উৎস হয়েই থাক।

বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কমল যেন আরো লাবণ্যে ভরে উঠেছে। আগে ও বড় কৃশ ছিল, অঙ্গ-ভরা সৌন্দর্যের মধ্যে ওই একটু ত্রুটি ছিল।

অতটা কৃশতার দরুণ মুখখানায় হাড়ের স্থানগুলি ছিল তাক্ষ্ন রেখায় বড় প্রকট ; গাল দুটিও বেশ একটু চাপা ছিল। এখন কোকিলার রান্না ও নানা রকম উপাদেয় খাদ্যের গুণে এবং বহু-পরিচর্যার বদলে এক-পরিচর্যার নিয়ন্ত্রিত জীবনের ফলে কমল এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল হ'য়ে উঠেছে। মুখখানাও বেশ ভ'রে বর্ণ চিক্কণ হ'য়ে উঠেছে। বড় বড় চোখ, ছোট এতটুকু মুখ, সব নিয়ে ওকে আরো বেশী ক'রে মোটা সোটা বেড়ালের মত দেখায়। খেয়ে ঘুমিয়ে দেহটি ক্রমেই সুপুষ্ট হ'য়ে ওঠে, এবং তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ-জীবনের একটা লালিত্য ওর কোমল দেহের মসৃণ কান্তিতে ফুটে ওঠে। কমলের কুঁড়িটি এখন না হলেও কমল ঝরা ফুল নয়—পূর্ণ-বিকশিত সহস্র দল। তরুণী না হলেও বৃদ্ধা নয় কমল। ওর বর্তমান বয়ঃসন্ধিক্ষণ থেকে যৌবন এবং বার্ধক্য সমদূরে।

সংসারে এখন আর কোনো অশান্তি, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। ছেলেও বেশ শান্ত সুস্থভাবেই আছে, কোন গোলমাল নেই। কিন্তু তবুও শান্তি ওয়াঙের কপালে লেখা নেই। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ব'সে ওয়াং কড় গুণে গুণে হিসেব করছিল গম কতটা বেচবে আর চাল কতটা বেচবে। এমন সময় ধীরে ধীরে ওলান্ ঘরে এল! এক বছরে বড় রোগা হয়ে গেছে ওলান্। চোখ কোথায় বসে গেছে, মোটা মোটা হাড়গুলি সব মাথাটা উঁচিয়ে আছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে খালি বলে : 'কি জানি আমার ভেতরটা যেন জ্ব'লে যায়।'

তিন বছর ধরে পেটটি ফুলে আছে—দেখলে মনে হয় অন্তঃস্বত্বা। কিন্তু চিরকালের মত একই ভাবে ভোর না হতেই উঠে ও কাজ করে। ওর দিকে তাকিয়ে দেখার বড় একটা প্রয়োজন হয় না ওয়াঙের—যেমন হয় না ঘরে যে টেবিলটা রয়েছে, চেয়ার রয়েছে, আঙ্গিনায় গাছটা রয়েছে এসবের দিকে। বলদটা যদি একদিন ঝিমিয়ে বসে থাকে, বা শূয়োরটা যদি একদিন না খায় তবে তার জন্য যতটুকু ব্যাকুল হবার প্রয়োজন হয়, ওলান্ এর জন্য সে প্রয়োজনও হয় না। কাজেই ওলান্ একা একা কাজ করে; কথা কয়না অর্থাৎ যতটুকু কথা না বললে নয়, তার বেশী কয়না। কোকিলার সঙ্গে একেবারেই নয়। কমলের ওদিকে ওলান্ যায় না। কমল যদি কখনও তার উঠনের সীমানা ছেড়ে এদিকে ওদিকে যায় ওলান্ গিয়ে ঘরে বসে। যতক্ষণ না কেউ এসে সংবাদ দেয় যে সে ভেতরে চলে গেছে ততক্ষণ বাইরে

বেরয় না। বোবা ওলান্ নীরবে রান্না করে, নীরবে পুকুরঘাটে গিয়ে কাপড় বাসন ধোয়। শীতের সময় যখন জল জমে বরফ হ'য়ে যায় তখনও। ওয়াঙের কখনও মনে হয়নি যে বলে: একটা ঝি চাকর রাখোনা কেন? পয়সার তো অভাব নেই। চাষের কাজের জন্য গরু, গাধা, শুয়োরগুলোর দেখাশোনার জন্য, গরমের সময় যখন নদীতে জল বাড়ে তখন হাঁস মুরগী পালার জন্য, নিত্য নূতন লোক রাখে ওয়াং, কিন্তু ওলান্‌কে ও-কথাটা বলার প্রয়োজন-বোধ তার হয়নি।

ধীরে ধীরে ওলান্ এল। ওয়াঙের সামনে টেবিলের ওপর শামাদানে লাল মোমবাতি জ্বলছিল। ওলান্ এসে সামনে দাঁড়ায়, খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেক ইতঃস্তত: ক'রে বলে: 'একটা কথা বলব?' ওয়াং অবাক্ হ'য়ে তাকায়। 'বলোনা, কি বলবে। বলো।' ওয়াং পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ওলান্‌এর দিকে, ওর গালের গর্তের মধ্যে থাব্‌লা থাব্‌লা জমাট-বাঁধা অন্ধকারের দিকে, মনে প'ড়ে যায় কুরূপা ওলান্‌কে কতদিন—কতদিন ও ওর অন্তরঙ্গ জীবনের পরিসীমা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

'তুমি যখন বাড়ী থাকো না,' চাপা কিন্তু অত্যন্ত প্রখর স্বরে ওলান্ বলে: 'বড়খোকা ওবাড়ী যায়।'

ওলান্‌এর কথার অর্থ ওয়াং প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না ওর মুখটা হাঁ হ'য়ে গেল! সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল:

'কি বললে?'

নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে প্রথমে ছেলের ঘরের দিকে, তারপর শুকনো ঠোঁট কুঞ্চিত ক'রে কমলের মহলের দিকে দেখিয়ে দেয়।

ওয়াং সোজা হ'য়ে ব'সে ওলান্-এর দিকে তাকায়, ওর বিশ্বাস হয় না। শেষে ব'লে ফেলে: 'তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে!'

ওলান্ মাথা নাড়ে। ওর কষ্ট-নিঃসৃত কথা ঠোঁটের কাছে হোঁচট খেয়ে খেয়ে একটি একটি ক'রে বেরয়:

'বেশতো, একদিন হঠাৎ বাড়ী এসেই দেখো না।'

খানিক চুপ ক'রে থেকে আবার বলে: 'ওকে বরং পাঠিয়েই দাও। দক্ষিণে যেতে চায়, তাই দাও।' তারপর টেবিলের কাছে এসে ওয়াঙের চায়ের বাটিটা হাত দিয়ে দেখল, ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। ঠাণ্ডা চা'টা বাটিতে ফেলে দিয়ে আর এক বাটি গরম চা ঢেলে দিল। তারপর যেমন নিঃশব্দে

এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। ওয়াং বিস্ময় সাগরে ডুবে নিশ্চল হ'য়ে বসে রইল।

ও নিজেকে বোঝাতে চাইল, এ হয়তো কমলের ওপর ওলান্‌এর হিংসে। যাক্‌গে ছাই, ও আর এসব নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামাবে না। নাংএন্‌ তো বেশ ভালই আছে, খুসী মনে দিব্যি পড়াশোনা ক'রছে। যত সব মেয়েলী হিংসে। ওয়াং হোঃ হোঃ ক'রে এসে উঠল। তারপর মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল।

রাতে কমল ওকে বিরক্তির সঙ্গে বিছানার এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ ফুলিয়ে বলল : 'একে তো গরম—তায় যা গন্ধ তোমার গায়ে। রোজ নেয়ে তবে আমার কাছে শুতে আসবে।'

বলতে বলতে কমল উঠে বসে। ঝাঁঝের সঙ্গে একটা ঝাকানি দিয়ে মুখের চুলগুলি পেছনে সরিয়ে দিয়ে রাগ ক'রে দূরে বসে থাকে। ওয়াং আদর ক'রে কাছে টানতে চায়। কমল কাঠ হ'য়ে বসে থাকে। ওয়াং চুপচাপ শুয়ে পড়ে। ওর মনে পড়ে অনেক দিনই তো কমলের এমনি অনিচ্ছার সঙ্গে ওকে লড়াই ক'রতে হয়েছে। এতদিন এ-সব খেয়ালী মেয়ের খেয়াল বলে উড়িয়ে দিয়েছে, ভেবেছে, গরমে মেয়েটার মেজাজ ভাল নেই। কিন্তু আজ ওলান্‌এর কথাগুলো মনে প'ড়ে যায়। মনে হয় ওর কথাগুলোয় যেন একটা অতি স্পষ্ট প্রখর সত্য রয়েছে। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে রূঢ় ভাবে বলে : 'একাই থাকো তবে। গলা কেটে ফেললেও আর আসছিনে।

ব'লে হন্‌ হন্‌ ক'রে বেরিয়ে গেল। মাঝের ঘরে এসে দুটো চেয়ার জোড়া দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম এলো না। উঠে বাইরে এসে বাড়ীর পেছনে বাঁশঝাড়ের মধ্যে পায়চারী ক'রতে লাগল। নৈশ বায়ুর শীতলতা ওর উত্তপ্ত দেহের উপর স্নিগ্ধতা ঢেলে দিল।

মনে পড়ে গেল—নাং এন্‌ যে বিদেশে যেতে চায় কমল জানে। কিন্তু কেমন ক'রে জানল? ছেলেই বা হঠাৎ অমন শান্ত হ'য়ে গেল কেন? এই যাবার জন্ম এত পাগল, কিন্তু এখন আর যাবার নামটি করে না, এর কারণ কি? ওয়াং কঠিন পণ ক'রে বসে : দেখে নেবে সব।

মাটির বুকের ওপরকার কুহেলির জাল ছিন্ন ক'রে দিগন্ত লাল হ'য়ে ওঠে। ধীরে ধীরে আলো পরিস্ফুট হ'য়ে মাঠের ওপারে দিক্‌-চক্রবাল সোনালী রেখায়

জ'লে ওঠে। ওয়াং বাড়ী ফেরে। তারপর খেয়ে দেয়ে রোজকার মত কাজ তদারক ক'রতে বেরিয়ে যায়। যাবার সময়, সবাই শুনতে পায় এমন ভাবে ডেকে বলে যায়ঃ 'আমি সহরের পাঁচিলের ধারের জমিতে যাচ্ছি। আসতে একটু বেলা হবে।'

কিন্তু আধপথে ছোট মন্দিরটা পর্যন্ত এসেই থেমে যায়। রাস্তার ধারে একটা ঘাসে ঢাকা ঢিবি—বহুকালের পুরানো ভুলে-যাওয়া একটা কবর—তারি ওপর বসে পড়ে। একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে দু' আঙুলে মোড়াতে মোড়াতে ভাবনায় ডুবে যায়। ওর ঠিক সামনেই দেবতার মৃন্ময়ীপ্রতিমা—ওর দিকে সোজা তাকিয়ে রয়েছে। ওর মনে পড়ে আগে কি ভয়টাই না করত এদের। কিন্তু আজকাল আর ভয় করে না। দরকার নেই ব'লে এদিকে বড় একটা আর আসেওনা। কিন্তু এসব চিন্তা ছাপিয়ে বারে বারে মনে হয়—ফিরে যাবে কিনা।

হঠাৎ গত রাতের কথা ওর মনে প'ড়ে যায়—কমল ওকে বিছানা থেকে ঠেলে দিয়েছিল। কত ক'রেছে কমলের জন্য ওয়াং। তারপর ভয়ানক রাগ হয়। জানা আছে সব! রেস্তরাঁয় আর বেশীদিন টিকতে হ'তনা যাদুকে। এখানে এসে রাণীর হালে আছেন—তাই গরম বেশী!

রাগের ঝোঁকেই ওয়াং উঠে প'ড়ে পা চালিয়ে দিল বাড়ীর দিকে। সোজা পথে গেল না। চুপি চুপি গিয়ে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল। পুরুষের অস্পষ্ট কথা শোনা যায়। তাইতো এযে ওর ছেলেরই গলা!

শুধু যদি বলা হয়—ওয়াঙের রাগ হ'ল—তবে কিছুই বলা হ'ল না। রাগ হ'ল, কিন্তু যে রাগ হ'ল তা যে ওর মধ্যে ছিল তা ওয়াং নিজেই জানত না এতদিন। রাগ অবশ্য ওয়াঙের আজকাল হয়। আগের দীন, ভীরু ওয়াং নেই। এখন ধনী ওয়াঙের সমাজে বড় পরিচয়—ওয়াং সহরেও মাথা উঁচু ক'রে চলে। কাজেই সে রাগ করে যখন তখন, কারণে অকারণে। কিন্তু আজ যে রাগ ওর হ'ল—সে রোজকার ক্ষণে ক্ষণে কারণেঅকারণে রাগ নয়—এ 'পুরুষের' অমর্ষ—আদি-মানবের ক্রোধ—যা যুগে যুগে দয়িতা-হরণকারীকে, প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দগ্ধ ক'রে এসেছে। পরমুহূর্তেই যখন মনে হ'ল—ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ওর নিজেরই সন্তান—তখন ধিক্কারে ওর সমস্ত অস্তিত্ব যেন গুলিয়ে উঠল।

দাঁতে দাঁত চেপে বাইরে গিয়ে ঝাড় থেকে একটা সরু শক্ত বাঁশের কঞ্চি নিয়ে এল—ডাল পালা সব ছেঁটে ফেলে মাথায়খালিএক গোছাসরু ডাল-পাতা রেখে দিল। তারপর নিঃশব্দে এসে একেবারে আচম্বিতে পরদা সরিয়ে ভেতরে

এসে দাঁড়াল। চৌবাচ্চার ধারে একটা টুলে কমল ব'সে, পাশেই ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে নাং এন্। কমল পিচ্ রংএর সিল্কের পোশাকটি পরেছে। সকাল বেলা এ ভাবে সাজ-সজ্জা ক'রতে ওকে ওয়াং কখনও দেখেনি।

ওরা হাসি গল্পে তন্ময়। কমল নাং এন্‌এর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে কি যেন বলছিল আর হাসছিল। মাথাটা ওদিকে ফেরান ছিল—তাই ওয়াঙের আসা টের পায়নি। ওয়াং কঠিন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন চকিতে উবে গিয়ে, মুখটা একেবারে মরার মত সাদা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, ঠোঁট উল্টে ফাঁক হয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়ে—কঞ্চিটার ওপর মুঠি চেপে বসে। ওরা তখনও কিছু টের পায়নি। কোকিলা হঠাৎ কি কাজে এসে ওয়াংকে দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল।

ওয়াং লাং লাফিয়ে সামনে এসে বাঘের মত ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডাইনে বাঁয়ে বিদ্যুতের মত হাতের কঞ্চি চলে। ওয়াঙের হাল-চালানো হাতের মারে নাং এন্‌এর দেহ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল। ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত ঝরতে লাগল। কমল চীৎকার ক'রে ওয়াঙের হাত ধ'রে টানতে লাগল। ওয়াং ওকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কমল কিছুতেই ছাড়ে না। ওয়াং পথ না পেয়ে কমলকেই মারতে আরম্ভ করে। মার খেয়ে কমল পালিয়ে গেলে, ওয়াং আবার গিয়ে নাং এন্‌এর ওপর পড়ে। নাং এন্ ক্ষতবিক্ষত মুখ দু'হাতে চেপে মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার আগে ওয়াঙের হাত কিছুতে থামে না।

ওয়াং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। বিচ্ছিন্ন ওষ্ঠের ফাঁকে সশব্দে নিশ্বাস ওঠে পড়ে। দর্ দর্ ক'রে ঘাম ঝ'রে ঝ'রে সর্বশরীর একেবারে যেন নেয়ে ওঠে। বড় দুর্বল মনে হয় হঠাৎ—যেন কোনো অসুখ করেছে। কঞ্চিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে: 'যা উঠে এক দম সোজা নিজের ঘরে চলে যা। যতক্ষণ না বলি খবরদার বেরুবি না—নয়তো মেরে খুন ক'রে ফেলব। আজই তোকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রে তবে অন্য কথা'।'

নিঃশব্দে নাং এন্ উঠে চ'লে গেল। যে টুলটায় কমল বসেছিল, ওয়াং সেইটেতে বসে পড়ল। দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে, চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। বহুক্ষণ ওই ভাবে একা ব'সে থেকে অবশেষে ওর মন শান্ত হ'য়ে এল।

তারপর অবসন্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে এল ঘরে। কমল বিছানায় শুয়ে শুয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদছিল। ওয়াং কাছে গিয়ে ওকে ধ'রে ফেরাল।

ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠল কমল। সারা মুখে কঞ্চির দাগ বেগুনী হ'য়ে ফুলে উঠেছে।

ওয়াং বলে—বড় দুঃখে ওর স্বর ভারী হ'য়ে আসে:

'বেশ্যার স্বভাব ছাড়তে পারলে না কিছুতে! অবশেষে আমারই ছেলের সঙ্গে—'

কমল আরো জোরে কেঁদে ওঠে:

'না, না, মিথ্যে কথা—আমি কিছু করিনি। জিজ্ঞাসা করো কোকিলাকে—ওর একা একা ভালো লাগতো না ব'লে আসত। কিন্তু কক্‌খনো বিছানার কাছেও আসেনি। উঠনে তো দেখেছ। ওর চাইতে একটুও বেশী কাছে আসেনি কোনোদিন।'

তারপর ভীত করুণ দৃষ্টি ওয়াঙের দিকে তুলে ধরে। ওয়াঙের হাতটা টেনে এনে নিজের মুখে বুলিয়ে কৃত্রিম কান্নায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে: 'দেখ তোমার কমলের কি দশা ক'রেছ। তোমায় কি ক'রে বোঝাব যে তুমিই আমার সব। তুমি ছাড়া আর কারো জায়গা নেই আমার মনে। ছেলে তোমার, সে আমার কে?'

কমল আবার চোখ তুলে ধরে। স্বচ্ছ অশ্রুর সাগরে টলমল করে চোখ দুটি। অব্যক্ত বেদনায় ওয়াং গুমরে ওঠে। এই নারীর সৌন্দর্যের আকর্ষণ প্রতিহত করার শক্তি ওর নেই। রূপের নাগপাশ দিয়ে ওয়াংকে বেঁধেছে কমল। ইচ্ছে না থাকলেও ভালো না বেসে পারে না। না, না থাক, ওয়াং জানতে চায় না, জানবে না, কমল...আর···আর—, না থাক, ও রহস্যের সমাধান ওয়াং করবে না, কোনোদিন করতে চাইবেও না। থাক রহস্য, অন্ধকারই ভালো···। আর্তনাদ ক'রে ওয়াং বেরিয়ে আসে। ছেলের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে না ঢুকেই ডেকে বলে:

'জিনিসপত্র গুছিয়ে সব নাও। কালই বেরিয়ে পড়বে দক্ষিণদেশে না কোন চুলোয় যাবে। কিন্তু যতদিন না আসতে লিখি, বা লোক না পাঠাই, এসো না যেন।'

ওলান্ ওয়াঙেরই একটা জামা সেলাই করছিল। ওয়াং ওর পাশ দিয়েই চলে গেল, ওলান্ কিছু বলল না। ওমহলের ঐ সব হাঙ্গামার শব্দ ওর কানে গেছে কিনা কে জানে—গিয়ে থাকলেও অন্ততঃ ওর চেহারায় তা কিছুই বোঝা গেল না।

ভরা দুপুর—সূর্য মাথার উপরে। ওয়াং চলতে চলতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাঠে এসে পড়ল। পা আর চলে না, শরীর একেবারে অবসন্ন, একটুও শক্তি নেই—যেন সারাদিন বড় পরিশ্রম ক'রে এসেছে।

পঁচিশ

নাং এন্ চলে গেল। যেন বাড়ী থেকে এক প্রকাণ্ড অশান্তির বোঝা নেমে গেল। ওয়াং হাঁফ ছাড়ল। নাং এন্ গিয়ে দুপক্ষেই ভালো হ'ল। ওর নিজের পক্ষেও, ওয়াঙের পক্ষেও। ওয়াং এখন অন্য ছেলেগুলোর দিকে তাকাতে পারবে। এতদিন কি ছাই কোনো দিকে চাইতে পেরেছে, যা ঝঞ্ঝাট নিজের, তার ওপর কাজ কর্মের। পৃথিবী উল্টে গেলেও ঠিক সময়ে চাষ কর, বীজ বোন, ফসল কাট। এদিক ওদিক হবার জো নেই। কোন্ দিকে তাল সামলাবে! এবার একটু নজর দিতে পারবে। ওয়াং ঠিক ক'রল মেজ ছেলেকে বেশী পড়াবে না, একটু তাড়াতাড়িই স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে কিছু একটা কাজ শিখতে দেবে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির কাজ কর্মে জুড়ে দেওয়াই ভালো। নইলে বড় খোকার মত ডানা গজাবে আর বাড়ী সুদ্ধ লোককে জ্বালিয়ে খাবে।

বড় ছেলে আর মেজ ছেলে আকারে প্রকারে একেবারে উল্টো। বড় লম্বা, শরীরের কাঠামোখানা মায়েরই মত চওড়া, মায়েরই মত অর্থাৎ উত্তর দেশীদের মত মুখের রং লাল্‌চে। মেজ ছেলে বেঁটে ছিপছিপে, রং হল্‌দে, ওয়াঙের বাবার মুখের অনেকটা আদল আসে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ধূর্ত চোখ, ব্যঙ্গে ভরা। কারণ ঘটলে হিংস্র হয়ে উঠতে দেরী হয় না। ওয়াং ভাবে:

এ ছেলে আমার পাকা ব্যবসায়ী হবে। ইস্কুল ছাড়িয়ে ওকে ব্যবসাপট্টিতেই নিয়ে যাব, দেখি যদি কোথাও কাজ শিখতে দিতে পারি। ওখানেই তো আমার নিজের কাজ কর্ম। নিজের লোক একটা থাকলে মন্দ হয় না। ফসল বেচার সময় দাঁড়িপাল্লার দিকে একটু নজর রাখতে পারে, ওজনের সময় একটু আধটু নিজেদের সুবিধেও তো ক'রে নিতে পারে। সুতরাং সেইদিনই কোকিলাকে বলল: 'যাও তো দেখি বেয়াই মশাইকে বলো গে যে আমার ওঁর সাথে একটু দরকার আছে। অন্ততঃ এক সাথে ব'সে একটু মদ খেতে হয়তো আমাদের—এরপর যখন দুজনে এক বোতলের মদই হ'তে যাচ্ছি। খেতে খেতেই কথা হবে'খন।'

কোকিলা ফিরে এসে বলল: 'আপনার যেদিন সুবিধে হবে সেদিনই যেতে বললেন উনি। আজ দুপুরেও ওর সময় আছে। আর বলেন তো উনিও আসতে পারেন।'

সহরের এই মানুষটি ওর বাড়ীতে এলে ওয়াংকে অনেক কিছু আয়োজন ক'রতে হয়, একে সহরের মানুষ তায় বেয়াই। তার চেয়ে নিজের যাওয়াই ভালো। স্নান সেরে সিল্কের পোষাক পরে মাঠের পথে বেরিয়ে পড়ল। নির্দিষ্ট রাস্তায় গিয়ে কোকিলার নির্দেশ মত পুলটা পেরিয়ে ডানদিকে দুটো বাড়ীর পরে বাড়ীটা আন্দাজ ক'রে একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিল ঠিক ঐ বাড়ীটাই।

দরজায় ঘা দিতেই একজন পরিচারিকা এসে দ্বার খুলে ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রল। ওয়াং পরিচয় দিলে অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে দেখে সে ওকে প্রথম মহলে নিয়ে গেল। এ মহলেই পুরুষেরা থাকে। একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপরে আবার একবার ওয়াঙের দিকে বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে তবে মেয়েটির হৃদয়ঙ্গম হল যে এঁরই ছেলের সঙ্গে এ বাড়ীর কর্তার মেয়ের বিয়ে সে দিন ঠিক হ'ল। তাড়াতাড়ি প্রভুকে সংবাদ দিতে চলে গেল।

ওয়াং লাং চারিদিক নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল। উঠে গিয়ে দরজার পরদায় হাত দিয়ে দেখল, আসবাবপত্রের কাঠগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখল — বেশ খুশী হল—সব কিছুতে বেশ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পরিচয় র'য়েছে। খুব বেশী বড়লোকের মেয়ে ওয়াং চায়নি—এমনি মাঝারি ঘরের মেয়ে চেয়েছিল। সাধারণতঃ বড়লোকের মেয়েরা বড় অহংকারী আর জেদী হয়—আর তাদের কাপড় গয়না জুগিয়ে কূল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বড় কথা হ'লো যে ওসব মেয়েরা দু'দিনে ছেলেকে পর ক'রে নেয়! যাক্ ভালোই হ'ল। ওয়াং ব'সে ব'সে ভাবী বেয়াইয়ের প্রতীক্ষা ক'রতে লাগল।

তারপর ভারী পায়ের শব্দ ক'রে একজন স্থূলকায় বয়স্ক ব্যক্তি ঘরে এল। অভিবাদনের আদান প্রদানের পর গোপন দৃষ্টিতে দু'জনেই দু'জনকে নিরীক্ষণ করে। বেশ ভালো লাগে পরস্পরকে। প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির জন্য দু'জনেই দু'জনকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। একজন পরিচারিকা এসে উষ্ণ সুরা দিয়ে যায়—পান ক'রতে ক'রতে ওরা নানা আলোচনা করে। অবশেষে ওয়াং কাজের কথায় আসে:

'এখন যে জন্ম আসা বেয়াই। কথাটা হচ্ছে এই যে আমার মেজ ছেলেটাকে আপনার হাতে সঁপে দিতে চাই। ছেলেটা চালাক চতুর আছে। আপনার তো মস্ত বড় ব্যবসা, লোকজনের দরকার হয়তো। যদি কিছুদিন আপনার কাছে থেকে একটু কাজ কর্ম শিখতে পারে আমার বড় উপকার হয়। তবে আপনার যদি স্থবিধে না হয় তো—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ লেখাপড়া জানা ঐ রকম একটি চালাক চতুর ছোকরার আমার দরকার আছে বৈকি!' প্রসন্ন স্থরে লিউ বলে।

ওয়াং একটু গর্বের স্থরে উত্তর দেয়:

'আমার দু'ছেলেই খুব বিদ্বান মশায়। অন্যের লেখায় কতটুকু ভুল থাকলে ঠিক ধরে দেবে—ওদের চোখ এড়ায় সাধ্য কার।'

'বেশ বেশ, চমৎকার! যেদিন আপনার খুশী দিন পাঠিয়ে! তবে বেয়াই মশায়, মাইনে পত্তর কিন্তু প্রথমটা দেব না। আমার এখানেই খেয়ে দেয়ে কাজ কর্ম শিখুক না আগে। বছর খানেকের মধ্যেই মোটামুটি সব বুঝে শুনে নিতে পারবে। তখন মাসে ডলার খানেক ক'রে পাবে। তিন বছর পর্যন্ত বছরে এক ডলার ক'রে বাড়িয়ে দেব। আর এ ছাড়া খদ্দেরদের কাছ থেকেও নিজে যা কমিশন আদায় ক'রতে পারে। তারপর তিনটে বছর পরে—তখন তো ওর নিজের হাত। যেমন কাজ ক'রবে তেমন পয়সা। শেখার তিনটে বছরই একটু টেনে চলতে হবে। জামিন-টামিনও আর লাগবে না। আমরা তো আর পর নই এখন। আপনা-আপনির মধ্যে আর ওসবের দরকার নেই।'

ওয়াং খুশী হয়ে বিদায় নিল। বেরুতে বেরুতে বলল:

'তাই তো, আমরা তো আর পর নই এখন। আর একটা কথা বে'ই মশায়, আপনার ছেলে নেই? আমার যে মেয়েও রয়েছে একটা।'

লিউ হোঃ হোঃ ক'রে প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠল। ওর স্থখাদ্য-পুষ্ট স্থূল দেহটা নড়ে উঠল হাসির প্রাবল্যে। বলল:

'মেজ ছেলেটা রয়েছে, এই দশ বছর হ'ল। ওরই বিয়ের কথা বাকী আছে এখন। আপনার মেয়েটির বয়েস কত?

ওয়াং হেসে উত্তর দিল:

'এই ন বছর চল্‌ছে। ফুলের মত স্থন্দর হয়েছে মেয়েটা।'

দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠল। লিউ বলল:

'ভবল দড়ির ব্যবস্থা যে!'

ওয়াং আর কিছু বলল না। কেননা সম্বন্ধ বিষয়ে এর বেশী কথা মুখোমুখি আর চলে না। কাজেই মাথা নীচু ক'রে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এল বাড়ী এসে মেজ খুকীর দিকে তাকিয়ে ভাবল, মন্দ হবে না সম্বন্ধটা। বড় সুন্দর হ'য়েছে মেয়েটা। মা পা বেঁধে দিয়েছে—টলে টলে যখন চলে বড় সুন্দর লাগে। কিন্তু কাছে আসতে চোখ প'ড়ে গেল মেয়েটার গালে চোখের জল শুকিয়ে আছে—মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা, আর বড় গম্ভীর। হাত ধরে কাছে টেনে এনে আদর ক'রে জিজ্ঞাসা করল :

'কেঁদেছিস কেনরে মা?'

মাথা নীচু ক'রে জামার বোতামটা নাড়াচাড়ি ক'রতে ক'রতে বড় লজ্জায়, বড় আস্তে অস্পষ্ট স্বরে মেয়ে জবাব দিল :

'মা একটা কাপড় দিয়ে রোজ বেশী শক্ত ক'রে পা বেঁধে দেয়। বড় ব্যথা করে, রাতে ঘুমুতে পারি না।'

ওয়াং অবাক হয়ে বলে : 'কইরে তোকে তো কোনোদিন কাঁদতে শুনিনি!'

'কাঁদব কি ক'রে! মা যে বলেছে কাঁদলে তোমার কষ্ট হবে। কারো কষ্ট নাকি তুমি সইতে পারো না। আমায় কাঁদতে দেখলে—' ছোট শিশু যেমন শোনা-গল্প মুখস্থ বলে তেমনি ভাবে মেয়েটি ব'লে যায় : 'নাকি পা আর বাঁধতেই দেবে না। আর পা বাঁধা না থাকলে, তুমি যেমন মাকে ভালোবাস না, আমার বরও তেমন আমায় ভালোবাসবে না।'

ওয়াঙের বুকে কে যেন একটা ছুরি বসিয়ে দিল। ওলান্ মেয়েকে বলেছে ও তাকে ভালোবাসে না! ওরই সন্তানের জননী সে!

তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলল : 'জানিস তোর জন্য একটা টুকটুকে বর দেখে এসেছি আজ। কোকিলাকে কথাবার্তা ঠিক ক'রে আসতে পাঠিয়ে দেব।'

বালিকা মধুর হেসে মাথা নীচু করে। হঠাৎ যেন ওর শৈশব যৌবনে মুক্তি পেয়ে যায়। সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওয়াং কোকিলাকে কথাবার্তা পাকা ক'রতে পাঠিয়ে দিল।

কমলের পাশে শুয়েও সে রাতে ওয়াঙের ভালো ঘুম হ'ল না। বার বার ওর মনের পটে অতীতের ছবি ফুটে উঠতে লাগল। ওলান্ই তো ওর জীবনে প্রথম এসেছিল—তাকেই তো ও প্রথম জেনেছিল, ভালো বেসেছিল! সেই থেকে দুঃখে সুখে ওর পাশে দাঁড়িয়ে, অনুগত ভৃত্যের

মত নীরবে সেবা ক'রে গেল ওলান্। মেয়ের কথাগুলো বার বার মনে প'ড়ে ওকে খোঁচা দিতে লাগল। ওলান্ বুঝেছে—নিষ্প্রভ চোখ দুটি দিয়েই ওলান্ ওর অন্তঃস্থলটা দেখতে পেয়েছে। এই কথাটা ওয়াংকে বড় ব্যাথা দিতে লাগল।

কিছুদিন পরে মেজ ছেলে নাং ওয়েন্ সহরে চলে গেল। মেজ মেয়ের সম্বন্ধ পাকা হ'য়ে গেল। যৌতুকের হিসেব, দলিল পত্র, যা কিছু সব ঠিক ঠাক, পাকা হ'য়ে গেল! ওয়াং এবার নিশ্চিন্ত। ছেলে মেয়েদের ব্যবস্থা তো একরকম হ'য়ে গেল। রইল বড় খুড়ী আর ছোট ছেলেটা। বোবা মেয়েটার আর কি ব্যবস্থা হবে—রোদে বসে কাপড়ের ফালি পাকিয়ে পাকিয়ে খেলা করা ছাড়া তো সে বেচারার আর কোন ক্ষমতাই নেই। ছোট খোকাকে স্কুলে আর দেবে না; দু'ছেলে লেখাপড়া শিখেছে ওতেই ঢের হবে। একে এদিকেই জমি জমা দেখা শোনা করবার জন্য রেখে দেবে।

তিন তিনটি যোগ্য ছেলে—ওয়াং গর্ব বোধ করে। একজন পণ্ডিত, একজন ব্যবসা করে, একজন চাষ-বাস ক'রবে। কম কথা? ক'জনের ভাগ্যে জোটে? ওয়াঙের মত সুখী কে? ছেলেমেয়ের কথা আর ভাববার দরকার নেই, —মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল একেবারে। কিন্তু ছেলেদের মায়ের কথা ঝেড়ে ফেলতে পারল না। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে ঐ কথায় মন ছেয়ে রইল।

এত বছর পরে এই প্রথম ওয়াং ওলান্এর কথা ভাবে। ওলান্ ব্যক্তি হিসেবে ওয়াঙের চিন্তায় কখনও স্থান পায়নি—বিবাহিত জীবনের রোমাঞ্চের অধ্যায়েও নয়। অর্থাৎ ওলান্কে ওলান্ ব'লে ওয়াং হিসেবে কোনদিন আনেনি। ওলান্ রমণী—এটুকুই শুধু ও দেখেছিল। ওলান্কে অবলম্বন ক'রে কুমার ওয়াঙের প্রথম নারীর অভিজ্ঞতা। ওলান্ রমণী, এর বেশী ওয়াং দেখেনি। তাছাড়া নানা কাজে নানা ঝঞ্ঝাটে ওর সময়ই বা কোথায় ছিল কারো কথা ভাবার? এখন ছেলেদের ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। শীত এসে পড়েছে, মাঠের কাজও একরকম শেষ হয়েছে, কমলকে নিয়েও আর ওর তেমন পাগলামী নেই। আর মার খাওয়ার পর থেকে কমলও একেবারে নরম হ'য়ে গেছে। এখন ওর অবসর হয়েছে। সুতরাং এখন ও ওলান্এর কথা ভাবতে বসেছে।

আজ আর ওলান্ ওয়াঙের কাছে কেবলী নারী নয়, আজ ওর কুরূপ মূর্তি, ওর অস্থিসার শ্রীহীন দেহ, রুক্ষ হলদে ত্বক ওয়াঙের চোখে পড়ে না।

স্ত্রীর কথা ভাবতে গিয়ে তীব্র অনুশোচনায় ও ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। কি রোগা হয়ে গেছে ওলান্, রং একেবারে পাংশুটে, চামড়া শুকিয়ে দড়ি হ'য়ে গেছে। এই তো সেদিনের কথা—ওয়াঙের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে গিয়ে কাজ ক'রেছে। কি সুন্দর গভীর পিঙ্গল বর্ণ—লালের আভা খেলত' তাতে। কত বছর ওলান্ মাঠে যায় না। বছরে বার দুই সেই ফসল কাটার সময় যেত খালি। তাও গত দু-তিন বছর যায়নি, অবশ্যি ওয়াং-ই যেতে দেয় নি—পাছে লোকে নিন্দে করে যে অত বড়লোক হয়েও ওয়াং বউকে খাটায়।

সে-তো হলো। কিন্তু ওয়াং তো কোনদিনই ভেবে দেখেনি কেনই বা শেষ পর্যন্ত ওলান্ মাঠে যাওয়া ছাড়তে রাজী হ'লো, কেনই বা ও অত ধীরে ধীরে চলাফেরা করে। ক্রমশঃই যেন ওর নড়াচড়া বড় বেশী মন্থর হয়ে চলেছে। ভাবতে ব'সে মনে পড়ে: তাইতো, কতদিন এ শুনেছে ভোর বেলা বিছানা থেকে ওঠার সময় ওলান্ কেমন যেন কাতরায়। উপুর হয়ে উনুন ধরাবার সময়ও কতদিন ওর কাতরাণী শুনেছে ওয়াং। কতদিন জিজ্ঞাসাও ক'রেছে কি হ'য়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই ওলান্ চুপ ক'রে গেছে। ওর দিকে আর ওর উদরের অস্বাভাবিক স্ফীতির দিকে তাকিয়ে ওয়াঙের মনে বড় অনুতাপ হয়। কিন্তু কেন যে হয় তা ও বোঝে না। আপন মনেই তর্ক করে:

আমার কি অপরাধ হলো! ভালবাসিনি কে বললে? মেয়েমানুষের জন্য মানুষ যেমন পাগল হয়—তেমনি হইনি, এই তো কথা? ঘরের বৌ-এর জন্য কেই বা তা হয়?

তারপর যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেয়: তা মারধোর তো ক'রিনি কখনও, টাকা পয়সা যখন যা চেয়েছে দিয়েছিও।

শত সান্ত্বনা সত্ত্বেও মেয়ের কথাগুলো মন থেকে কিছুতে মুছে যায় না। কেন যে যায় না কিছুতে বুঝতে পারে না। মনের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক করে। স্বামী হিসেবে ও তো বহু লোকের চাইতে ভালো। কোনদিন তো ওলান্-এর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি! তবে কেন!

তবে কেন? এই 'তবে কেন' ধাঁধা হ'য়ে ওয়াঙের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রইল। ওয়াঙের দৃষ্টি অনুক্ষণ ওলান্‌কে নিরীক্ষণ ক'রে ফিরতে লাগল। চলায় ফেরায়, ওর কাজের মধ্যে ওয়াং কেবল ওলান্‌কে দেখে। একদিন সকলের খাওয়া হয়ে গেল, ওলান্ নীচু হ'য়ে এঁটো ঝাঁট দিচ্ছিল। ওয়াং

লক্ষ্য করে ও হাঁপাচ্ছে, পেট চেপে ধরে উপুড় হয়ে রয়েছে। দূর থেকে মনে হ'চ্ছে যেন ঝাঁটই দিচ্ছে।

ওয়াং ওকে জিজ্ঞাসা করল, একটু রুক্ষভাবেই করল : 'কি হ'য়েছে তোমার?'

ওলান্ মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে জবাব দিল : সেই আগের ব্যথাটা।'

ওয়াং খানিকক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মেয়েকে ডেকে বলল : 'যা তো মা, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ফেল। তোর মায়ের অসুখ ক'রেছে।' তারপর স্বরে মমতা ভ'রে, যা ও এত বছরের মধ্যে কোনদিন করেনি, ওলান্‌কে বলল :

'তুমি শুয়ে পড়োগে এক্ষুণি। খুকীকে বলেছি এক্ষুণি গরম জল এনে দেবে। খবরদার উঠো না যেন।'

ওলান্ নীরবে আদেশ মেনে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। তারপর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে এদিকে ওদিক নড়াচড়া ক'রে গিয়ে শুয়ে পড়ে। নড়াচড়ার শব্দ শোনা যায় এ ঘর থেকে। চাপা কাতরানির শব্দ আসে। ওয়াং বসে বসে শোনে। তারপর উঠে ডাক্তারের খোঁজে সহরে চলে যায়।

মেজ ছেলে যেখানে কাজ করে সেখানকার একজন কেরাণী ওকে এক ডাক্তারের খোঁজ দিল।

ডাক্তার বৃদ্ধ, দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুতে বুক মুখ প্রায় ঢাকা—নাকের ওপর প্যাঁচার চোখের মত একজোড়া পেতলের ফ্রেমের চশমা। গ্রে-রংএর ময়লা আচ্‌কানটির ঢোলা আস্তিনে হাত সম্পূর্ণ ঢাকা। বৃদ্ধ চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসেছিল। ওয়াঙের কাছে তার স্ত্রীর রোগের সব বিবরণ শুনে মুখ বাঁকা ক'রে টেবিলের দেরাজ থেকে কালো রংএর কাপড়ে জড়ান একটি পুঁটুলি বের ক'রে বলল : 'চলুন।'

ওলান্‌এর ঘরে এসে দেখে কেমন যেন একটা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন ওলান্। কপালে, ওপরের ওষ্ঠের ওপরে, শিশির বিন্দুর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম। এ দেখেই ডাক্তার মাথা নাড়ে। বানরের হাতের মত চর্মসার, পাংশুটে একখানা হাত আস্তিনের ভেতর থেকে বের ক'রে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ী দেখে—তারপর গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলে :

'পিলেটা দেখছি বড্ড বেড়ে গেছে। এঃ যকৃৎটা তো একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেছে।...জরায়ুর মধ্যেও মানুষের মাথার মত বড় একটা পাথর...আর ...পাকস্থলীও কোন কাজই ক'রতে পারছে না...সর্বনাশ! ...হৃদ্‌পিণ্ডও

যেন নড়ছে না, এই কোনোমতে একটু ধিকি ধিকি ক'রছে মাত্র—মনে হচ্ছে ওটাতে পোকা পড়েছে।'

একথা শুনে ভয়ে ওয়াঙের নিজের হৃৎপিণ্ডই যেন থেমে গেল মনে হ'ল। ও রেগে উঠল : 'শুনলাম তো সব—এখন দেরী না ক'রে ওষুধ দিন।'

ওদের কথাবার্তার শব্দে ওলান্ চোখ খুলে চাইল—বেদনাতুর ক্লান্ত শূন্য দৃষ্টি।

ডাক্তার আবার বলে : 'বড় কঠিন রোগ মশাই। বড় কঠিন রোগ। টাকা একটু বেশী লাগবে। একেবারে ভালো ক'রে দেবার চুক্তি যদি না চান—তবে একটু কমে হবে। দশ ডলার লাগবে তা'হলে ফ্রী। কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি—একটা পাঁচন থাকবে, তার সঙ্গে বাঘের শুকন হৃৎপিণ্ড আর কুকুরের দাঁত থাকবে। সব একসঙ্গে সেদ্ধ ক'রে ক্বাথটা খাইয়ে দেবেন। আর ভালো ক'রে দিতেই হবে বলে যদি সর্ত লিখিয়ে নিতে চান তবে পাঁচশ' ডলার লাগবে বলে দিচ্ছি।'

পাঁচশ' ডলার—কথা ক'টি ওলান্এর কাণে গেল। হঠাৎ তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে ক্ষীণ দুর্বল স্বরে বলল :

'না গো না, আমার তুচ্ছ জীবনটার জন্য অত খরচ ক'রো না : ঐ টাকা দিয়ে ভালো একখানা জমি হয়ে যাবে।'

ওলান্এর কথায় পুরানো অনুশোচনা জেগে উঠে ওয়াংকে চাবুক মারে। ও ক্ষেপে ওঠে। ভয়ানক চীৎকার ক'রে ওলান্কে বলে : 'যতক্ষণ আমার টাকা আছে আমি এ বাড়ীর কাউকে মরতে দেব না।'

'আমার টাকা আছে' কথা ক'টি ডাক্তারের কানে যায়। লোভে বৃদ্ধের চোখ জ্বলে ওঠে। কিন্তু আইনের ভয় আছে। সর্ত ক'রে সর্ত যদি না রাখতে পারে—অর্থাৎ রোগী যদি মরে—তবে আইন অনুসারে কঠিন শাস্তি পেতে হবে, বৃদ্ধ জানে।

তাই নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে বলে :

'দেখুন—চোখের ওই রংটা তখন খেয়াল করিনি, তাই একটু ভুল হয়েছিল। রোগটা বড়ই কঠিন। বলে'ছিলাম বটে—কিন্তু পাঁচশ' ডলারে সারাবার সর্ত ক'রতে পারব না। পাঁচ হাজার না হ'লে পারছি না। ভেবে দেখুন, বড়ই শক্ত কিনা।'

ওয়াং বোঝে সব। নীরবে ডাক্তারের দিকে চায়। কোথায় পাবে

অত টাকা? জমি বেচতে হবে। কিন্তু ওয়াং ভালো ক'রেই জানে, জমি বেচলেও লাভ হবে না—কেননা পাঁচ ওই হাজারের ছলে ডাক্তার চরম রায় দিয়ে গেল।

সুতরাং দশটি ডলারই ডাক্তারের হাতে গুণে দিলে। ডাক্তার চ'লে গেলে ও রান্নাঘরে ঢুকল। অন্ধকার রান্নাঘর—যেখানে ওলান্‌এর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে—আর আজ যেখানে সে নেই। ওলান্‌কে আর কোনোদিন কেউ এ ঘরে দেখবে না। ধোঁয়ায় কালো দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওয়াং অঝোরে কাঁদতে লাগল।

ছাব্বিশ

ওলান্‌এর খুব তাড়াতাড়ি কিছু হ'ল না। সবে মাঝ পথে আসা কাঁচা জীবন অত তাড়াতাড়ি দেহটার মায়া ছাড়তে চাইল না। বহু মাস ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওলান্ তিল তিল ক'রে মরতে লাগল। শীতের সুদীর্ঘ দিনের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে পা পা ক'রে মৃত্যু আসতে লাগল। ওয়াং আর তার সন্তানেরা এতদিনে বুঝতে পারল ওলান্ এ-গৃহের কি ছিল, কি স্বাচ্ছন্দ্যে কি সুখে সকলকে ঘিরে রেখেছিল, কাউকে কিছু জানতে দেয়নি।

তাই আজ কেউ কিছু জানে না। জানে না উনুন ধরাতে, জানে না মাছ না ভেঙে না পুড়িয়ে ভাজতে, জানে না কোন্ তরকারীতে কি তেল পড়বে। টেবিলের তলায় এঁটো পড়ে থাকে যতক্ষণ না ওয়াং নিজে দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে হয় কুকুর ডাকিয়ে খাইয়ে দেয়, নয় মেজ খুকীকে দিয়ে পরিষ্কার করায়।

শিশুর মত অসহায় স্থবির ঠাকুরদাদার সেবা ক'রে ছোট ছেলেটাই তার মায়ের স্থান পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। ওয়াং কিছুতেই এই বৃদ্ধশিশুকে বোঝাতে পারে না আর তার বৌমা তাকে গরম জল এনে দেবে না, বিছানায় শুইয়ে দেবে না, হাত ধরে বিছানা থেকে তুলে দেবে না। ক্ষণে ক্ষণে বৌকে ডাকে বৃদ্ধ—এবং না পেয়ে ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। জেদী শিশুর মত রাগ ক'রে চায়ের বাটী ছুঁড়ে ফেলে দেয়—বৌ না দিলে খাবে না—! একদিন ওয়াং ওকে ধ'রে ধ'রে ওলান্‌এর বিছানার কাছে নিয়ে আসে। বৃদ্ধ তার ছানি-পড়া চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কি যেন বলে অস্পষ্ট স্বরে, কেঁদে ওঠে—বোঝে সুর কেটে গেছে।

জড়বুদ্ধি বোবা মেয়েটাই কেবল কিছু বুঝল না। তেমনি হেসে, তেমনি ন্যাকড়ার ফালি পাকিয়ে তার দিন যায়। ওর কোনো জ্ঞান, কোনো অভাব বোধ নেই। কাজেই ওর কথা একজনকে মনে রাখতেই হয়! ওকে খাওয়ানো, শোয়ান, বাইরে এনে রোদে বসান, আবার ঘরে নিয়ে যাওয়া—সব মনে ক'রে ক'রতে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝেই ভুল হয়, ওয়াং নিজেও ভোলে। একদিন ভুলে বেচারা সারারাতই বাইরে পড়ে রইল। ভোরের দিকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেচারা কেঁদে উঠল। ওয়াং শুনতে পেয়ে ভয়ানক রেগে গিয়ে সব ছেলে মেয়েদের খুব গালাগালি করল—মায়ের পেটের বোনটা, অবোলা মানুষ, তার কথা ওরা ভুলল কি ক'রে। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারে—ওরা ছেলেমানুষ। নেহাৎ ছেলেমানুষ। কত আর ক'রবে। তাও তো মায়ের স্থান পূর্ণ ক'রতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বেচারারা। পেরে ওঠেনা, কি আর ক'রবে। এরপর থেকে বোবা মেয়ের ভার ওয়াং নিজের হাতেই তুলে নেয়।

ওয়াং এখন আর কাজকর্ম একেবারে দেখে না। শীতের চাষ আর জন্দের ভার সম্পূর্ণ চিংএর হাতে ছেড়ে দিল। চিং প্রাণ দিয়ে খাটে। দু'বেলা ওলান্এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে রোগিণীর সংবাদ নেয়। আজ একটু স্থপ খেয়েছে, আজ ভাতের মণ্ড খেয়েছে—এমনি ধারা একই কথা রোজ ব'লে ব'লে ওয়াং বিরক্ত হ'য়ে চিংকে আর জিজ্ঞাসা ক'রতে বারণ ক'রে দেয়। তাকে যা কাজ দেওয়া হ'য়েছে তাই সে ভাল ক'রে করুক, তা'হলেই যথেষ্ট হবে।

ওয়াং ঘুরে ঘুরে এসে ওলান্এর পাশে বসে; ওর শীত ক'রলে মাটির উনুনটায় কাঠ-কয়লা জেলে এনে বিছানার পাশে রেখে দেয়। ওলান্এর বড় অস্বস্তি বোধ হয়। বলে: 'অত বাজে খরচ ক'রোনা, বড় পয়সা নষ্ট হচ্ছে।' রোজই ও কথা শুনে শুনে সেদিন ওয়াং ভয়ানক চটে গিয়ে বলল: 'ও কথা বলো না, আমি সইতে পারি না। জমাজমি সব বেচে ফেলব দেখি তোমায় সারিয়ে তুলতে পারি কিনা।'

শুনে ম্লান হেসে ওলান্ হাঁপাতে হাঁপাতে অস্পষ্ট স্বরে বলে: 'না—না, সে কক্ষনও হ'তে দেব না—আমি তো চলেছি—। আজ হোক কাল হোক—যাবই—কিন্তু আমার মাটি যেন থাকে—ওতে হাত দিও না—।'

ওলান্ মরবে এ ওয়াং কিছুতে সইতে পারবে না—ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু তবুও ওয়াং জানে ওই কথাই সত্য—ওলান্‌এর আর বেশীদিন নেই। ওকে কর্তব্য করতেই হবে। সুতরাং একদিন সহরে কফিনের দোকানে গিয়ে অনেক বেছে বেছে শক্ত ভারী কাঠের তৈরী কালো রংয়ের একটা কফিন কিনে নিয়ে এল। ধূর্ত মিস্ত্রী কাছেই দাঁড়িয়েছিল, বলল :

'দেখুন, দুটোই একসঙ্গে নিন না, দাম অনেক কম হবে। নিজের জন্য নিয়ে নন্ না একটা, নিশ্চিন্ত থাকবেন।'

'না হে, তার দরকার নেই, সে আমার ছেলেরাই করবে—' ওয়াং উত্তর দেয়। তারপর বাবার কথা মনে প'ড়ে যায়—তাঁর কফিন তো কেনা হয়নি এখনও। মিস্ত্রীর কথাটা মনে লাগল। বলল :

'ভালো কথা মনে ক'রেছ হে! বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর তো দিন ফুরিয়েই এল। তা দাও, দুটোই নেব।'

আবার ভালো ক'রে কালো পালিশ লাগিয়ে কফিন জোড়া ওয়াঙের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে, মিস্ত্রী বলল। ওয়াং স্ত্রীকে কফিন কেনার কথা বলল এসে। ওলান্ শুনে খুব খুসী হ'ল—ওর ওপারে যাবার রাজসিক বন্দোবস্ত ক'রেছে যে ওয়াং।

দিনের বেশী ভাগ সময়ই ওয়াং ওলান্‌এর পাশে ব'সে থাকে। কথা বড় একটা হয় না। ওলান্ বড় দুর্বল। তাছাড়া কোন্ দিনই বা ওদের মধ্যে বেশী কথা হ'য়েছে। মাঝে মাঝে ওলান্‌এর কেমন ভুল হয়ে যায়। ও কোথায় আছে তাও ভুলে যায়। অস্পষ্ট স্বরে ছোটবেলাকার কথা জ্বরের ঘোরে বলে যায়। ওয়াং পাথরের মূর্তির মত বসে বসে শোনে। প্রলাপের টুক্‌রো টুক্‌রো কথার ফাঁকে ওলান্‌এর মর্মখানি এই প্রথম ওয়াং দেখতে পায়।

'আমি মাংস দরজার কাছে পর্যন্ত দিয়ে আসব· ·আমি জানি গো আমি কালো কুচ্ছিৎ দেখতে, কর্তার সামনে যাবার মত চেহারা আমার নেই—'

হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলে :

'মেরোনা, মেরোনা—আর খাব না চুরি ক'রে—'

—বাবা গো···মা গো···কোথায়···জানি জানি···আমি কালো···আমার

রূপ নাই ··তাই আমায় কেউ ভালোবাসতে পারে না···' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই কথাই বার বার বলে।

'আমি কালো কুচ্ছিৎ আমায় কেউ ভালোবাসতে পারে না···' ওয়াঙের যেন পাঁজর ভেঙে যায়, সহ্য ক'রতে পারে না। ওলান্‌এর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়—রুক্ষ মস্ত বড় হাতখানা, শক্ত, যেন মৃতদেহের হাত। ব'সে ব'সে অবাক্ হ'য়ে ভাবে, বড় দুঃখ হয়—ওলান্ সত্যি কথাই বলেছে—ওর রূপ নেই, ওকে কেউ ভালোবাসতে পারে না—ওয়াংও পারেনি। ওলান্‌এর হাতখানা হাতের মধ্যে ধরা, ওয়াং একান্ত ক'রে চায় স্পর্শের ভেতর দিয়ে ওর ভালোবাসা ওলান্‌এর অন্তরে যেয়ে পৌঁছাক। কিন্তু কোথায় ভালোবাসা? ওয়াং নিজের কাছেই বড় লজ্জিত হয়। এতটুকু মমতাও তো ওয়াং খুঁজে পায় না। কমল একটুখানি অভিমান ক'রলে ওয়াঙের হৃদয় গ'লে যায়, উথলে ওঠে। কোথায় ওলান্‌এর জন্য সেই প্রাণ গলে-যাওয়া—সেই উথ্‌লে-ওঠা? ওয়াং ভালোবেসে তো মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর শীতল হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়নি। মমতা? করুণা? কুৎসিৎ হাতখানার দিকে তাকালেই মন ঘৃণায় বিরূপ হ'য়ে ওঠে—কোথায় করুণা? ওয়াঙের নিজের' পরেই বেশী দুঃখ হয়।

অন্তরের এই দৈন্যের ক্ষতিপূরণ ক'রতে ওয়াং বাইরে ওলান্‌এর জন্য বড ব্যগ্র হয়ে ওঠে: ওর জন্য বেছে বেছে ভালো ভালো খাবার জিনিষ আনে। আরামের সব রকম বন্দোবস্ত ক'রে দেয়। কোনোদিকে কোনো ফাঁক রাখে না। দিন রাত মৃত্যুর এই বিভীষিকা দেখে দেখে ক্লান্ত ওয়াং একটু শান্তির জন্য কমলের কাছে যায়, কিন্তু ওলান্‌কে ভুলতে পারে না। কমলকে বাহুবন্ধনে বাঁধতে যায়—বাহু শিথিল হয়ে খসে পড়ে।—ওলান্—

মাঝে মাঝে ওলান্‌এর চেতনা ফিরে আসে। একদিন জ্ঞান হ'লে ও কোকিলাকে ডাকল। ওয়াং অবাক হ'য়ে ওকে ডেকে আনল। ওলান্ ধীরে ধীরে হাতের ওপর কম্পিত দেহটার ভার রেখে ওঠে। তারপর অতি সহজ সাধারণ ভাবে বলে যায়:

'কোকিলা তোমার চেহারা ভালো ছিল। তাই জমিদার বাড়ী তুমি খোদ কর্তার সোহাগী হয়েছিলে। আমি কারো সোহাগী হতে পারিনি, কিন্তু আমি

আমার স্বামীর স্ত্রী। আমার স্বামীর সন্তান গর্ভে ধরেছি। তুমি তো যে দাসী সে দাসীই রয়ে গেলে।'

কোকিলা খুব রেগে একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওয়াং মিনতি ক'রে থামিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলে : 'যেতে দাও। ওর কি জ্ঞান আছে? কি বল্‌ছে নিজেই জানে না।'

ওয়াং ফিরে এসে দেখে ওলান্ তখনও সেই ভাবে হাতে মাথা রেখে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। ওয়াংকে দেখে বলল :

'আমি মরলে ওরা—ওই দাসী মাগী—আর তার মুনিব ঠাকুরুণ—কেউ যেন আমার এ ঘরে না আসে,—দেখো। আমার কোনো জিনিসে—যেন হাত না দেয়। যদি দেয়—তা'হলে—আমার আত্মা এসে—ওদের ঘাড়ে চাপবে।'

ব'লেই মাথা বালিশে ঢ'লে পড়ল।

নূতন বছরের উৎসবের আগের দিন হঠাৎ ওলান্‌এর অবস্থা ভালোর দিকে গেল। বহুদিন পরে ওর জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে ফিরে এল। ওলান্ একেবারে স্বাভাবিক হ'য়ে গেল। নেব্‌বার আগে প্রদীপটি যেন শেষবারের মত জ্বলে উঠল। বিছানায় উঠে বসে নিজেই চুল বাঁধল। চা চেয়ে খেল। ওয়াং ঘরে এলে বলল :

'কাল না নতুন বছর! পিঠে টিঠে কিছুই তো হয়নি। কেই বা করবে। কিন্তু ঐ দাসী-মাগী যেন আমার রান্নাঘরে না ঢোকে। তুমি এক কাজ কর। লোক পাঠিয়ে আমার বড় খোকার যে পাত্রী ঠিক ক'রেছ তাকে নিয়ে এস! আমার ঘরের লক্ষ্মীকে তো দেখিনি এখনও। সে আসুক। তাকেই আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

এ বছর উৎসবের কথা ওয়াঙের মনেই হয়নি। কিন্তু ওলান্‌কে উঠে বসতে দেখে ওর বড় আনন্দ হল। কোকিলাকে পাঠিয়ে দিল লিউএর কাছে। সব শুনে লিউ যখন দেখল যে ওলান্ শীতটা কাটিয়ে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ, আর এদিকে মেয়ের বয়সও ষোল হ'য়েছে—তখন আর আপত্তি করল না। এমন বয়সে অনেক মেয়েই স্বামীর ঘর করে।

বিনা আড়ম্বরে নিঃশব্দে সিডন্ চেয়ারে ব'সে বৌ ঘরে এল। সাথে এল শুধু মেয়ের মা আর একজন বুড়ী ঝি। মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে মা চ'লে গেল—ঝি রইল।

ছোট ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে সেই ঘরটাই বৌকে দেওয়া হ'ল। ওয়াং

নূতন বৌএর সাথে কথা কয় না—বলা রীতি নয়। কিন্তু বৌ এসে যখন প্রণাম ক'রল, ও গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে প্রণাম গ্রহণ করল। মেয়েটিকে ওর বড় ভালো লাগল, সুশীলা লক্ষ্মী মেয়ে—রীত্ সহবৎ জানে—চলে যখন শব্দটি হয় না। পরমাসুন্দরী না হলেও চেহারাখানা ভালোই। বেশী সুন্দর না হওয়া—সে একরকম ভালোই—গুমর হয় না। কথায় বার্তায় ব্যবহারে কোনো খুঁৎ নেই। ওলান্এর সেবার ভারও বৌ নিজের হাতে তুলে নিল। ওল্যান্ও বড় সুখী হ'ল, ওয়াংও অনেকটা হাল্কা হ'ল।

তিন চারদিন ওলান্ খুব প্রফুল্লই রইল। সেদিন ওর মনে আর একটা কথা এল। ওয়াং ভোরে ওকে দেখতে এলে বলল :

'মরার আগে আর একটা কাজ দেখে যেতে চাই।'

ওয়াং চটে গেল।

'রোজই খালি মরব মরব কর। ওই কথা শুনতে বুঝি আমার খুব ভালো লাগে ভাব?' ওলান্এর মুখে ঈষৎ একটু ম্লান হাসি জেগে ওঠে। চিরকালের সেই স্বল্পায়ু মন্থর হাসি যা চোখে ধরা দেবার আগেই মিলিয়ে যায়।

'মরব না বললেই কি আমায় ধ'রে রাখতে পারবে?' ওলান্ বলে : 'আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিছুতেই আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু আমার বড় খোকাকে না দেখে, তার বিয়ে না দেখে আমার মরণ হবে না। বৌমা আমার লক্ষ্মী মেয়ে, কি সেবাটাই আমার করে—কখন মুখ ধোয়াতে হবে, কখন কি ক'রতে হবে সব জানে। কিছু বলতে হয় না। বেদনা উঠলে ঠিক বুঝতে পারে। খোকাকে বাড়ী আনো। তার বিয়ে দাও। আমায় দেখতে দাও—আমাদের নাতি, আমার শ্বশুরের ভাবী বংশধরদের আসার পথ খুলল। তবে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব, সুখে মরতে পারব।'

স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায়ও ওলান্ এতগুলো কথা এক সঙ্গে কখনও বলেনি। বড় আবেগ দিয়ে কথাগুলো বলল। এত মাসের মধ্যে একদিন অমন ক'রে ওলান্ কথা কয়নি। অমন সবল স্বর একদিনও শোনেনি—অমন জোর ক'রে কিছু চায়ওনি। আজ ওর কথা কওয়ার জোর, চাওয়ার জোরে ওয়াং বড় আনন্দিত হ'ল। যদিও বিয়ের মত অতবড় একটা কাজ এত হুট্ ক'রে ক'রে ফেলতে ওর মন মোটেই চাইল না। কিন্তু ওলান্এর আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিতেও ইচ্ছে হ'ল না। সুতরাং সাগ্রহে বলল :

'তাই হবে, তাই হবে। আজই লোক পাঠাচ্ছি। যেখানে পার খোকাকে খুঁজে নিয়ে আসবে। ও এলেই বিয়ে হবে। তাতো হ'লো, কিন্তু তুমি বল, কথা দাও—তুমি ভালো হ'য়ে উঠবে, মরবে না। তুমি প'ড়ে থাকায় বাড়ীটা যে বন হ'য়ে উঠেছে।'

ওলানকে খুশী করার জন্ত ওয়াং কথাগুলো বলল। ওলান্ খুশী হ'ল। কিন্তু আর কথা বলল না। মৃদু হেসে নিঃশব্দে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজল।

সেই দিনই ওয়াং নাংএন্‌কে আনতে লোক পাঠাল। তাকে মায়ের সংবাদ জানিয়ে বলতে ব'লে দিল যে ওকে না দেখে, ওর বিয়ে না দিয়ে সে নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারছে না। বাপমার ওপর যদি এতটুকু টান থাকে নাংএন্ যেন দ্বিতীয় নিশ্বাস ফেলার আগে চ'লে আসে। সেদিন থেকে তিন দিন পরে বিয়ে হবে, সব আয়োজন ঠিক থাকবে। চারিদিকে লোকজন নেমতন্ন করা হবে, সুতরাং সে যেন দেরী না করে।

ওয়াং কথা মত কাজে লেগে গেল। কোকিলাকে ডেকে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ক'রতে বলে দিল। সহর থেকে রান্নার লোক আসবে—আয়োজন খুব ভালো হওয়া চাই। কোকিলার হাতে একরাশ টাকা ঢেলে দিয়ে বলল :

'বিয়ে খাওয়ার সময় জমিদার বাড়ী যেমন হত' ঠিক সে রকম সব হওয়া চাই কিন্তু। টাকা যত চাই দেব।'

তারপর গ্রামের আর সহরের এমন কি রেস্তরাঁয় বাজারে যত লোককে জানত সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে এল। কাকাকেও তাদের সব পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের বলতে ব'লে দিল। কাকা যে কে সে কথা তো ওয়াং ভোলেনি। যে মুহূর্ত থেকে এ লোকটার আসল পরিচয় ওয়াং পেয়েছে সে মুহূর্ত থেকে ও এর সঙ্গে সম্মানিত অতিথির মত ব্যবহার করে।

বিয়ের আগের দিন নাং এন্ বাড়ী এল। ছেলেকে দেখে দু'বছর আগের সব কথা ওয়াং ভুলে গেল। দু'বছরেরও বেশী পরে ছেলের সাথে দেখা। সেদিনের বালক আজ সবল সুদর্শন যুবক—দীর্ঘ, ঋজু সুগঠিত অবয়ব। ছোট ছোট উজ্জ্বল কালোচুলের রাশ মাথায়—উঁচু গালের উপর স্বাস্থ্যের লালিমা। দক্ষিণী ফ্যাসানে তৈরী গভীর লাল সাটীনের আচ্‌কান গায়ে, তার ওপর কালো মখ্‌মলের আস্তিনহীন কোট। এই সুদর্শন যুবক ওয়াঙের ছেলে—ওয়াঙের গর্ব আর ধরে না। ওরই ছেলে, ওরই ছেলে—এই যুবক! বিগত

দিবের সব গ্লানিকর ইতিহাস মুছে দিয়ে এই কথাটাই জেগে রইল। ওয়াং ছেলেকে তার মায়ের কাছে নিয়ে এল।

মায়ের বিছানার পাশে এসে বসল নাং। মায়ের চেহারা দেখে দু-চোখ ছাপিয়ে জল এল। কিন্তু রোগীর সামনে মুখের হাসি রাখতে হয়। তাই মুখে প্রফুল্লতা টেনে এনে বলল: 'তোমাকে তো অনেক ভালো দেখাচ্ছে মা! কোথায় তুমি মরবে এখন?'

ওলান্ শুধু বলল: 'নারে, তোর বিয়ে না দেখে মরব না।'

বিয়ের আগে বরের কনেকে দেখতে নেই। তাই কমল কনেকে তার নিজের মহলে নিয়ে এল। বিয়ের খুঁটিনাটি কমল, কোকিলা আর খুড়ী খুব ভালো ক'রেই জানে। বিয়ের দিন সকালে কনেকে খুব ভালো ক'রে স্নান করিয়ে প্রথমেই নূতন সাদা কাপড় দিয়ে পা বেঁধে ওপরে সাদা মোজা পরিয়ে দিল। কমল নিজের মাখবার সুগন্ধি বাদাম তেল দিয়ে ওর দেহ চর্চিত ক'রে দিল। এবারে পোশাকের পালা। প্রথম ফুলকাটা সাদা সিল্কের জামা—তার ওপর অতি সূক্ষ্ম পশমী জামা। সব ওপরে লাল সাটীনের বিয়ের পোশাক—এ সবই কনের নিজের বাড়ী থেকে এসেছে। ফিতে দিয়ে নিপুণ হাতে কপালের উপরকার কৌমার্যের চিহ্ন ঝালরের মত চুলগুলি পেছনে টেনে বেঁধে দিয়ে কপালটিকে সুপ্রশস্ত ক'রে দেয়। নূতন সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রশস্ত ললাট প্রয়োজন। পাউডার রুজ প্রভৃতি দিয়ে মুখের প্রসাধন ক'রে তুলি দিয়ে সুন্দর ক'রে দুটি সুদীর্ঘ ভ্রূ টেনে দেয়। মাথায় মুকুট আর পুঁতি-বসান অবগুণ্ঠন তুলে দিয়ে পায়ে পরায় ফুল-তোলা জুতো। নখ রাঙিয়ে হাত দু'খানি ক'রে দেয় সুবাস-স্নিগ্ধ।

বিয়ের আসর হ'য়েছে মাঝের ঘরে! ওয়াং, তার বাবা, কাকা, অতিথি অভ্যাগত সকলেই এসেছে। কনে আনা হল। বাপের বাড়ীর দাসী আর খুড়ীর হাতে ভর ক'রে, ব্রীড়া-কুণ্ঠিত পদে ঠিক কনের যেমন ক'রে চলা উচিত তেমনি ক'রে কনে সভায় এল। বিয়েতে যেন নেহাৎ অনিচ্ছা, যেন ওকে নেহাৎ জোর ক'রেই ধরে আনা হচ্ছে—চলার ভঙ্গিতে এমনি একটা স্বেচ্ছাকৃত-দ্বিধার ভাব কনের বিনয়, লজ্জা, শীল ও ব্যবহার-শাস্ত্রের নিখুঁত জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। ওয়াং সানন্দে নিজের মনে স্বীকার ক'রে নিল—যে বৌ হবার উপযুক্ত মেয়ে বটে।

এরপর এল বর। পরনে সেই লাল আচ্‌কান আর কালো মখমলের

কোট্‌টি। চুল পরিপাটি ক'রে আঁচড়ান: মুখ সত্ত ক্ষুর-সংস্পর্শ-মসৃণ। পেছনে ছোট ভা'ই দুটি। একসঙ্গে তিন ছেলেকে দেখে ওয়াঙের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। ওয়াঙের পর এই বলিষ্ঠ সুদর্শন পুত্রেরাই তো ওয়াঙের বংশের ধারাকে, ওর দেহের মধ্যে যে প্রাণের প্রবাহ রয়েছে, সেই প্রবাহকে ধরিত্রীর বুকে প্রবহমান রাখবে।

বৃদ্ধ ওয়াঙের বাবা কি যে ব্যাপার হচ্ছে বিশেষ কিছুই এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। কানের কাছে চীৎকার ক'রে বলা কথার দু' একটা টুকরো মাত্র মাঝে ছিট্‌কে ওর কানে গেছে। হঠাৎ যেন সব বুঝতে পারল বৃদ্ধ। উচ্চ হেসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কলকণ্ঠে বার বার বলতে লাগল:

'বুঝেছি—বিয়ে হচ্ছে বিয়ে! বিয়ে মানেই তো ছেলে তা'পরে তার ছেলে ...হাঃ হাঃ—'

বৃদ্ধের উচ্ছ্বসিত হাসিতে সমাগত অতিথিরা সবাই হেসে ওঠে। ওয়াঙের কেবলি মনে হয়—ওলান্ যদি ভালো থাকত তবে ষোলকলা পূর্ণ হ'ত।

ওয়াঙের চোখ বরাবরই রয়েছে ছেলের দিকে। ছেলে কখন কনের দিকে তাকায় ওকে দেখতে হবে। সুযোগ বুঝে ছেলে অপাঙ্গে কনেকে একবার দেখে নিল—ওর মুখে চোখে চলায় বসায় খুশী দুলে উঠল। ওইটুকুই তো ওয়াং দেখতে চেয়েছিল। তা হ'লে বৌ মনে ধরেছে ছেলের। হবে না—কেমন মেয়ে এনেছে ওয়াং।

বর-কনে একসঙ্গে প্রথমে ওয়াঙের বাবা, তারপর ওয়াংকে প্রণাম ক'রে ওলান্‌এর ঘরে এল। ওলান্ আজ তার পোশাকী জামাটি আনিয়ে পরেছে। ছেলে বৌ ঘরে আসতে বিছানায় উঠে বসল। ওর মুখে দুটো লাল দাগ আগুনের মত জল্ জল্ ক'রছে। ওয়াং ভুল ক'রে বসল। ভাবল রক্তহীন দেহে রক্ত হ'য়েছে, মুখে তারি আভা ফুটেছে। আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল: 'এই তো বেশ একটু ভালো দেখাচ্ছে। সেরে উঠলে বলে।'

ছেলে বৌ সামনে এসে প্রণাম করে। বিছানাটা দেখিয়ে দিয়ে ওলান্ বলে: 'বসো এখানে আমার কাছে। আমার সামনে বসেই তোমরা বিয়ের সুরা আর অন্ন মুখে তুলবে। আমি নিজের চোখে দেখব। আমি তো যাবার পথে। আমি ম'রে গেলে এই খাটেই তোমরা শোবে।'

ওলান্‌এর কথায় কেউ কোনো উত্তর করল না। বর-কনে নীরবে, সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হ'য়ে পাশাপাশি বসে থাকে। তারপর ওয়াঙের খুড়ী তার মোটা

দেহ আর মুখে ব্যস্ততা নিয়ে দুই গ্লাস উষ্ণ সুরা নিয়ে আসে। বর-কনে প্রথম আলাদা আলাদা পান করে। পরে দু' গ্লাসের সুরা এক সঙ্গে মিশিয়ে অর্থাৎ এই দুইটি অচেনা প্রাণী যে আজ হ'তে আর আলাদা রইল না, আলাদা গ্লাসের সুরা যেমন মিশে এক হ'ল, তেমনি এদের জীবনও যে আজ হ'তে মিশে একেবারে এক হ'য়ে গেল—ওই কথাই বলা হয় ওতে। ভাত এলে তাও মিশিয়েই খেতে হয়। এখানেই বিয়ের সব আচার-কৃত্য শেষ হয়ে যায়, এবং বিয়ে শেষ হয়। তারপর বর-কনে আবার একসঙ্গে ওলান্‌কে প্রণাম ক'রে আসরে এসে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতকে প্রণাম করে। বিয়ের পর্ব শেষ হয়ে যায়।

এর পর ভোজ পর্ব। আঙ্গিনায়, ঘরে, সব জায়গায় টেবিল ফেলে জায়গা করা হ'য়েছে। রান্নার গন্ধ আর হাসির কোলাহলে বাড়ী মুখর। বহু দূর' দূরান্তর থেকে নিমন্ত্রিতের দল এসেছে। ধনী ওয়াঙের ধনের খ্যাতি চাপা নেই। এত বড় একটা ব্যাপার দু' দশ পঞ্চাশ জন বেশী খেয়ে গেলে এরকম ঘরে টেরও পাওয়া যায় না, আর গেলেও তার জন্য কারো বুক চড়্ চড়্ করে না। বোধ হয় এই কথা স্মরণ করেই—নিমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে অনিমন্ত্রিত যারা এসেছে তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ওয়াং এদের অনেককেই চেনে না, কোনো কালে দেখেওনি। কোকিলা রান্নার লোকের ব্যবস্থা সহর থেকেই করেছিল। তারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গামলা ভরা একেবারে তৈরী রান্না নিয়ে এল, খাবার সময়ে গরম ক'রে দিলেই চলবে। ভোজ্যের তালিকার মধ্যে এমন বহু জিনিস ছিল যা সাধারণ গৃহস্থ ঘরের উনুনে হয় না। তাই একেবারে সহর থেকেই খাবার তৈরী হ'য়ে এসেছে। পাচকের দল সগর্বে, নোংরা দাগ ভরা এপ্রণ উড়িয়ে ভয়ানক ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। অতিথিরা খেয়ে চলে—যে যত পারে। থামে যখন আর তিলটিও পেটে ধরে না। সকলেই আকণ্ঠ খেয়ে প্রাণ ভরে আনন্দ ক'রে ঘরে গেল।

ওলান্‌ তার ঘরের সব দরজা খুলিয়ে দিয়েছে—পরদা দিয়েছে সরিয়ে। ও এই আনন্দের কোলাহল শুনবে, নিশ্বাসের সঙ্গে খাবারের সুঘ্রাণ গ্রহণ ক'রবে। ওয়াং ফাঁকে ফাঁকে বার বার ওলান্‌কে দেখতে আসে, আর বার বার ওলান্‌ জিজ্ঞাসা করে: 'সকলে ঠিকমত মদ পেয়েছে তো, মিঠে ভাতটায় বেশ বেশী ক'রে চর্বি চিনি আর মেওয়া দেওয়া হ'য়েছে তো?

ওটা যেন খুব গরম গরম খাওয়ার ঠিক মাঝা-মাঝি দেয়া হয়···' এমনি ধারা হাজারো খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওলান্ বিছানা থেকেই নির্দেশ দেয়।

সব ঠিক আছে—যেমনটি সে চেয়েছিল ঠিক তেমনই হ'য়েছে সব কাজ। শু'নে ওলান্ শান্ত হ'য়ে শোয়—ওর মনে ভরা সুখ। বাইরে থেকে উৎসবের কোলাহল কানে আসে···।

ধীরে ধীরে অতিথিরা চ'লে যায় এক এক ক'রে। উৎসবের কোলাহল থেমে গিয়ে বাড়ীখানার ওপর গভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। ওলান্এর ওপরও অবসাদ নেমে আসে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হ'য়ে আসে। ছেলে বৌকে ডাকে। ওরা এলে বলে :

'আমার সব সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। এখন আর আমার মরতে দুঃখ নেই। খোকা, বাবা—তোর ঠাকুর্দাকে দেখিস। আর বৌমা, স্বামীর সেবা ক'রো। শ্বশুর আর ঐ অথর্ব বুড়ো রইল মা, তাদের দেখো।···ওই বোবা হতভাগী—ওকে—ওকেও তোর হাতেই সঁপে দিলাম—ওর আর কেউ রইল না। এ ছাড়া আর কারো ওপরে তোর কোনো কর্তব্য নেই।'

শেষের কথা কটি ওলান্ কমলকে লক্ষ্য ক'রে বলে। আবার বলতে বলতে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত পরে একটু যেন জেগে উঠে আবার কথা বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু চেতনা একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায়। ও কোথায় আছে, ছেলে, বৌ যে পাশে দাঁড়িয়ে—সব ভুলে গেল। ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, মাথাটা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ ক'রতে লাগল। চোখ বন্ধ—ওলান্ বলতে লাগল—সম্পূর্ণ বিকার :

'জানি গো জানি, আমি কুৎসিৎ—আমার এতটুকুও রূপ নেই—কিন্তু ছেলে তো পেটে ধরেছি···'

'···আমি দাসী-বাঁদী, কিন্তু তবু তো ছেলের মা···'

তারপর হঠাৎ খুব জোর দিয়ে বলে উঠলো : 'ঐ ওটা···আমার মত ক'রে পারবে স্বামীর সেবা ক'রতে ?···রূপ থাকলেই তো আর ছেলে পেটে ধরা যায় না—'

বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে বিকারগ্রস্ত ওলান্ প্রলাপ বকে চলে। ওয়াং সকলকে চলে যেতে ব'লে নিজে পাশে বসে রইল। ঘোর বিকার—এই একটু জেগে উঠে প্রলাপ বকে—পর-মুহূর্তেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে এলিয়ে পড়ে। ওয়াং ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকে। কি দেখছে

ওয়াং ? বিশীর্ণ, বিস্ফারিত কালো ঠোঁট জোড়া দু'দিকে ফাঁক হয়ে গিয়ে দাঁত' গুলো বেরিয়ে পড়েছে ওলান্এর—কুৎসিৎ বীভৎস। মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর শয্যায় বসে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল ওইটুকু ওয়াঙের চোখে পড়ল ? ছিঃ ছিঃ। একি লজ্জা! নিজের কাছেই বড় লজ্জিত হ'ল ওয়াং। বড় অপরাধী মনে হ'ল নিজেকে।

হঠাৎ ওলান্এর চোখ দুটি সম্পূর্ণ খুলে গেল—একটা যেন কুয়াশা নেমে এল দৃষ্টির ওপর—ওলান্ পূর্ণ দৃষ্টি ওয়াঙের মুখের উপর রেখে বার বার দেখতে লাগল—যেন অচেনা কাউকে চিনবার চেষ্টা ক'রছে। হঠাৎ মাথাটা বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল—একটু কেঁপে উঠেই দেহটা একেবারে স্থির হ'য়ে গেল।

মৃত ওলান্এর সান্নিধ্য এক মুহূর্তও আর ওয়াং সইতে পারল না কিছুতেই। খুড়ীকে ডেকে মৃত দেহটাকে স্নান করাতে ব'লে দিল। ওয়াং আর ঘরে ঢুকতে পারল না—ওর পা সরল না। স্নান করান হয়ে গেলে খুড়ী, নাং এন্ আর বৌ মিলে দেহটা কফিনের মধ্যে পুরে ফেলল। ওয়াং ভুলে থাকার জন্য এ কাজ সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। কফিনটা বন্ধ করানর আবার নানা রকম নিয়ম রয়েছে—লোক ডাকতে ওয়াং নিজেই সহরে চলে গেল। পণ্ডিতের কাছে গিয়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার একটা শুভদিন ঠিক ক'রে এল। তিন মাসের মধ্যে দিন নাই—তারই মধ্যে প্রথম যেটি পেল পণ্ডিত সেইটিই ওকে বলে দিল। পণ্ডিতকে তার ফী দিয়ে সহরের বড় মন্দিরে এল। সেখানে পুরুতের সঙ্গে অনেক দর কষাকষি ক'রে এ ক'মাস কফিনটা রাখবার জন্য মন্দিরের মধ্যে একটু জায়গা ভাড়া ক'রে এল। বাড়ীর মধ্যে কফিন্টা দিনরাত চোখের সামনে থাকবে—ওয়াং কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। কফিন্টা এনে মন্দিরে রেখে ও নিশ্চিন্ত হ'ল।

মৃতের প্রতি কোনো কর্তব্যে এতটুকু ত্রুটি ওয়াং থাকতে দেয় না। পরিবারের সকলকেই শোকচিহ্ন ধারণ করতে হ'ল। পুরুষেরা সাদা মোটা কাপড়ের জুতো পরল, আর গোড়ালীর কাছে সাদা ফিতে বাঁধল। স্ত্রীলোকেরা সাদা ফিতে দিয়ে চুল বাঁধল।

ওয়াং আর ওলান্‌এর ঘরে আসতে পারে না—ওর নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। কাজেই জিনিসপত্র নিয়ে ও একেবারে কমলের মহলে চ'লে এল। বড় ছেলেকে ডেকে বলল: 'তোমরা দুজনে এখন থেকে ও ঘরে থাকবে। তোমার মা যতদিন ছিল ওই ঘরেই ছিল। চোখও বুজল ওই ঘরেই। তোমার জন্ম ওখানেই হ'য়েছে। তোমার ছেলেদেরও জন্ম ওখানেই হোক।'

ছেলে বৌ খুশী হ'য়েই ও ঘরে বাসা বাঁধল।

মৃত্যু একমাত্র ওলান্‌কে নিয়ে শান্ত হ'ল না। এর পরে এল ওয়াঙের বাবার পালা। ওলান্‌এর মৃত্যু—আর তার শক্ত শীতল দেহটাকে কফিনের মধ্যে পুরতে বৃদ্ধ চোখের সামনে দেখেছিল। সেদিন থেকে কেমন যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠল। তারপর একদিন সেই রাতে শুল আর জাগল না। ভোর বেলা ছোট খুকী চা নিয়ে গিয়ে দেখে—বৃদ্ধের প্রাণহীন দেহটা শক্ত হ'য়ে পড়ে আছে, মাথাটা পেছন দিকে এলিয়ে পড়া, দাড়িগুলো শূন্যে খাড়া হয়ে দাঁড়ান।

চীৎকার ক'রে ছোট খুকী কাছে ছুটে এল। এসে দেখে শুকন গাঁট-বহুল পাইন গাছের মত অস্থিসার স্থবির দেহটা কঠিন হিম-শীতল হয়ে পড়ে আছে। অনেকক্ষণ আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। বোধ হয় প্রথম রাতেই। ওয়াং নিজের হাতেই দেহটা স্নান করিয়ে কফিনে পুরে সীল ক'রে রাখল। দুজনের অন্ত্যেষ্টি সেই একদিনই হবে। পাহাড়টার ধারে ওর যে জমি আছে সেখানেই। ওয়াং মরলে তারও কবর ওখানেই হবে।

মাঝের ঘরে দুটো বেঞ্চ পেতে কফিনটা রেখে দিল। ওয়াঙের মনে হয় ঐখানে থাকলে ওর বাবার আত্মা শান্তি পাবে। তা ছাড়া কফিনের কাঠের আড়াল হলেও বাবা যেন কাছেই রইল। এই নৈকট্যের অনুভূতি ওর বিচ্ছেদের বেদনাকে অনেকটা সহজ ক'রে আনল। বৃদ্ধ-স্থবির পিতার মৃত্যুতে ওয়াঙের শোক হয় নি। বহু বছর থেকে জরাগ্রস্ত দেহে, বিকল, লুপ্তপ্রায় চেতনায় সে তো অর্ধমৃতই ছিল। কাজেই আজ তার পূর্ণমৃত্যুতে ওয়াঙেরশোক হয়নি। অর্ধমৃত হলেও এতদিন সেছিল—এইখানে, এই ঘরে—আজ সে নাই। ওয়াঙের বেদনা—বিচ্ছেদের বেদনা। কফিনটা কাছে রেখে ওর সে বিচ্ছেদের অনুভূতি আংশিক দূর হয়ে যায়।

তিনটি মাস দেখতে দেখতে চলে গেল। শীত গেল, বসন্ত এল। পণ্ডিতের নির্দিষ্ট অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিনও এসে পড়ল। 'তাও' মন্দিরের পুরোহিতরা

এলো—হলদে রংএর পোশাক, লম্বা চুল মাথার ওপর চুড়ো ক'রে বাঁধা। বৌদ্ধ মন্দিরের ধর্মযাজক এল কয়েকজন, পরনে লম্বা ঢিলে গ্রে রংএর আলখাল্লা মুণ্ডিত মস্তকে পবিত্র চিহ্ন ধারণ করা। সারারাত ঢাক বাজিয়ে মৃতের আত্মার শান্তির জন্য মন্ত্র-পাঠ চলে। মুহূর্তের জন্য থামলেই ওয়াং পুরোহিতদের হাতে টাকা গুঁজে দেয়। একটু বিশ্রাম ক'রে তারা আবার আরম্ভ করে।

ওয়াং নিজের জমিতে ছোট টিলাটার ওপর খেজুর গাছের তলাকার জায়গাটা বেছে রেখেছে। চিং সেটা মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দুটো কবর খুঁড়িয়ে রাখল। আরো অনেক জায়গা রইল পরিবারস্থ আর সকলের জন্য—ওয়াং তার ছেলে-বৌ, তাদের ছেলে মেয়ে, সকলের সমাধি এখানেই হবে। গমের পক্ষে জমিটা খুব ভালো ছিল কিন্তু ওয়াং স্বচ্ছন্দে এটা ছেড়ে দিল—ওয়াং-পরিবারের প্রতিষ্ঠা এবং স্থিতি তার নিজের মাটিতেই, তারি সাক্ষী হয়ে থাকবে ও সমাধি স্থান। জীবনে, মরণে ওয়াং-পরিবারে আপন মাটি আঁকড়ে ধরে থাকবে।

ভোর বেলা সারা-রাত-ব্যাপী মন্ত্র-কীর্তন শেষ হ'ল। এবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—পরিবারস্থ সকলেই যথারীতি শোক-চিহ্ন ধারণ ক'রে সমাধিস্থানে যাবে। ওয়াং তার ছেলে-মেয়ে-বৌ, কাকা তার ছেলে, সকলেরই রীতি অনুসারে সাদা মোটা কাপড়ের তৈরী শোক-বেশ পরল। ধনী ওয়াং এবং তার পরিবারবর্গ সাধারণ দরিদ্র কৃষকের মত হেঁটে যেতে পারে না। কাজেই সহর থেকে প্রত্যেকের জন্য ডুলি (সীডন্ চেয়ার) এল। এই প্রথম ওয়াং ডুলিতে চড়ল। ওলান্এর কফিনের পেছনে ওয়াং, আর তার বাবার কফিনের পেছনে কাকা। তারপর অন্য সকলে। কমলও এসেছে। ওলান্ বেঁচে থাকতে কমল তার সামনে যেতে সাহস করেনি—কিন্তু স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ক'রে প্রশংসা অর্জনের আশায় আজ সেও এল। ওয়াং বোবা জড়বুদ্ধি মেয়েটাকেও বাদ দেয়নি। সেও অন্যদের মত নূতন শোক-বেশ পরেছে। তার জন্যও ডুলি এসেছে—ডুলিতে বসে সেও আর সকলের মত চলেছে। কিন্তু ও বোঝে না কিছুই, অন্য সকলের কান্নার মধ্যে একা ওই হাসে—অর্থহীন শূন্য কর্কশ হাসি।

পেছনে চিং এবং কিষাণেরা চলে পায়ে হেঁটে। তাদেরও পায়ে সাদা জুতো। সারা রাস্তা সকলে উচ্চরোলে বিলাপ ক'রতে ক'রতে এল।

সমাধিস্থানে পৌছে ওয়াং এসে দু'টো কবরের মাঝখানে দাঁড়াল। বাবার ক্রিয়া প্রথম হবে। ওলান্‌এর কফিনটা ততক্ষণ নামিয়ে রাখা হ'ল। ওয়াং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—চোখে এক কোঁটা অশ্রু নেই। সকলেই চীৎকার ক'রে কাঁদছে, ওয়াঙের দুঃখ শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে। কেঁদে ক'রবেই বা কি, যা হবার তা হ'লো, ফেরানো যাবে না কিছু। ওয়াংও তার যথাকর্তব্য ক'রেছে—এর চাইতে বেশী আর কিইবা ক'রতে পারতো।

সব সমাধা হয়ে গেলে অন্য সবাইকে ডুলি ক'রে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু নিজে একা পায়ে হেঁটে ফিরল! ওর মনের অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ অতি স্পষ্ট অতি দীপ্ত হ'য়ে এই কথাটাই অনুশোচনায় জ্বলে উঠল—সেদিন ওলান্‌ যখন ঘাটে বসে কাপড় কাচছিল—কেন মুক্তো দু'টো ওয়াং ওর কাছ থেকে চেয়ে নিল! কেন নিলো! না নিলেই তো পারত'। এতদিন পরে আজ ওয়াঙের বড় দুঃখ হয়—কেন নিতে গেল মুক্তো দুটো! কমলকে আর ও-দুটো কাণে পরতে দেবে না। ওয়াং দেখতে পারবে না।

ক্লিষ্ট মনে একা পথ ভেঙ্গে চলে ওয়াং। চলতে চলতে মনে হয় জীবনের প্রথম অর্ধেক—হয়ত কিছু বেশীই হবে—আজ ওই মাটির তলায় চাপা পড়ল! জীবনের অর্ধেক কেন, ওর নিজেরই আধখানা আজ ওই কবরের মাটিতে ঢাকা প'ড়ে গেল। যে আধখানা বাকি রইল, সে একেবারে আলাদা—তার রূপ রং সবই অন্য রকম হ'য়ে যাবে।

হঠাৎ কয়েক কোঁটা জল ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল—ছোট ছেলের মত হাতের উল্টোদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে ও এগিয়ে চলল।

সাতাশ

এ কটা মাস ওয়াং ওর কাজকর্মের কথা একেবারেই ভাবতে পারেনি। বাড়ীতে বিয়ে গেল, দু-দুটো মৃত্যু এ সবের ঝঞ্ঝাট কম গেল না।

চিং একদিন এসে বলল :

'সব তো মিটে গেছে, এখন এদিকে একটু তাকাও। হাল তো তেমন ভালো ঠেকছে না।'

'সে আবার কি! কি হ'লো। কবর দেবার ওই মাটিটুকু ছাড়া যে আর আমার কিছু আছে এ ক'মাস একেবারেই সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বল দেখি, কি বলতে এসেছ?'

ওয়াং সসম্মানে দূরে দাঁড়িয়ে চিং-এর কথা শুনল। চিং ধীরে ধীরে বলল :

'ভগবান না করুন, মনে হচ্ছে এবার ভয়ানক বন্যা হবে। গ্রীষ্ম না আসতেই এরি মধ্যে বানের জল মাঠে এসে পড়েছে।'

ওয়াং রেগে গিয়ে বলে :

'ও ব্যাটার কাছ থেকে যদি এক ফোঁটা উপকার পাওয়া যায় কোনোদিন। গাদা গাদা ধূপই পোড়াও আর যাই কর। ব্যাটা আকাশে ব'সে মজা দেখে। চলো দেখি কি হ'ল।'

চিং ভীরু প্রকৃতির মানুষ। যতই দুর্গতি হোক না কেন ওয়াঙের মত অমন ক'রে ঠাকুর দেবতাকে গাল দিতে ওর সাহস হয় না। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি সব কিছুকেই ও ভগবানের ইচ্ছা বলে নিঃশব্দে মেনে নেয়। ওয়াং লাং সে প্রকৃতির নয়।

ওয়াং ঘুরে ঘুরে মাঠ ঘাট সব দেখল। চিং এর কথা সত্যি। জমিদার বাড়ী থেকে কেনা খাতের ধেনো জমিগুলো সব একেবারে কাদা-ভরা, খাতের জল তলা দিয়ে চুঁইয়ে আসে। চমৎকার গম হয়েছিল। সব হলদে হয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে।

খাতটা কানায় কানায় ভরে হ্রদের মত হ'য়ে উঠেছে। নালাগুলো ভরে যেন ছোটখাট নদী—বেশ স্রোত জলে, ছোট ছোট আবর্ত পাক খেয়ে খেয়ে ব'য়ে চলেছে। এ দেখে অতি নির্বোধও বুঝতে পারে যে এখনই যখন জলের এ অবস্থা, তখন আসল মৌসুমে বন্যা অবধারিত এবং আবার দুর্ভিক্ষ—আবার চারিদিকে মানুষের অনাহারে মৃত্যু। ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রে সব জমিগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখে—চিং চলে পেছনে ছায়ার মত। দু'জনে মিলে হিসেব করে কোন্ ক্ষেতটায় ধান এখনও লাগান' চলতে পারে, আর কোন্টা লাগাবার আগেই ডুবে যাবে। কানায় কানায় ভরা নালাগুলোর দিকে তাকিয়ে ওয়াং দেবতাকে গাল দেয় : বুড়ো এখন ওপরে বসে মজা দেখবে, দলে দলে মানুষ না খেয়ে মরবে ছটফট্ ক'রে। ফুর্তি হবে ওর। ও তো ওই চায়!

চিং ভয়ে কেঁপে ওঠে। বলে : 'কি কচ্ছ ভাই! শত হ'লেও দেবতা! গাল দিতে নেই অমন ক'রে।'

ওয়াং এখন আর দেবতাকে ভয় করে না।

আর রাগ না হয়ে পারে? অমন সুন্দর জমিগুলো ওর সব ডুবে গেল?

সবাই যেমন আশঙ্কা ক'রেছিল—ভয়ানক বান এল। উত্তরের নদীটা কেঁপে উঠে সব চাইতে শেষের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলল। গ্রামবাসীরা অবস্থা সঙ্গীন দেখে বাঁধ মেরামতের জন্ত পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে অর্থ সংগ্রহ ক'রতে লাগল। সকলেই যা সঞ্চয় ক'রেছিল ঢেলে দিল—কেননা ঐ বাঁধে সকলেরই স্বার্থ বাঁধা রয়েছে। তারা টাকা তুলে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে তুলে দিল। কিন্তু বাঁধ পর্যন্ত টাকা পৌছুল না। দরিদ্রের সন্তান ম্যাজিষ্ট্রেট অতটাকা একসঙ্গে দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। দরিদ্র পিতা তার যথাসর্বস্ব, উপরন্তু বিশাল ঋণের মূল্যে এই উচ্চাসন ছেলের জন্য কিনেছিল—আশা ছিল দারিদ্র ঘুচবে। নদীর জল দ্বিতীয় বার কেঁপে উঠতেই গ্রামবাসীরা কোলাহল ক'রতে ক'রতে ছুটে এসে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দরজায় ভিড় করল। প্রতিজ্ঞামত সাহেব তখনও বাঁধগুলো মেরামত করাননি। দরিদ্র-গ্রামবাসীর অর্থ তিনটি হাজার ডলার সাহেবের নিজ সংসারের ভাঙ্গা বাঁধ মেরামতেই সার্থক হয়েছে। তিনি গা ঢাকা দিলেন। জনতা মার মূর্তিতে বাড়ী ঘেরাও করল—তারা অপরাধীর প্রাণ চায়। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন দেখল প্রাণ তার যাবেই—তখন দৌড়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে মরে পরের হাতে মরার লজ্জা ঘোচাল।

সুতরাং না ফিরল টাকা, না মেরামত হ'ল বাঁধ, জলও বেড়ে চলল—একটার পর একটা বাঁধও ভাঙ্গতে লাগল—কেবল ভাঙ্গল নয়, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। কোথাও যে বাঁধ ছিল তার চিহ্নও রইল না। সুতরাং সামনে বাঁধহীন এবং বাধাহীন বিস্তৃতি পেয়ে বাঁধের জল নাচতে নাচতে এসে যত ক্ষেত খামার সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শিশু ধান গম সব সেই জলের তলায় ডুবে গেল। ক্ষেত, মাঠের ওপর যেন সমুদ্র থৈ থৈ করতে লাগল।

চারিদিকে অথৈ জলে গ্রামগুলো দ্বীপের মত ভেসে রইল। অসহায় গ্রামবাসীদের চোখের সামনে জল বেড়েই চলে। বেড়ে বেড়ে বাড়ীর দোর-গোড়ায় এল। ওরা তখন টেবিল, খাট, মায় দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়ে ভেলা তৈরী ক'রে শিশু, নারী আর সাংসারিক সম্পত্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ যা রক্ষা ক'রতে পারল, তাতে তুলে দিল। কিন্তু জল বেড়েই চলল। ঘরের মাটির পাঁচিল ধ্বসে পড়ে জলে মিশে গেল। তারপর মর্তের জলের টানে আকাশের জলও নেমে এল। অশ্রান্ত বর্ষা দিনের পর দিন ঝ'রেই চলল, যেন—যুগ যুগের পিয়াসী ধরার পিয়াস মেটাবে বলে আকাশ পণ ক'রে বসেছে।

ওয়াঙের বাড়ীটা একটা উঁচু টিলার ওপর ছিল ব'লে ওটা রক্ষা পেল। কিন্তু ওর চোখের সামনে অত সাধের জমিগুলো ভেসে গেল। ওয়াং সতর্ক দৃষ্টি রাখল যেন কবরগুলো ভেসে না যায়। কিন্তু অতদূর জল এগুল না, বুভুক্ষু ধূসর ঘোলা জলের লোভী জিহ্বা বারবার জায়গাটার প্রান্ত লেহন ক'রে ক'রে গেল কেবল।

সারা বছর কোথাও একটি দানা ফসল হ'লোনা। ঘরে ঘরে অনাহারের মর্মভেদী হাহাকার। বুভুক্ষু মানুষের পেটের আগুন নিষ্ঠুর ভাগ্যের বিরুদ্ধে মনেও আগুন জ্বা লয়ে দেয়। অনেকে দক্ষিণ দেশে চলে যায়। দুঃসাহসী মরীয়ার দল ডাকাতের দলে গিয়ে ভিড়ে। ওরা সহরে গিয়ে লুটতরাজ আরম্ভ ক'রে দিল। সুতরাং সহরের সমস্ত গেটে তালা পড়ে যায়—কেবল পশ্চিমদিকের ছোট একটা গেট সশস্ত্র সৈন্যদের পাহারায় খোলা থাকে। যারা দক্ষিণে গেল, আর যারা ডাকাতের দলে ভিড়ল—তারা ছাড়া বাকী পড়ে রইল তারাই যারা জীবনের পথ চলায় শ্রান্ত, অবসন্ন, আশাহত,—চিংএর মত পুত্রহীন ভীরু বৃদ্ধের দল। ওরাই শুধু প'ড়ে রইল এবং প'ড়ে থেকে ওরা এখন উপোস করে, ঘাস খায়, উঁচু জায়গায় দু'একটা পাতা যা পায় খুঁটে খায়, ধুঁকে ধুঁকে জলে, ডাঙায়, যেখানে সেখানে প'ড়ে প'ড়ে মরে।

শীত এসে গেল, গম বোনার সময় হ'ল—জল কমল না। পরের বছরও ফসল পাওয়া যাবে না। ওয়াং বুঝতে পারল—ওদের সামনে বড় ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সুতরাং সাবধান হ'ল। বাড়ীর খাওয়া দাওয়া খরচপত্রের উপর কড়া নজর রাখল। কিন্তু মুস্কিল কোকিলাকে নিয়ে। সে কিছুতেই এখনও রোজ সহর থেকে মাংস আনা ছাড়বে না। ওয়াং কত ঝগড়া করে। শেষে সহরের রাস্তাও যখন ডুবে গেল ওয়াং খুব খুশী হ'ল। এখনতো আর ইচ্ছে হ'লেই সহরে যাওয়া চলবে না। নৌকো চাই। ওয়াঙের কথা ছাড়া নৌকো খোলার হুকুম নেই। চিং ওয়াঙের আজ্ঞাধীন। কোকিলার তীক্ষ্ণ রসনার সহস্র খোঁচাও চিংকে টলাতে পারে না।

বেচাকেনাও ওয়াং সব নিজের হাতে নিল। ওর কথা ছাড়া এতটুকুও নড়চড় হতে পারে না। যা পুঁজি আছে ও নিজেই দেখে শুনে হিসেব ক'রে ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন নিজেদের সংসারের জন্ত দরকারী ভাঁড়ার আন্দাজ ক'রে পুত্রবধূর হাতে দেয়, আর বাইরের লোকজনদেরটা দেয় চিংএর হাতে। জন-মজুররা সব ব'সে। এতগুলো লোককে বসিয়ে খাওয়াতে

ওয়াঙের অন্তর্দাহ হয়। অবশেষে শীত এলে ও সবাইকে জানিয়ে দিল যে আর ওদের বসিয়ে খাওয়ান ওয়াঙের সম্ভব হবে না। তারা দক্ষিণ দেশে গিয়ে ভিক্ষে, চুরি, মজুরী যে ক'রে হোক নিজেদের ব্যবস্থা ক'রে নিক। শীত গেলে বসন্তের সময় তখন ফিরে আসতে পারে ইচ্ছে হ'লে। কমলকে ওয়াং লুকিয়ে, চিনি, তেল একটু ভাল খাবার দেয়। কারণ কষ্ট করার অভ্যাস বেচারীর নেই। নূতন বছরের উৎসবও খুব সংক্ষেপেই সারা হ'ল এবার। একটা মাছ নিজেরাই ধরেছিল—আর বাড়ীর একটা পোষা শূয়োর কাটা হ'ল, বাস্।

ওয়াং বাইরে দেখায় না, কিন্তু ওর পুঁজি যথেষ্ট রয়েছে। ছেলে বৌ যে ঘরে থাকে সে ঘরের দেয়ালে মেলাই টাকালুকিয়ে রেখেছে। অবশ্যি ছেলে বৌ জানে না সে কথা। বাঁশঝাড়ে, মাটির তলায়, সামনের মাঠে যে ডোবা আছে তার তলায়—কোথায় না আছে! কেবল রুপোই নয়, সোনাও আছে। তা ছাড়া গত বছরের উদ্বৃত্ত ফসলও যথেষ্ট রয়েছে। কাজেই অনাহারে মরার ভয় ওয়াঙের পরিবারের নেই।

কিন্তু ওর আশে পাশে অনাহারের হাহাকার। সেবার দুর্ভিক্ষের সময় ও যখন সবাইকে নিয়ে দক্ষিণ দেশে যাচ্ছিল, জমিদার বাড়ীর দরজার সামনে বুভুক্ষু দুর্গত মানবতার মর্মান্তিক দৃশ্য ও দেখেছিল। তাদের আর্তনাদ শুনেছিল। ওর মনে পড়ে সে কথা। ওর ঘরে যে খাবার রয়েছে এ জন্য গাঁয়ের অনেক লোকেরই ওর ওপর আক্রোশ আছে, এ কথা ওয়াং জানে। সেজন্য ও সর্বদাই গেট বন্ধ ক'রে রাখে। অচেনা কোন লোককে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু ডাকাতের হাত থেকে অত সহজে রক্ষা পেত না, কাকা না থাকলে। কাকার দয়া না হ'লে কোন্ কালে ডাকাতেরা ওকে শেষ ক'রে ফেলত। টাকা, পয়সা, খাবার, বাড়ীর মেয়েদের কিছুই কি রক্ষা ক'রতে পারত! সেই জন্যই কাকা, খুড়ী আর তাদের ছেলেকে অত্যন্ত আদরে ও সম্মানে রাখে ওয়াং। এদের ঘরে চা যায় সকলের আগে—এরা বাটিতে কাঠি না দিলে কেউ খাবারে হাতও দেয় না।

এরাও তিনজনে বেশ বুঝতে পেরেছে যে ওয়াং ওদের ভয় করে। সেই সুযোগ নিয়ে এরা ওর ওপর একেবারে চেপে বসেছে। অসম্ভব ওদের দাবী, অভদ্র ওদের ব্যবহার, যখন তখন খাওয়া-পরা নিয়ে অভিযোগ। বিশেষ ক'রে খুড়ীটি। আজকাল কমলের মহলে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের

অভাব ঘটেছে। সুতরাং স্বামীর কাছে তার দাবী, এবং তিন জনের দাবী এক সঙ্গে হয়ে আসে ওয়াঙের কাছে।

ওয়াং বোঝে—কাকা বুড়ো হয়েছে, সে বেশী ঝঞ্ঝাট ভালোবাসে না, একটু নিরালায় থাকতে চায়। ওই বকাটে ছেলেটা আর তার মা যদি না ঘাঁটায় তবে মানুষটা চুপচাপই থাকে। কিন্তু এ দু'জন ছিনে-জোঁকের মত ওর পেছনে লেগেই থাকে। একদিন তো ওয়াং নিজের কানেই শুনল তারা বুড়োকে বলছে:

'এই তো সুযোগ বুঝতে পারছ না? এমন সুযোগ আর পাবে না। ওয়াং বেশ জানে তুমি না হলে লাল-দেড়েদের হাতে বাছাধন সাবাড় হ'য়ে যেতেন—ভিটের একখানা ইঁটও থাকত না। তুমি আছ বলেই না! কাজেই যা পারো এইবারে গুছিয়ে নাও। ওর টাকা আছে দেবেই বা না কেন?'

রাগে ওয়াঙের রক্ত যেন ফুটতে লাগল। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে গেল। কি যে ক'রবে কোন কূলকিনারা ভেবে ভেবে পায় না। ফিরে এদের হাত থেকে রক্ষা পাবে কোন পথই মেলে না।

পরদিনই কাকা এসে খুড়ীর জামা কাপড় ও নিজের পাইপ তামাক কেনার জন্য টাকা চাইল। ওয়াং আড়ালে গিয়ে দাঁত কড়মড় করে। কিন্তু প্রকাশ্যে নির্বিবাদে তার হাতে টাকা তুলে দিতে হয়। টাকা ক'টা দিয়ে ওর মনে হল গায়ের মাংস কেটে দিলে। যখন পয়সার টানাটানি ছিল, একটা পয়সা খরচ ক'রতে ওর কষ্ট হ'ত বটে, কিন্তু এতটা হ'ত না।

দুদিন যেতে না যেতেই কাকা আবার এসে টাকার জন্য হাত পাতে। এবারে ওয়াং আর সইতে না পেরে চীৎকার ক'রে ওঠে: 'তোমরা কি পেয়েছ? এমনি হলে দুদিন পরে সবাইকে উপবাস করতে হবে।'

কাকা নির্লিপ্তভাবে হেসে বলে:

'তোর কি বাছা! নেহাৎ তোর কপাল ভালো, নইলে তোর চাইতে ঢের কম টাকা এমন কত লোক পোড়া ঘরের কড়ি-কাঠে দিব্যি রোষ্ট হয়ে ঝুলছে দেখ্‌গে যা।'

ওয়াং বোঝে। ঠাণ্ডা ঘাম ঝরে গা দিয়ে। চুপচাপ কাকার হাতে টাকা তুলে দেয়। এর পর থেকে সব রকমে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়। বাড়ীতে আর কারো জন্য মাংস না এলেও কাকাদের তিনজনের জন্য আসে।

ওয়াঙের নিজের ভাগ্যে কদাচিৎ তামাক জোটে, কিন্তু কাকার পাইপ দিন রাত অনর্গল ধূম উদ্গীরণ করে।

নাং এন্ এতদিন তার নতুন নেশায় ডুবে ছিল। সংসারের কোথায় কি হচ্ছে কোনো দিকেই সে চোখ দেয়নি। তবে তার বাবার খুড়তুত ভাইটার লোভী দৃষ্টি যাতে বৌএর ওপর না পড়ে সেদিকে তার প্রখর দৃষ্টি। দু'জনের পুরানো বন্ধুত্ব উবে গেছে, এখন ওরা পরম শত্রু। নাং এন্ আজকাল বৌকে সন্ধ্যে ছাড়া নিজের ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। ঐ সময়টা বাপ-ব্যাটায় মিলে কোথায় বেরিয়ে যায়।

বাবাকে নিয়ে এরা তিনজনে মিলে পুতুল নাচাচ্ছে দেখে নাং এন্ ভয়ানক চটে গেল। একদিন এসে বাবাকে বলল: 'তোমার দেখছি ছেলে-বৌ, যাদের ঘরে দু'দিন পরে তোমার নাতি হবে—তাদের চাইতে তোমার কাকা আর গুণধর ভাইএর ওপরই টান বেশী। কি আর কথা—অগত্যা আমার অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।'

ওয়াং যে কথা এতদিন ভেতরে একেবারে চেপে রেখেছিল—আজ সে কথা ছেলেকে খুলে বলে:

'সাধে তোয়াজ করি? করি বলেই তো বেঁচে আছি। কিছু ক'রলে উপায় আছে? বুড়ো ডাকাতের সর্দার জানিস্? যতদিন তোয়াজ ক'রে রাখব ততদিন নিশ্চিন্ত। কিন্তু এমনি ক'রেও তো আর পারা যায় না। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ওদের দেখলে আমার পিত্তি জ্ব'লে ওঠে। ইচ্ছে করে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু যে ফাঁদে পড়েছি। কোনো পথও তো পাচ্ছি না।'

নাং এন্ যেন আকাশ থেকে পড়ে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা যখন হৃদয়ঙ্গম হয় তখন আরো বেশী রেগে ওঠে।

'চল এক কাজ করি,' বাবাকে বলে নাং এন্: 'একদিন রাত্রিরে এদের সবাইকে দিই ঠেলে জলে ফেলে। মোটা ধুমসী বুড়ীকে চিং-ই বেশ পারবে। দেহখানাই আছে, গায়ে এক ফোঁটা জোর নেই বুড়ির। তোমার কাকাটির ভার তুমিই নিও। তার সোনার চাঁদ ছেলেটিকে নিজের হাতে চুবোনী দিতে না পারলে আমার মন ঠাণ্ডা হবে না। যা প্যাট্ প্যাট্ ক'রে আমার বৌএর দিকে তাকায়।'

পোষা বলদটা নিজের হাতে মারতে পারেনি ওয়াং, কিন্তু ওই কাকা জাতীয় জীবটিকে মারা ওর পক্ষে ঢের সহজ। তবুও ওয়াঙের হাত ওঠে না। যদিও লোকটাকে ও মোটে সহ্য করতে পারে না, তবুও একেবারে মেরে ফেলা! ওর মন সায় দেয় না। বলে:

'পারিনা যে তা নয়, কিন্তু তা হয় না। অন্য ডাকাতরা টের পেলে আর উপায় নেই। তার চাইতে বরং বুড়ো যতদিন বেঁচে আছে আমরা আছি ভালো। দেখছিস্ তো চারিদিকে এসব অকালের সময়ে গরীব লোকেরা পর্যন্ত ডাকাতের হাতে কেমন নাজেহাল হচ্ছে।'

তাই তো কি করা যায়! দুজনেই চুপ ক'রে ভাবে। নাং এন্ দেখল বাবা ঠিক কথাই বলেছে—মেরে ফেললেই মুস্কিল-আসান হচ্ছে কোথায়। অন্য কিছু উপায় ঠাওরাতে হবে।

কিছুক্ষণ ভাবার পর ওয়াং বলে:

'এমন যদি কিছু করা যেত যে এরা থাকল এখানেই, কিন্তু কোন গোলমাল করবে না, চাইবে না, চুপচপে ভালো মানুষের মত প'ড়ে থাকবে তাহ'লে বেশ হত। কিন্তু তা তো আর হবে না। ভেল্কী ছাড়া—তা আর সম্ভব নয়।'

নাং এন্ হঠাৎ হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে:

'পেয়েছি, পেয়েছি, তোমার কথায়ই পেয়ে গেছি। ভেল্কী নয়, কষে আফিং কিনে দাও দেখি। রোজ মাত্রাটা চড়িয়ে দাও। টানুক ফুর্তিসে, তারপর মজাটা দেখ। আর বুড়োর পুত্তুরকে দেখ না, দিচ্ছি ভজিয়ে রেস্তর্ঁায় আবার খাতির টাতির ক'রে। সেখানে বসে তিনি নল টানুন, আর এখানে বুড়োবুড়ী। বাস্!'

ওয়াং লাংএর মাথায় কথাটা আসেনি। ওর যেন তেমন আস্থা হল না প্রস্তাবটায়। 'বড্ড খরচ হবে যে,' বলে: 'আফিংএর যা দাম!'

ছেলে গরম হয়ে জবাব দেয়: 'যেভাবে পুষছ সেতো হাতী পোষা হচ্ছে। তবুও ওদের চোখ রাঙানী খেয়ে মর। আর তোমার ভাইটি যা ফেউএর মত আমার বৌএর পেছনে লেগে থাকে। এর চেয়ে দুটো পয়সা যায় সেও ভালো।'

কিন্তু ওয়াং তক্ষুনি রাজী হয় না। প্রথমতঃ, ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা যাচ্ছে তত সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ, টাকার প্রশ্ন।

এবং সম্ভবতঃ রাজী ওয়াং হ'তোও না। জল নামা পর্যন্ত হয়তো ওভাবেই চলত। কিন্তু সেদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

ব্যাপারটা এই—ওয়াঙের ছোট মেয়ে পরমাসুন্দরী। নাং ওয়েন্‌এর সাথে অনেকটা আদল আসে। তারই মত ছোটখাট গড়ন; কিন্তু নাং ওয়েন্‌এর গায়ের রং হল্‌দে, আর ওর বর্ণে বাদাম ফুলের স্নিগ্ধতা। ছোট নাক, লাল টুকটুকে একজোড়া ঠোঁট, পা দু'খানি একটা মুঠোর মধ্যে পুরে রাখা যায় যেন। ওয়াঙের কাকার পুত্ররত্নের চোখ এই মেয়েটির ওপর পড়ে সম্পর্কের বিচার না ক'রেই। সেদিন মেয়েটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যখন শোবার ঘরে আসছিল—শ্রীমান ওকে জড়িয়ে ধরল। খুকী চীৎকার ক'রে উঠল! ওয়াং এসে ওর মাথায় ঘুষির ওপর ঘুষি মারতে লাগল। কিন্তু সে মাংস-চোর কুকুরের মত—পড়ে মার খাবে কিন্তু মাংস ছাড়বে না। অবশেষে জোর ক'রে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওয়াং। কিন্তু নির্লজ্জ মানুষটা গম্ভীর হাসি হেসে বলল: 'আহা হা, একটু ঠাট্টা ক'রছিলাম বোনের সঙ্গে। ঠাট্টা একটুও বুঝলে না তোমরা!' বলতে বলতে লালসায় ওর চোখদুটো জ্বলে ওঠে। ওয়াং মেয়েকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়।

রাতে নাং এন্‌ সব কথা শুনে বলে:

'ছোট খুকীকে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে। তা'ছাড়া আর উপায় নেই! লিউ হয়ত বলে বসবে এ বছর বিয়ের দিন নেই। কিন্তু তা শুনলে চলবে না। এই রাক্ষুসে বাঘের খপ্পর থেকে মেয়েটাকে এখানে বাঁচানো যাবে না।'

ওয়াং পরদিন লিউয়ের বাড়ী গেল এবং বেয়াইকে বলল:

'বেয়াই, মেয়ের আমার বয়স তো তের হল। বিয়ের যুগ্যি হয়েছে।'

লিউ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে:

'এ বছরটা তেমন লাভ হয়নি, বেয়াই। বাজার মন্দা। বিয়ের খরচপত্র—'

আসল কথাটা বলতে ওয়াং লজ্জা পায়। শুধু বলে:

'সোমত্ত মেয়ে। জানেন তো ঘরে মা নেই। কেই বা চোখ রাখে। বলতে নেই, চেহারাখানা মন্দ হয়নি। আমার প্রকাণ্ড বড় বাড়ী—দশের মেলা। আমি তো আর সর্বক্ষণ ওকে পাহারা দিয়ে বসে থাকতে পারি না। কখন কি হয়। এ ঘরে আসবেই তো, দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে। আপনার জিনিস আপনার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। বিয়ে যেদিন খুসী দিন।'

লিউ ভালো মানুষ, প্রকৃতিটাও বড় নরম। আর আপত্তি ক'রতে পারেনা। বলে :

'বেশ বেয়াই তাই হবে। আপনার বাড়ীতে তাকে রক্ষা করার যদি কেউ না থাকে মাকে আমার এখানেই নিয়ে আসব। আমি গিন্নীর সাথে কথা বলছি। আপনার মেয়ে তার শাশুড়ীর কাছে পরম আদরে থাকবে। আগামী বছর বিয়ে হবে'খন।'

ওয়াং সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ী ফেরে।

সহরের গেটের কাছে চিং নৌকো নিয়ে অপেক্ষা ক'রছিল। আসতে আসতে পথে একটা আফিং-তামাকের দোকান পড়ল। ওয়াং কিছু মাখা তামাক কিনতে গেল। দোকানী যখন তামাক ওজন ক'রছে—কি মনে হ'ল ওয়াঙের, হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল :

'আফিং-এর দর কি হে ?'

'আফিং বেচা বে-আইনী হ'য়ে গেছে। খোলাখুলি বেচতে পারব না। আপনি চান তো পেছনের ঘরটায় আসুন, মেপে দিচ্ছি। টাকা আছে তো সাথে ? দর, আউন্স এক ডলার।

ওয়াং ছয় আউন্স কিনে ফেলল।

আটাশ

মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে ওয়াং যেন দায়মুক্ত হ'ল। কয়েকদিন পরে কাকাকে বলল :

'এই দেখ কি চমৎকার তামাক।' পাত্রটা খুলে দেখাল। বেশ এঁটেল, মিষ্টি গন্ধ। কাকা হাতে করে একটু তুলি শুঁকে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে। বলে :

'এরকম তামাক আগে এক আধবার খেয়েছি, তবে বড় একটা না। বড় দাম কিনা। কিন্তু ভারী চমৎকার জিনিস !'

দামটা যেন গায়েই লাগেনি এমন ভাবে ওয়াং বলল : 'এমন আর কি। বাবার শেষের দিকে ভালো ঘুম হ'তোনা। তখন তার জন্য কিনেছিলাম। সবতো লাগেনি তার। এই এতটা প'ড়ে ছিল। আজ হঠাৎ চোখে প'ড়ে গেল। ভাবলাম আমি আর নাই খেলাম, তুমি বুড়ো হ'য়েছ, তোমারই বেশী দরকার। আমার না হ'লেও চলবে। রেখে দাও কাছে।

মাঝে মাঝে একটু ক'রে টেনে দেখো কি চমৎকার জিনিস। আর ব্যথা টেথায় ভারী উপকার দেয়।

বৃদ্ধ লোভীর মত প্যাকেটা ওয়াঙের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল। চমৎকার খোস্‌বু! এসব কি আর গরীবের জন্য! একটা পাইপ কিনে এনে শুয়ে শুয়ে সারা দিনে বুড়ো টানে এর পর থেকে। ওয়াং কতগুলো পাইপ এনে এখানে সেখানে ছড়িয়ে রেখে দেয়, নিজে টানবার ভান করে মাত্র। একটা কেবল ঘরে নিয়ে যায়, কিন্তু সেটা ব্যবহার করে না। কমল আর দুই ছেলেকে দুর্মূল্যতার অজুহাতে আফিং ছুঁতেও দেয় না। কিন্তু কাকাদের তিনজনকে সেধে সেধে খাওয়ায়। আফিংএর ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ মহলে মহলে ছড়িয়ে যায়।

আজ এই অর্থব্যয়ে ওয়াঙের মনে কোনো ব্যথা বাজে না। কেননা—এই ব্যয়ে—অবশ্য অপব্যয়েই—ওয়াং সংসারে শান্তি কিনেছে।

শীত প্রায় শেষ। জল অনেক নেমে গেছে। হেঁটে এখন অনেকদূর যাওয়া যায়। সেদিন ওয়াং বাইরে আসতে বড় ছেলে নাং এন্‌ পেছন পেছন এল এবং স্বরে গর্বভ'রে বাবাকে খবর দিল—আর একজন খাবার লোক বাড়ছে। নাতি।

ওয়াং শুনে ফিরে দাঁড়াল। প্রচুর হেসে, হাতে হাত ঘসে পরম উল্লাসে বলল:

'কার মুখ দেখে উঠেছিলাম রে আজ!'

চিংকে সহরে পাঠিয়ে দিল। মাছ আর ভালো ভালো খাবার আনিয়ে বৌমাকে বলে পাঠাল, ভালো ক'রে খেয়ে দেয়ে ওর নাতিকে যেন তাজা জোয়ান ক'রে তোলে।

নাতি হবে—নাতি হবে—ওয়াং একটা সুখ' স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকে। ও সব কাজের পাকে পাকে, ওর ব্যস্ততায়, ওর সহস্র উদ্বেগে ওই কথাটাই সুখ হ'য়ে জড়িয়ে থাকে।

বসন্ত চলে গিয়ে গরম আসে! বন্যার সময় যারা চলে গিয়েছিল--প্রবাসী আকিঞ্চন জীবনের কৃচ্ছ্রে ক্লান্ত জর্জরিত দেহগুলিকে টানতে টানতে তারা একে একে, দলে দলে ফিরে আসে। কিন্তু কোথায়? কোথায় গৃহ? কোথায় আশ্রয়? যেখানে একদিন ওদের গৃহ ছিল আজ সেখানে একটা পরিচয়হীন পিছল-কর্দমের বিস্তার। তবুও হতভাগ্য মানুষের দল পরবাসে এরই দিকে তাকিয়েছিল! তাই ফিরে আসার পথ পেয়ে ওরা খুসী হয়। ওই কাদার

বুকে কাদা দিয়েই আবার ওরা ঘর বাঁধবে, বাজার থেকে চাটাই কিনে এনে তার চাল ছাইবে।

অনেকেই ঋণের জন্য ওয়াঙের কাছে এসে হাত পাতে। বাজার গরম দেখে চড়া সুদে ঋণ দেয় ওয়াং--কিন্তু জমি বন্ধক রেখে। তা ছাড়া দেয় না। ঋণের টাকা দিয়ে বীজ কিনে ওরা পলি-সমৃদ্ধ মাটিতে ফসলের চাষ করে। যখন ঋণ পায় না তখন বাধ্য হ'য়ে হাল-বলদ আর বীজের জন্য অনেককেই কিছু কিছু জমি বেচতে হয়। কিছু যাবে বটে, তবুও বাঁচবে কিছু। ঐ পয়সায় সেটুকুর চাষ চলবে তো। ওয়াং লাং এইসব জমি একদিক থেকে কেনে দায়ের বাজারে একেবারে জলের দরে।

অনেকে এক কোঁটাও জমি বেচল না। দায়ে ঠেকেও না। যখন দায় চরম দায় হ'ল, তারা মেয়ে বেচল। মেয়ে নিয়েও তারা ওয়াঙের কাছে আসে। ওয়াং ধনী, ওয়াঙের প্রতিপত্তি আছে, হৃদয় আছে, সুতরাং উপায় হবে।

যে নাতি এখনও আসেনি, আধপথ এগিয়ে আছে মাত্র, এবং অন্য ছেলেদের বিয়ে হ'লে আর যে নাতিরা আসবে, তাদের কথা হিসেব ক'রে ওয়াং পাঁচজন দাসী কিনে ফেলল। তাদের মধ্যে দু'জন বছর বারোর— প্রকাণ্ড বড় বড় দুই পা, শক্ত এবং সমর্থ শরীর। দু'জন একটু ছোট এদের চাইতে। এরা সকলের ফাই ফরমাস খাটবে—বেশী কাজ তো আর ক'রতে পারবে না। আর একটি কমলের জন্য—ওর কাছে থাকবে, এটা সেটা ক'রবে। কোকিলের বয়স হয়েছে--আগের মত আর পেরে ওঠে না। তারপর ছোট খুকী চ'লে যাবার পর থেকে এদিকে সংসারেও কোকিলাকে দরকার হয়। কাজেই কমলের একজন লোক দরকার।

পাঁচজনকে একদিনেই কিনে ফেলল ওয়াং। কেননা টাকার হিসেব ক'রতে হয় না। আর হয় না বলেই কাজেরও বড় একটা হিসেব করতে হয় না। যা 'করব' বলে ভাবে তা ক'রে ফেলতে একটুও দেরী হয় না।

এর কিছুদিন পরে একটি বছর সাতের ছোট্ট কৃশ মেয়েকে বেচতে নিয়ে এল একজন লোক। অত ছোট, অত কৃশ, আর অত ক্ষীণ মেয়েটা কোন্ কাজেই বা আসবে। সুতরাং লোকটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কমলের নজর পড়ে গেল। এ মেয়ে ওর চাই-ই। ঠোঁট ফুলিয়ে আব্দার ধরল: "মেয়েটিকে কেন আমার জন্য। কি চমৎকার সুন্দর! আমার

ঝি মাগী, মাগো, কি বিশ্রী দেখতে! গায়ে যেন ছাগলের গন্ধ। আমার ঘেন্না করে।'

ওয়াং তাকিয়ে দেখে, কচি সুন্দর মুখখানা—সুন্দর চোখ দুটি ভয়ে চকিত! বড় বেশী কৃশ—মায়া হয় দেখলে! ওয়াঙের ইচ্ছে করে একটু খাইয়ে দাইয়ে মেয়েটাকে যদি একটু তাজা করে তুলতে পারত। কতক এ জন্য, কতক কমলকে খুশী করার জন্য কুড়ি ডলার দিয়ে মেয়েটিকে কেনা হ'ল। কমলের কাছেই থাকে। রাতে কমলের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

চারিদিকে কোথাও তো কিছু বাকী নেই, ওয়াঙের মনে হয় এবারে ও নির্ঝঞ্ঝাটে শান্তিতে থাকতে পারবে। ধীরে ধীরে বানের জল নেমে যায়। গ্রীষ্ম আসে। চাষের মৌসুম। ওয়াং নিজে প্রত্যেকটি ক্ষেত দেখে —বানের জলে কোন্ মাঠে পলি বেশী পড়েছে, কোনটায় মাটি কোমল হয়েছে, মাটি হিসাবে এবারে কোন্ ক্ষেতে কি ফসল দেওয়া চলে—চিংএর সঙ্গে আলোচনা করে। ছোট ছেলেকে এসব কাজ শিখাবার জন্য স্কুলে না দিয়ে বাড়ীতে রেখেছে—সর্বদা বেরুবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। মাথা নীচু ক'রে মুখে একরাশ অন্ধকার নিয়ে সে বাবার পেছন পেছন চলে। ছেলে ওর কথা শুনছে কিনা, যদি বা শুনছে কিভাবে গ্রহণ ক'রছে, ওয়াং ওসব কখনও তাকিয়ে দেখে না। ওর মনের মধ্যে যে কি তাও কারো বুঝবার শক্তি নেই। ছেলে কি করে—ওয়াং দেখে না, সে যে মুখ বুজে বাধ্য ছেলের মত সাথে সাথে আছে, ঐটুকুতেই বাপ সন্তুষ্ট। কাজ কর্ম হ'য়ে গেলে পরিতৃপ্ত মনে বাড়ী ফিরতে ফিরতে ভাবে:

'বুড়ো হয়েছি এখন। আর নিজে খাটব না। দরকারটাই বা কি, খাটবই বা কেন অতলোক রয়েছে, ছেলে রয়েছে। বাড়ীতেও কোনো ঝামেলা নেই, বাস, চুপচাপ বসে থাকবে।'

কিন্তু বাড়ীতে শান্তি ওয়াঙের কপালে নাই। যদিও ছেলেকে বিয়ে দিয়েছে—প্রত্যেকের সেবার জন্য দাসী কিনে দিয়েছে, খুড়ো খুড়ীকে রাশি রাশি আফিং দিচ্ছে—তারা ওতেই মশ্গুল। কাজেই শান্তি না থাকার কথা নয়। কিন্তু তবুও নেই। বড় ছেলে আর কাকার ছেলে এদের দু'জনকে নিয়েই এখন যত জ্বালায়।

অশান্তির মূলটা রইল বিশেষ ক'রে নাং এন্‌এর মনে। নাং এন্‌ কয়েক বছর আগে নিজের চোখেই এই লোকটার চরিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছে। কাজেই তার মন থেকে কিছুতেই সন্দেহ দূর হয় না। এখন এমন হ'য়েছে যে তাকে সঙ্গে না নিয়ে নাং এন্‌ চায়ের দোকানেও যায় না। সে বাড়ী থেকে না বেরুলে নিজেও এক পা নড়ে না। ওর গভীর সন্দেহ বাড়ীর দাসী, মায় কমলকে পর্যন্ত নিয়ে লোকটা ঘাঁটাঘাঁটি করে। দাসীদের কথাটা সত্য হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু কমলের কথা একেবারেই অর্থহীন। কারণ কমল বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন স্থূল-কায়া হচ্ছে। এবং বহুদিন থেকেই একমাত্র পানাহার ছাড়া তার আর কিছুতে আসক্ত নেই। এমন কি ওয়াং লাংও যে এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এদিকে আসা কমিয়েছে তাতে ও খুশী ছাড়া দুঃখিত নয়। কাজেই ওয়াঙের কাকার ছেলের দিকে সে ফিরেও চায় কিনা সন্দেহ।

সেদিন কথাটা বাবার কাছে ব'লেই ফেলল নাং। ওয়াং সবে ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরেছে ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। নাং এন্‌ অমনি গিয়ে আরম্ভ করল: 'আর আমি পারি না। সারাদিন চারিদিকে অমন ক'রে উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়াবে। জামা কাপড় ভালো ক'রে পরবে না—গা আদুড় ক'রে ক'রে দাসীদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়, এ আর সহ্য করা যায় না।'

কমলের কথাটা নাং এন্‌ চেপে যায়। কেননা পিতার দয়িতা এই রমণীর প্রেমে ও নিজেই মজেছিল। আজকের প্রৌঢ় কমলের স্থূল দেহের দিকে তাকিয়ে ওর মনেই হয় না সত্যি সত্যি এরই প্রেম ওকে পাগল ক'রেছিল একদিন। নিজের মনেই নাং এন্‌ সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে মনে ক'রে। পিতার মনে সেই অপ্রীতিকর স্মৃতিটা আর জাগিয়ে তুলতে চায় না ও। কাজেই কমলের কথা আর বলল না—কেবল দাসীদের কথাই বলল।

মনে গভীর প্রসন্নতা নিয়ে ওয়াং বাড়ী ফিরেছিল। জল নেমে গেছে, শুকনো মাটি, উষ্ণ বাতাস—। বড় ভালো লেগেছে। ছোট খোকা সাথে গিয়েছিল। বাড়ীতে পা দিতেই নূতন অশান্তির ঘায়ে মনের সেই গভীর আনন্দের সুরটি কেটে গেল। ওয়াং অসহিষ্ণু হয়ে চীৎকার করে উঠল:

'তোর মাথা খারাপ হয়েছে—ঐ এক কথাই জপ্‌ছিস সারাদিন। কেবল বৌ বৌ বৌ! বৌ না বেশ্যা যে তাকে নিয়ে অত চলাচলি করছিস! সব ফেলে কোন্‌ মরদ অমন বৌ-পাগল হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় রে! ধ্যাঃ!'

বাবার তিরস্কার নাং এন্‌এর ভেতরে যেয়ে কেটে বসে। কারণ ইতর সাধারণের মত ওর কোনো ব্যবহার কোনো দিক দিয়ে অনুমোদিত মাপকাঠি হ'তে খাটো হ'য়েছে এ অভিযোগ নাং এন্‌এর পক্ষে সব চেয়ে পীড়াদায়ক, এবং এইটেকেই ও ভয়ও পায় সব চেয়ে বেশী। তাই ব্যস্ত হ'য়ে বলে:

'বৌর কথা বলছি না, বাবা। তোমার বাড়িতে তোমার বুকের ওপর বসে এসব অনাচার—সইতে পারি না তাই বলছিলাম।'

ওয়াং এসব কোনো কথাই কাণে তুলল না। ভয়ানক রেগে ছিল এবং কি যেন ভাবছিল। ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল:

'মেয়েমানুষ নিয়ে এসব ঝামেলা আর কি শেষ হবে না রে বাপু। একদিনের জন্ম যদি একটু শান্তি পাবার যো থাকে! নিজের তো বয়স হয়েছে, রক্তও ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—ওসব ল্যাঠা তো নিজের চুকে গেছে। এখন কি আবার তোদের নিয়ে পাগল হবো?' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার চীৎকার করে ওঠে:

'তা আমায় কি করতে হবে শুনি?'

নাং এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বাবার মেজাজ ঠাণ্ডা হবার প্রতিক্ষা করছিল। এবারে শান্তভাবে বলল:

'আমার মনে হয় এ বাড়ী ছেড়ে আমাদের সহরে গিয়ে থাকতে পারলে ভাল হ'তো। তা ছাড়া এমনি ক'রে চিরটা কাল চাষার মত গাঁয়ে বসে থাকাই বা কেন। আমরা তো অনায়াসে সহরে একটা বাড়ী নিয়ে থাকতে পারি। সেখানে ঘেরা পাঁচিলের মধ্যে ভয়ও থাকবে না কোনো। তোমার কাকা…তার বৌ ছেলে নিয়ে এখানেই থাকতে পারবে বেশ।'

অর্থহীন প্রলাপ। ছেলের কথায় ওয়াং বিরক্ত ভাবে একটুখানি হাসল।

ওয়াং ঘরে গিয়ে টেবিলের কাছে হুঁকোটি টেনে নিয়ে ব'সে পড়ে। বসে বসে নিজের মনেই বলে—বেশ একটু জোর দিয়েই বলে:

'আমার বাড়ী—আমার ঘর, ভিটে, মাটি সব আমার। খুশী হয় থাকো। নয় বেরিয়ে যাও। হ্যাঃ, সহরে যাবে! জমিজমা রইল এখানে প'ড়ে—সহরে যাও! বললেই হ'লো! বলি এই জমিগুলো যদি না থাকতো, থাকতে কোথায় সব! অমন ফুলবাবুটি সেজে ঠাট ক'রে পেখম ছড়িয়ে বেড়ানো—কোথায় থাকতো! কোন্ কালে না খেয়ে শুটকী হ'য়ে সব শিঙ্গে ফুঁকতে। কোথায় থাকত ওই বিদ্যের গুমর! চাষার ব্যাটা আজ বাবু হ'য়ে বসেছে কিসের দৌলতে!…'

উঠে পড়ে ওয়াং। মায়ের ঘরে গিয়ে দুম দাম ক'রে পা ফেলে পায়চারী ক'রতে থাকে। ক্ষণিকের জন্য ওর আভিজাত্যের আবরণ খসে যায়। ওয়াং চাষা হ'য়ে ওঠে—ঠিক চাষার মত ক'রে মেজের চারিদিকে থুথু ফেলে কুৎসিৎ ভাবে। দুই বিপরীত-মুখী আবেগে ওর চিত্তে সংঘাত বাঁধে। ছেলের জন্য গর্ব বোধ ওয়াং না ক'রে পারে না, সুঠাম আকৃতি, সুমার্জিত বেশ চলাফেরা, ব্যবহার—কে বলবে এই ছেলে এই পুরুষেই লাঙ্গল ছেড়েছে। মনের একদিকটায় এই নিয়ে গর্ব এবং গৌরব-বোধে কানায় কানায় ভরা এবং আরেক দিকে ঐ পরিমাণ ঘৃণা ও রাগ ছেলের ওপর।

নাং এন্ হাল ছাড়েনি! সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। বলল :

'ওই জমিদার বাড়ীটা—হোয়াংদের বাড়ীর কথা বলছিলাম—। ওটা পড়েই রয়েছে। সামনের দিকটায় অবশ্য বারো রকমের সব লোক রয়েছে। কিন্তু ভেতরের মহলগুলো সব খালি। তালা বন্ধ পড়ে থাকে। ওই অংশটা ভাড়া নিয়ে তো বেশ থাকতে পারি আমরা। তুমি, ছোট খোকা ওখান থেকে এসে বেশ এদিকে দেখাশোনা ক'রতে পারবে। শান্তিতে থাকা যাবে, ঐ কুকুরটার হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।'

বাবাকে ঐ নিয়ে ধরে পড়ল। জোর ক'রে চোখ টিপে দু'ফোঁটা জলও বের করল। চোখের জল গাল বেয়ে পড়লেও মুছলো না।

'তোমার কথা মতই তো চলি। কোনো বদ্ খেয়াল নেই, জুয়া বল, আফিং বল, কোন নেশা নেই। তুমি দেখেশুনে যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ তাকে নিয়েই খুসী হ'য়ে ঘর করছি। কোনদিন তো কিছু চাইনি। আজই সামান্য একটু আব্দার করছি—।'

ওয়াং টলল। ছেলের চোখের জলেই কিনা, তা ওয়াংও জানে না, কিন্তু ছেলের মুখ হ'তে 'হোয়াংদের বাড়ীর' নাম উচ্চারণ হ'তেই ওয়াং চমকে উঠল।

ওয়াং ভোলেনি, একদিন ওই গৃহদ্বারে মাথা নীচু ক'রে গিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল। ওই গৃহের অধিবাসীদের সামনে ও সঙ্কোচে মাটিতে মিলিয়ে গিয়েছিল—চোখও তুলতে পারেনি, এমনকি দরোয়ানটাকে পর্যন্ত ভয় ক'রেছিল। ভোলেনি সে কথা—ওয়াং ভুলতে পারেনি। নিদারুণ কলঙ্কের ইতিহাস আজও ওর চিত্তে একটা বিষময় ব্রণের মত হ'য়ে আছে। সেদিন ও খুব ভাল ক'রেই জানত—লোকচক্ষে ওয়াঙের স্থান সহরবাসীদের সমপর্যায়ে নয়—বহু নীচে। বিশাল

জমিদার গৃহের বৃদ্ধ অধীশ্বরীর সামনে ও যখন দাঁড়াল গিয়ে ওর সে বোধ আরো সত্য, আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল—একেবারে চরমে গিয়ে ঠেকল। নিজের চোখের সামনে ওয়াং যেন ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর হ'তে হ'তে একেবারে, অনু-পরিমাণ হয়ে গিয়েছিল। 'আমরা তো ওই জমিদার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারি' পুত্রের এই কথায় চকিতে ওয়াঙের চোখের সম্মুখ থেকে যেন একটা যবনিকা সরে গেল। একটা পরম বাস্তব ওর দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেল···পারে, ওয়াং ও পারে—সেই বৃদ্ধা জমিদার-গৃহিণী যেখানে যে আসনে ব'সে ওকে হীন ক্রীতদাসের মত দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ ক'রেছিল—সেখানে সেই আসনে, তেমনি ক'রে ও গিয়ে বসতে পারে এখন—ঠিক তেমনি ক'রে আর একজনকে হুকুম ক'রতে পারে।

ওয়াং ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে দেখল—হ্যাঁ, ও পারে—ইচ্ছে ক'রলেই পারে।

এই ভাবনাটি নিয়ে ওয়াং খেলায় মেতে উঠল। ছেলের কথায় কোন জবাব দিল না—নিঃশব্দে বসে রইল। পাইপে তামাক সাজিয়ে নিয়ে টানতে টানতে ঐশ্বর্য ও ইচ্ছা করলেই যা পারে তারি স্বপ্নে ডুবে যায়। আজন্মের কল্পলোক, স্ব-মহিমায় ওই জমিদার-গৃহে গিয়ে বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখে ওয়াং। ওর এই স্বপ্ন দেখার মূলে রইল না ছেলে—রইল না কাকা—রইল না তার কেউ।

ওয়াং যে সহরে যাবে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা ক'রবে কিছুই ছেলেকে বলল না বটে, কিন্তু সেদিন থেকে কাকার ছেলেটার ওপর নজর রাখল। নিজের চোখেই দেখল নাং এন্ যা বলেছে সত্যি—বাড়ীর দাসীদের ওপরেই ওর চোখ। এই ইতরটার সঙ্গে আর যে একসঙ্গে বাস করা চলে না এও বুঝল।

কাকার দিকে নজর দিয়ে দেখে অনবরত আফিং ফুঁকে ফুঁকে বেজায় রোগা হ'য়ে গেছে। গায়ের চামড়া হলুদে, হঠাৎ যেন বেশী বুড়ো হ'য়ে দেহ নুয়ে গেছে, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। আর ওদিকে খুড়ীও দিনরাত পাইপ আঁকড়ে পড়ে পড়ে ঝিমোয়। তাই নিয়েই সে পরম সন্তুষ্ট। বাড়ী এখন একেবারে ঠাণ্ডা। আফিং অসাধ্য সাধন ক'রেছে।

মুস্কিল রয়ে গেল ওদের বকাটে ছেলেটাকে নিয়েই। বিয়ে হয়নি এখনও, বুনো জানোয়ারের ক্ষুধা দেহে। বুড়োবুড়ীর মত ওকে আফিং দিয়েই অত সহজে বাগ মানানো গেল না। ওয়াং ইচ্ছে ক'রেই এখন ওর বিয়েও দিলে না

—এক ওই মানুষরূপী জন্তুটাতেই রক্ষে নেই, ওর ঘরে আবার ওরই মত কতগুলো জানোয়ারই তো জন্মাবে! হতচ্ছাড়া ছেলেটা কোনো কাজকর্ম ক'রবে না একেবারে। পরের ঘাড়ে বসে যখন খাওয়া চলে তখন করবেই বা কেন! এক রাতের বেলা দলের সঙ্গে ক'ঘণ্টা ঘোরাফেরা—ঐ যা কাজ। গাঁয়ের লোক ফিরে আসতে গাঁয়ে শৃঙ্খলা ফিরল, সুতরাং ওদেরও নিশাচরবৃত্তির সুযোগ ধীরে ধীরে কমে গেল। ডাকাতরা উত্তর পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে পালালো। কিন্তু আপদটা তাদের সঙ্গে গেল না। ওয়াঙের ঘাড় চেপে পড়ে রইল।

একদিন ওয়াং সহরে গিয়ে মেজ ছেলের সঙ্গে দেখা ক'রে নাং এন্‌এর প্রস্তাবটি তাকে জানিয়ে মত জিজ্ঞাসা করল।

নাং ওয়েন্ এখন তরুণ যুবক—অন্য কেরাণীদের মতই বেশ পরিপাটি ঘষা-মাজা চেহারা। আকারে কিছু ছোটখাটই—চোখের দৃষ্টি প্রখর বুদ্ধিতে ঝল্‌মল করে। বাবার কথায় শান্ত ভাবে উত্তর করে:

'খুব ভালোই তো। আমারও খুব সুবিধে হয়। বিয়ে টিয়ে ক'রে আমিও তাহলে এখানেই থাকতে পারি। আর বড় বড় ঘরে যেমন থাকে সেই রকম সকলে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে।'

বিয়ে। ওয়াঙের চমক ভাঙে। তাইতো এ ছেলের বিয়ের ভাবনা তো এতদিন মনেই আসেনি। শান্ত শিষ্ট ভালো ছেলে। চিরকালটা ঐ রকম—ওর মধ্যে বয়সের কোনো চঞ্চলতা ওয়াঙের চোখে কোনোদিন পড়েনি। কাজেই এ ছেলের বিয়ের কথা এতদিন মনে আসেনি। এখন একটু লজ্জায় পড়ল। বলল: 'তোর বিয়ের কথা অনেকদিন থেকেই ভাবছি—কিন্তু নানা ঝামেলায় আর পেরে উঠিনি। আর এই গেলো বন্যায় একেবারে বসিয়ে দিলে কিনা। এখন তো একটু সুবিধে হয়েছে। এবারে যোগাড়যন্ত্র করব।'

মনে মনে ভাবতে লাগল—মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়।

নাং ওয়েন্ বলল:

'হ্যাঁ সেই ভালো। বাজে খেয়ালে টাকা ওড়ানর চাইতে বিয়ে থাওয়া ক'রে সংসার করাই ভালো। ছেলে না হ'লে চলে কি করে! কিন্তু বাবা, একটা কথা বলে রাখছি। বৌদির মত সহরে মেয়ে আমার ঘাড়ে চাপিও না যেন। ও সব মেয়ের খালি বাপের বাড়ীর খোঁটা আর টাকা, আর কোনো

কথা নেই। অত টাকা ঢালতে আমি পারব না। শেষটায় আমার মেজাজও ঠিক থাকবে না।'

ওয়াং লাং অবাক হয়ে শোনে। বড় বৌ যে ওরকম তাতো জানতো না! অমন প্রতিমার মত চেহারা, চালচলনে কোথাও এতটুকু খুঁৎ নেই। সে মেয়ে অমন? ছেলেটা বেশ কথা বলেছে। বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছে। ছেলের এতটা সংসারী বুদ্ধি হ'য়েছে দেখে ওয়াঙের বেশ আনন্দ হ'ল।

এ ছেলেকে ওয়াং কোনো দিনই বিশেষ আমলে আনেনি। ওর দিকে বড় একটা চেয়েও দেখিনি। আকর্ষণ করার মত কিছু ওর মধ্যে কোনো দিন ছিলও না। ছোটবেলাও না— এক বাঁশীর মত সরু গলায় অনর্গল বকে যাওয়া ছাড়া। আর বড়ো হ'য়ে তো নিতান্ত ঠাণ্ডা ভালো ছেলে হ'লো, কিছু নিয়ে একদিনও কাউকে ভাবাল না। বড় ভাইয়ের অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত প্রখর, অত্যন্ত জোরালো ব্যক্তিত্বের পাশে ও এত মিইয়ে রইল যে কারো চোখেই প্রায় পড়ল না। তার পর কাজ ক'রতে যখন সহরে এল, ওয়াং ক্রমে ক্রমে, বলতে গেলে, ওকে ভুলেই বসল। কেউ যখন জিজ্ঞাসা ক'রেছে ওর ক'ছেলে, তখন মনে পড়ে গিয়ে হিসেবে ধরেছে।

ওয়াং অবাক হয়ে গেল। সামনে দাঁড়ান ওই সযত্নে ছাঁটা, তেল দিয়ে সযত্নে পালিশ ক'রে আঁচড়ান চুল, গ্রে রংএর সিল্কের পরিচ্ছন্ন পরিপাটি জামাটি পরা, সুমার্জিত, ধীর-স্থির-চলন-বলন ওই সুশ্রী যুবক—ওয়াং অবাক হয়ে ভাবে—ওরই ছেলে, সেই ভুলে যাওয়া ছেলে! বাইরে শুধু বলল:

'কেমন মেয়ে চাস্‌রে তুই?'

অত্যন্ত সহজ এবং ধীর ভাবে নাং ওয়েন্ বলে গেল। যেন এ মেয়ের ছবি আগে থাকতেই ওর মনে আঁকা ছিল: মেয়ে হবে গ্রামের—কিন্তু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের। মেয়ের বাপের জমিজমা বেশ থাকবে, আত্মীয়-স্বজন কেউ দরিদ্র থাকবে না। বেশ মোটা যৌতুক নিয়ে আসবে বাপের ঘর থেকে। চেহারাটা হবে চলনসই—খুব ভালোও নয়, আবার একেবারে খারাপও হবে না। মেয়ের ভালো রাঁধতে পারা চাই, যাতে এখানে এসে নিজের হাতে রান্না ক'রতে না হ'লে চাকর বাকরের ওপর নজর রাখতে পারে। আর হবে হিসেবী—চাল যখন কিনবে যা লাগবে ঠিক হিসেব ক'রে, একটি মুঠো বেশী হবে না। আর জামার

কাপড় কিনলে জামাটি হ'য়ে ছাঁটকাটের সামান্য এক আধটু ফালি ছাড়া আর এতটুকুও বাঁচবে না।

আশ্চর্য! ওয়াং আরো অবাক হয়। নিজের ছেলে হ'লেও এ ছেলেকে তো ও এতদিন চেনেনি। ও নিজে বা ছেলে নাং এন্, কেউই অমন ছিল ছিল না ও বয়সে—অত ধীর স্থির, অত বিবেচনা। এ মানুষটার জাত জগৎ সবই যেন ওদের থেকে আলাদা। অত্যন্ত আনন্দ হ'ল ওয়াঙের। হাসতে হাসতে বলল: 'বেশ, বেশ তাই হবে। তোর পছন্দমত মেয়েই খোঁজা যাবে। চিংও গাঁয়ে গাঁয়ে খোঁজ করবে'খন।'

হাসতে হাসতে ওয়াং বিদায় নিল। জমিদার বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর সোজা ভেতরে চলে গেল। নাং এন্এর ব্যাপারে সেই বেশ্যাটার খোঁজ ক'রতে এসে যেমনি দেখেছিল,—সদরের দিকটা ঠিক তেমনি আছে। গাছে গাছে মেলে দেওয়া ভিজে কাপড়,—এখানে সেখানে স্ত্রীলোকেরা লম্বা সূঁচ দিয়ে জুতোর সুকতলী সেলাই ক'রতে ক'রতে জটলা ক'রছে। উলঙ্গ শিশুর দল আপাদমস্তক ধুলো মেখে সান-বাঁধান আঙিনায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ চারদিকে—এখানকার বর্তমান অধিবাসীদের গায়ের কাপড়ের গন্ধ। মানব সমাজের অত্যন্ত নীচ স্তরের সামান্য মানুষ এরা—পতিত উদ্বাস্তু ধনীর গৃহে এমনি ক'রেই ভিড় করে চিরকাল। যে ঘরটায় সেই বেশ্যা থাকত, ওয়াং দেখল সেটা খোলা প'ড়ে—সে নেই। আছে কে আর একজন বৃদ্ধ। ওয়াং খুসী হ'য়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে চলল।

এই নিতান্ত সাধারণ মানুষগুলির ওপর ওয়াঙের কেমন একটা ঘৃণা হয় আজ। ক'বছর পূর্বে হ'লে—অর্থাৎ হোয়াং পরিবার ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠার, মর্যাদার যখন এ গৃহ অধিকার ক'রেছিল, তখন হ'লে—অন্য কথা হত। ওয়াং তখন গৃহের অধিবাসী অভিজাত ধনী সন্তানদের থেকে নিজেকে একেবারে আলাদা স্তরের মানুষ মনে করত—তাদের ঘৃণা করত, ভয় করত, এদের বিরুদ্ধে ওর মন বিদ্রোহ করতে চাই। তখন মনে হ'ত এই সামান্য মানুষরাই ওর স্বগোষ্ঠী, আত্মীয়। কিন্তু আজ ফের ঘুরেছে—আজ ওয়াং এদের ঘৃণা করে। ভূস্বামী ওয়াং, অর্থবান্ ওয়াং আজ এই সামান্য মানুষদের ঘৃণা করে—কারণ, এরা নোংরা, এদেরই গায়ের গন্ধে বাতাস ভারী। ওর মন আজ এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—যেন ও স্বয়ং এই বিশাল ভবনের পরমাত্মীয়। সাবধানে নাক ঢেকে

সাবধানে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস টেনে ওয়াং এদের মধ্যে পথ ক'রে ক'রে এগিয়ে চলে।

ওযে কিছু স্থির ক'রে এসেছিলে তা নয়। নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ও মহলের পর মহল পেরিয়ে চলল। যেতে যেতে দেখল পেছনের দিকে একটা মহল তালা-বন্ধ। দরজার পাশেই এক বৃদ্ধা বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ওয়াং ভালো ক'রে দেখে চিনতে পারে—সেই দরোয়ান গৃহিণী। আশ্চর্য! সেই সদাহাস্যময়ী মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি! সেই মানুষেরই আজ এমনি একেবারে সাদা মাথাটি—হলদে রংএর উঁচু দাঁতগুলো আলগা হ'য়ে মাড়ীর সাথে ঝুলছে। ত্বক কুঁচকে দড়ির মত হ'য়েছে—আর দেহ হয়েছে অস্থি-সার! বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ ওর চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠল—তরুণ ওয়াং তার প্রথম পুত্রকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কতকালের কথা—কোন্ সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সে! এতগুলি বছর একটা চোখের নিমেষে চলে গেল!

আজ প্রথম মনে হ'ল ওয়াঙের – ও বুড়ো হচ্ছে।

কেমন বিষাদে মনটা ভারী হ'য়ে গেল।

বিষণ্ণ ভাবে বৃদ্ধাকে বলল: 'সরো তো একটু, ভেতরে যাব।'

বৃদ্ধা চমকে উঠে চোখ পিট্ পিট্ ক'রে বার কয়েক শুকনো ঠোঁট দুটি চেটে বলল: 'ভেতরের সব মহলগুলি যদি ভাড়া নাও তবে খুলে দেখাই, নইলে খুলব না।'

আচম্বিতে ওয়াঙের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল:

'দেখাও তো আগে – পছন্দ হ'লে তবে তো কথা। নিতেও পারি সবটা।'

ওয়াং নিজের পরিচয় দিল না। সঙ্গে সঙ্গে গেল। প্রত্যেকটি পথ ওর জানা। মহলগুলি নীরব, যেন মরে পড়ে আছে। সামনে ঐ তো ছোট কুঠরীটা যেখানে বিয়ের দিন এসে ওয়াং ওর ঝুড়ি রেখেছিল। ওই তো সেই আরক্ত-বর্ণে চিত্রিত স্তম্ভের সারি-শোভিত দীর্ঘ বারান্দা। বৃদ্ধার পেছনে ও হলটায় গিয়ে ঢুকল। এতগুলি সুদীর্ঘ বছরের বেড়া ডিঙিয়ে ওয়াঙের মন নিমেষে উড়ে চলে গেল সেই দিনটিতে যেদিন ও এই বাড়ীরই একজন পরিচারিকার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই তো সেই কারুখচিত মঞ্চ যেখানে সযত্ন প্রসাধনে উজ্জ্বল মসৃণ ক্ষীণ ক্ষুদ্র অঙ্গখানিকে রজত-শুভ্র সাটিনের পরিচ্ছদে শোভিত ক'রে কর্ত্রীঠাকুরাণী বসে ছিলেন।

কি একটা বিচিত্র আকস্মিক আবেগ ওয়াংকে সম্মুখে ঠেলে নিয়ে গেল। যেখানে কর্ত্রীঠাকুরাণী বসেছিলেন সেই আসনে গিয়ে ও বসে তেমনি ক'রে সামনের টেবিলের ওপরে হাত রাখে। বৃদ্ধা অবাক হয়ে যায়। নীচে মেজের ওপর দাঁড়িয়ে তার কুৎসিৎ মুখের ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে পিট্ পিট্ ক'রে ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আজীবন যে বাসনা ওয়াঙের অবচেতনায় বাসা বেঁধে ছিল, আজ তা ফুলে ফেঁপে, বেগে, আবেগে ওর চেতনায় ভেসে ওঠে। টেবিলে আঘাত ক'রে ওয়াং ব'লে ওঠে :

'এ বাড়ী আমি নেবই।'

উনত্রিশ

আজকাল মনে মনে কোনো সংকল্প ক'রলেও ওয়াং তা তাড়াতাড়ি কাজে ক'রে উঠতে পারে না। অথচ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বোঝা ঝেড়ে ফেলার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। বয়স যতই বাড়ছে ততই এটাও বাড়ছে। কাজ সামনে পড়লে ও প্রায় অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে, কতক্ষণে ঘাড় থেকে নামিয়ে হাল্কা হয়ে হাঁপ ছাড়বে। দুপুরের পর ওর ইচ্ছে করে নির্ঝঞ্ঝাটে চুপচাপ বসে থাকে—বসে বসে আকাশে পড়ন্ত সূর্যের রূপ দেখে, বা মাঠে একটু ঘুরে এসে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করে। তাই বড় ছেলেকে ডেকে ওর সংকল্পের কথা জানিয়ে দিল। বাড়ী বদলের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য মেজ ছেলেকেও ডেকে পাঠাল।

বাঁধা-ছাঁদা হ'য়ে গেলে একদিন ওরা চলে গেল। কমল এবং কোকিলা দাসীদের আর মালপত্র নিয়ে আগে চলে গেল। তারপর গেল নাং এন্ তার স্ত্রী আর লোকজন নিয়ে।

ওয়াং তক্ষুণি গেল না—ছোট ছেলেকে নিয়ে এখানে রইল। যে মাটিতে জন্মেছে তার সাথে আজন্মের নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়ে যাবার মুহূর্ত যখন এল, ওর বুক টন্‌টন্ ক'রে উঠল। ভেবেছিল সহজেই ছিঁড়তে পারবে। পারল না। ছেলেরা পীড়াপীড়ি ক'রতে তাদের বলল :

'আচ্ছা আচ্ছা, তোরা যা তো! আমার জন্য একটা ঘর ঠিক ক'রে রাখিস। গেলেই হবে একদিন। নাতি হবার আগেই যাবো দেখিস। ক'দিন থেকে আবার চলে আসব।' তবুও তারা ছাড়ে না।

'বোবা মেয়েটা রয়েছে,' ওয়াং বলে: 'ওটাকে নিয়ে যাবো কিনা ভাবছি। না নিয়ে গেলেও চলবে না। আমি না হ'লে বেচারা না খেয়ে থাকলেও একটু কেউ উঁকি মেরে দেখবে না।'

ওয়াঙের এ-কথায় বড় বৌএর উপর খোঁটা ছিল। এই হতভাগ্য মেয়েটার গায়ের বাতাসও সে সইতে পারে না। সর্বদা গালাগলি করে: 'মরেনা কেন ও। ওকে কি যমে চোখে দেখেনা? আমার চোখের সামনে থেকে পেটেরটার সর্বনাশ ক'রে তবে ছাড়বে হতচ্ছাড়ী—'

নাং জানে সবই। কাজেই চুপ ক'রে যায়। কড়া কথাগুলো বলে ফেলে ওয়াঙের অনুতাপ হয়। স্বর কোমল ক'রে আবার বলে:

'দাঁড়া মেজ খোকার জন্য পাত্রী ঠিক হ'লেই চলে আসছি। চিং এখানে আছে, এখানে থাকলেই খোঁজ খবর করার সুবিধে হবে।'

এর পর নাং ওদের আর পীড়াপীড়ি করল না। এ বাড়ীতে রইল ওয়াং তার ছোট ছেলে, বোবা মেয়ে, আর কাকা তার পরিবার নিয়ে। কমলের মহলটাই কাকা অধিকার ক'রে বসল। ওয়াঙের এতে বিশেষ আপত্তি হ'লো না, কারণ ও বেশ ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছে, কাকা আর বেশী দিন বাঁচবে না। কাকার মৃত্যুর পর ওয়াঙের ও পরিবারের ওপর কর্তব্য শেষ হ'য়ে যাবে। তখন কথা মত না চললে কাকার ছেলেটাকেও ওয়াং তাড়িয়ে দিতে পারবে। কেউ নিন্দে ক'রবে না।

কাকার মহলে চিং তার জন-মজুরদের নিয়ে চলে এল। আর ওয়াং তার ছেলে মেয়ে নিয়ে রইল মাঝের ঘরে। জবরদস্ত দেখে একজন পরিচারিকা নিল কাজকর্ম করার জন্য।

ওয়াং হঠাৎ যেন ভারী ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। একরকম খেয়ে ঘুমিয়ে ওর দিন কাটে। বাড়ীতে এখন কোনোদিক থেকে কোনো অশান্তি নেই। কেউ নেই বিরক্ত করার মত। ছোট খোকা বড় বেশী চুপচাপ। সে পারতে বাবার চোখের সামনে আসে না। ওর বিশাল স্তব্ধতার ব্যূহ ভেদ ক'রে কিছুতেই ওয়াং ওর হৃদয়-দুয়ারে পৌঁছুতে পারে না। চেষ্টাও করে না।

একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ওয়াং চিংকে মেজ খোকার জন্য পাত্রী দেখতে তাড়া দিল।

চিংও বুড়ো হয়েছে। আরো শীর্ণ হ'য়ে ওর দেহটা এখন একটা নলখাগড়ার মত হ'য়েছে। কিন্তু প্রভুভক্ত কুকুরের মত ওর শক্তি। প্রভুর

কাজে দেহপাত অনায়াসে ক'রতে পারে। ওয়াং ওকে এখন আর কোদাল ধরতে বা লাঙল চালাতে দেয় না। কিন্তু তবুও অনেক কাজ করে চিং—জন-মজুরদের কাজের খবরদারী করে, ফসল মেপে ঘরে তোলার সময় চোখ রাখে—এমনি হাল্কা ধরনের কাজ। সেদিন ওয়াং ওকে পাত্রীর কথা বলতেই ও তাড়াতাড়ি পোশাকী নীল কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘুরে ঘুরে নানা গাঁয়ে মেয়ে দেখতে লাগল। তারপর একদিন এসে বলল :

'তোমার ছেলের জন্য পাত্রী খুঁজতে গিয়ে আমারই যে লোভ হচ্ছে। চমৎকার একটি মেয়ে দেখে এলাম। বয়েস থাকলে কি আর এ মেয়ে হাতছাড়া করি? আমাদের এ গাঁ থেকে তিনখানা গাঁ পেরিয়ে যে গাঁ, সেখানেই বাড়ী ওদের। ভারী সুন্দর, হাসি-খুসি—হুঁসিয়ার মেয়ে। আর তো কিছু নয়—যখন তখন একটু বেশী হাসে এই যা। তোমার সঙ্গে কাজ করার মেয়ের বাপের ভারী ইচ্ছে। জমিজমাও আছে ভদ্রলোকের। আর যৌতুক যা দেবে বললে সে আজকালকার তুলনায় খুবই ভালো বলতে হবে।'

বেশ ভাল সম্বন্ধ। তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে ফেলার জন্য ওয়াং ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তক্ষুনি সম্মতি জানিয়ে দেয়। কাগজপত্র তৈরী হ'য়ে গেলে নিজের সীলটি বসিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ভাবে—আর কি, আর তো মাত্র একটা ছেলে বাকী। বিয়ে-টিয়ের হাঙ্গাম একরকম চুকে বুকে গেল। বেশ আরামে শান্তিতে থাকতে পারব এখন।

বিয়ের আর সব ঠিক হ'য়ে গেল। দিনও ঠিক হ'ল। ওয়াঙের একেবারে ছুটি এখন। সে এখন ঠিক তার বাবার মত ক'রেই রোদে বসে ঝিমোয়।

ওয়াং বুঝতে পারে এখন ব্যবস্থা বদলাতে হবে। চিংএর এখন আগের মত সামর্থ নেই। নিজেরও বয়সের দরুণ এবং অতিভোজনের ফলে দেহটা বেশী রকম ভারী হ'য়ে পড়েছে, আলস্যও এসেছে। ছোট ছেলে নেহাতই নাবালক—কিছুর ভার নেবার মত শক্তি তার এখনও হয়নি—দূরে দূরে যে সব ক্ষেত রয়েছে সেগুলো দেখাশোনা করার বড্ডই অসুবিধা। সুতরাং ঐ সব জমিগুলোকে ভাগে বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়াই ঠিক করল ওয়াং। আশে পাশের অনেকেই সাগ্রহে এগিয়ে এল। কথাবর্তা ঠিক হ'তে দেরী হ'ল না—ফসলের ভাগ আধাআধি; আর বাড়ীর ঘানি যে থেকে তিলের বীজের খোল হয় তা এবং গোয়ালের আবর্জনার সার এসব ওয়াং দেবে। বদলে নিজেদের খাবার জন্য আরও কিছু ফসল পাবে।

এই ব্যবস্থার পর ওয়াঙের এখন বলতে গেলে পুরো ছুটি। মাঝে মাঝে এখন সহরের বাড়ীতে গিয়ে রাতটা থাকে। কিন্তু ভোর হ'তে না হ'তেই সহরের গেট খোলা মাত্র ও হেঁটে হেঁটে পুরনো বাড়ীর পথ ধরে। হাওয়ায় ভেসে আসে কাঁচা ফসলের গন্ধ। ওয়াং নাক দিয়ে বুক ভরে বাতাস টেনে নেয়। নিজের মাটিতে পা দিয়ে আনন্দে ওর চিত্তের দুকূল ছাপিয়ে ওঠে।

ওয়াঙের বৃদ্ধ বয়সের শান্তির পাকাপাকি বন্দোবস্তই ভগবান এরপর ক'রে দিলেন। উত্তরে কোথায় যুদ্ধ বাধল। কাকার ছেলে নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ীটায় বসে থেকে থেকে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। বিশেষ ক'রে কোনো স্ত্রীলোক বাড়ীতে না থাকায় তার হচ্ছিল আরও অসুবিধা। মেয়ের মধ্যে ছিল ওই মন্দা চেহারার পরিচারিকাটি—সেও আবার বিবাহিতা, ওয়াঙেরই এক কিসাণের গৃহিণী। যুদ্ধের কথা শুনে সে এসে বললে :

'বসে বসে গাঁটে বাত ধরে গেল দাদা—আমি চললাম। হাত পা নেড়ে একটু বাঁচব। কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র লাগবে তো। কটা টাকা না দিলে যাওয়া হয় না।'

উল্লাসে ওয়াঙের বুকের ভেতরটা নেচে ওঠে। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ চেপে দুঃখের ভান ক'রে বলে :

'দশটা না পাঁচটা না, কাকার ঐ সবে নীলমনি তুই। তুই যুদ্ধে গেলে ওদের কি হবে বল্‌তো?'

'থাক থাক ঢের হয়েছে—'হাসতে হাসতে কাকার ছেলে বলে: 'মরি বাঁচি যাবোই। যুদ্ধ শেষ না হ'লে আর ফিরব না। একঘেয়ে বসে বসে আর পারি না। তা ছাড়া বুড়ো হ'য়ে গেলে আর তো হবে না, এইবেলা একটু দেশ বেড়িয়ে নেওয়াও হ'য়ে যাবে।'

আর বাক্যব্যয় না ক'রে ওয়াং টাকা বের করে দেয়। নিছক অপব্যয়—কিন্তু এবারও ওর মনে বাজে না। ভাবে, শেষ পর্যন্ত মতিটি যদি স্থির থাকে বাঁচা যায়। যুদ্ধ তো হচ্ছেই কোথাও না কোথাও। কত লোক তো মরে লড়াইয়ে। অত ভাগ্য কি—ওয়াং সাগ্রহে ভাবে—অত ভাগ্য কি হবে—এটাও…!

ভেতরে ভেতরে ওয়াং খুব খুসী। কিন্তু চেপে গিয়ে পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা

যাকে স'স্থা দেয়। আরো বেশী ক'রে আফিং এনে নিজ হাতে পাইপে সাজিয়ে ধরিয়ে দিয়ে বলে : 'তু'দিনে বড় অফিসার হ'য়ে ফিরবে তোমার ছেলে দেখে নিও খুড়ো। আমাদের বংশের মান বাড়াবে ও ছেলে। তুমি কেঁদ না, দেখ না—কি রকম হোমরা চোমরা হ'য়ে ছু'দিনেই ফিরে আসছে।'

ভ্রাতা চলে গেল। এবারে একেবারে অনাবিল শান্তি। বাড়ীখানা নিঝুম নিস্তব্ধ—এক প্রান্তে দুই বুড়ো-বুড়ী আফিংএর ঘোরে ঝিমিয়ে পড়ে থাকে—আর এক প্রান্তে ওয়াং রোদে বসে ঝিমোয়।

নাতি হবে—নাতি হবে—ওয়াং কান পেতে থাকে—ওই বুঝি তার পায়ের ধ্বনি শোনা যায়।

যতই তার আসার সময় এগিয়ে আসে—ওয়াঙেরও সহরের বাড়ীতে যাওয়া আসার পরিমাণ বেড়ে যায়। আজকাল খুবই বেশী থাকে সে ওখানে। মহলে মহলে ঘুরে বেড়ায় আর গভীর বিস্ময়ের সাগরে ডুবে যায়—এ কি হলো ...কি ক'রে হলো! এখানেই—এইতো সেদিনকার কথা ..হোয়াংএর বিশাল বনেদী পরিবার...এখানেই ছিল। আর আজ—বড় বিচিত্র ..ওয়াং ভেবে কূল পায় না। আজ কিনা রয়েছে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে—ও নিজে, ওর পুত্রেরা—আবার আসছে ওই শিশু তৃতীয় পুরুষের ভূমিকায়!

ওয়াঙের অন্তরের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হ'য়ে ওঠে। বহুমূল্য ব'লে হাত গুটিয়ে নেবার কথা ওর আর মনে আসে না। নিজেই থানে থানে সাটিন আর সিল্ক কিনে আনে—বাড়ীর সকলের জামা কাপড় হবে ওতে। নইলে অমন সুন্দর দামী দামী দক্ষিণী কাঠের তৈরী কারুকার্য-খচিত আসবাবের সাথে মানাবে কেন? দাস-দাসীদের জন্যও কালো রংএর সূতী কাপড় আনা হ'লো—হুকুম হ'ল কেউ ছেঁড়া-খোঁড়া পরবে না। নাং এন্‌এর বন্ধুবান্ধবরা সহর থেকে আসে, তারা ওর ঐশ্বর্য দেখছে—ভেবে ওয়াং আত্মপ্রসাদ লাভ করে। অসন-বসন সব ব্যবস্থাই এ গৃহের এবং তার ঐতিহ্যের সাথে খাপ খাওয়ান। আগের মত মোটা আটার রুটির মধ্যে রসুন পুরে পুড়িয়ে নিয়ে খেতে ভালবাসার দিন ফুরিয়েছে ওয়াঙের। এখন ও ওঠে অনেক বেলায়, নিজের হাতে হাল চালানোও নেই—কাজেই এখন বাঁশের কোঁড় বলো, দক্ষিণের আমদানী মাছ বলো, উত্তর দিককার সমুদ্রের শামুক বলো, পায়রার ডিম বলো—কিছুতেই ধনী ওয়াঙের অলস ক্ষুধার মন ভোলে না। আগের স্বাস্থ্যও নেই—রুচিও বদলেছে।

ছেলেদের, কমলের, বৌএদের সকলেরই এ ব্যবস্থা খাওয়ার। দেখে-শুনে কোকিলা হাসতে হাসতে বলে :

'ঠিক তেমনি সব হ'য়েছে আবার। সেই আগের মত। কেবল আমিই বুড়িয়ে শুকিয়ে পোড়াকাঠ হ'য়ে গেছি—বুড়োকর্তার মনে ধরে না। আর সবই হ'লো—আমার কপালেই আর তেমনটি হ'ল না।'

ব'লে বাঁকা চোখে ওয়াঙের দিকে তাকায়। ওয়াং না শোনার ভান করে। তদানীন্তন বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে কোকিলা ওকে তুলনা ক'রেছে বলে ও মনে মনে ওর ওপর প্রসন্ন হয়।

এমনি ক'রে অলসে-বিলাসে, যত খুশী ঘুমিয়ে,—যখন খুশী উঠে ওয়াং পৌত্রের প্রতীক্ষা করে। তারপর এক শুভ প্রাতে স্ত্রীকণ্ঠের কাৎরাণি কানে এল। নাং এন্‌এর মহলে গিয়ে ছেলের কাছে শুনতে পেল বধূ আসন্ন-প্রসবা। কিন্তু কোকিলা বলেছে সময় নেবে—কষ্টও হবে।

ওয়াং নিজের ঘরে ফিরে যায়। বসে বসে কাৎরাণি শোনে। ভয় করে—বহুবছর পরে আবার আজ ওয়াঙের ভয় করে—দেবতাকে আজ আবার প্রয়োজন হয়। উঠে গন্ধ-বণিকের দোকান থেকে কিছু ধূপ কিনে নিয়ে ও সহরে চলে যায় করুণা-দেবীর মন্দিরে। নিষ্কর্মা পূজারীটাকে ডেকে হাতে কটা টাকা আর ধূপকাঠিগুলো গুঁজে দিয়ে বলে : 'দেখুন বৌমার আমার ছেলে হবে। বড় কষ্ট পাচ্ছে। সহরের মেয়ে কিনা, আর বড্ড রোগা। তাই এলাম। আমি পুরুষ মানুষ এসব তো আমার করতে নেই জানি। কিন্তু কি করি, ঘরে আর কোনো মেয়েমানুষ নেই। ছেলের আমার মাও নেই, আপনিই দয়া ক'রে ধূপকাঠি কটা একটু জেলে দেবীর সামনে দিয়ে দিন।'

পূজারী ধূপ জেলে ছাইয়ের মধ্যে গুঁজে বসিয়ে দেয়। ওয়াং তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ভয়ে ওর গা শিউরে ওঠে—যদি মেয়ে হয়! সন্ত্রস্ত হ'য়ে মানত করে—ছেলে হ'লে প্রতিমার জন্য লাল পোশাক বানিয়ে দেবে। আর মেয়ে হ'লে—কিচ্ছুনা—কিচ্ছু দেবেনা ওয়াং।

উদ্বিগ্ন মনে বেরিয়ে আসে। তাই তো—মেয়েও তো হ'তে পারে। ছেলে ছেলে তো ক'রছে, কিন্তু ছেলে না হ'য়ে মেয়ে তো হ'তে পারে। এ কথাটা আগে তো মনে আসেনি। ফিরে গিয়ে আরো ধূপ কেনে। দিনটা অত্যন্ত গরম কিন্তু এই প্রচণ্ড রোদ মাথায় ক'রে, রাস্তার একহাঁটু ধুলো ভেঙে ওয়াং আসে গাঁয়ের ক্ষেত্রদেবতার মন্দিরে, যেখানে ক্ষেত্রদেবতা তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে

অহোরাত্র জাগর হয়ে মর্তের মানবের মাটির প্রহরা দেন। প্রতিমার সম্মুখে ধূপ জেলে দিয়ে প্রার্থনা করে:

'চিরকাল তোমার সেবা ক'রে এসেছি ঠাকুর! বাবা থেকে আরম্ভ ক'রে আজও সকলে কায়মনে তোমার সেবা করি। আমার ছেলের ঘরে ছেলে—আমার নাতি যেন হয় দেখো। ছেলে না হ'লে আর তোমাদের পূজো করছিনে।'

যা করার সব ক'রে একেবারে অবসন্ন দেহে ওয়াং বাড়ী ফেরে। এসে ধপ্ ক'রে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। ওর ইচ্ছে হ'ল কেউ একটু চা এনে দিক, গরম জলে একখানা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে দিক, ও মুখ হাত একটু মুছে ফেলবে। তা হলে হয়ত' একটু ভালো লাগবে। হাততালি দিল, কেউ ফিরেও তাকায় না। সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রছে। ওয়াঙের সাহস হয়না কাউকে জিজ্ঞাসা করে প্রসব হ'ল কিনা, এবং হ'য়ে থাকলে ছেলে না মেয়ে। পায়ে পায়ে ধূলো নিয়ে রাজ্যের অবসাদে ওয়াং ওখানেই বসে রইল। কেউ ওকে একটা কথা জিজ্ঞাসাও করল না।

কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হ'ল—তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। এমন সময় কমল তার গুরুভার দেহ নিয়ে কোকিলার ওপর ভর ক'রে ছোট জুতানি পায়ে টলতে টলতে এসে উপস্থিত হ'ল। মুখ ভরে হেসে জোরে জোরে বলে উঠল:

'ওগো তোমার নাতি হ'ল গো। মায়ে পোয়ে ভালোই আছে। দেখে এলাম ছেলে, বেশ সুন্দর ডাগর ডোগরটি হ'য়েছে।'

ওয়াং হেসে উঠল আনন্দে। তারপর উঠে পড়ে আবার হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বল্ল:

'বাব্বা, সেই থেকে এখানে বসে আছি, আর বসে বসে ভয়ে কালিয়ে যাচ্ছি! যেন আমারই প্রথম ছেলে হচ্ছে।'

কমল চলে যায়। ওয়াং ভাবনায় ডুবে যায়। কই ওর যখন প্রথম ছেলে হয়েছিল তখন তো অত ভয় হয়নি! ভাবতে ভাবতে ওর মনে পড়ে যায় আর একটি দিনের কথা। ওলান্ ধীরে ধীরে অন্ধকার ছোট কুঠরীটার মধ্যে ঢুকল গিয়ে নীরবে—সেখানেই নিঃশব্দে নীরবে একা ঘরে ওর প্রথম ছেলে, এই নাং এন্এরই জন্ম হ'ল। তারপর বার বার—যতবার ছেলে হ'ল, যতবার মেয়ে হ'ল, ওলান্ অমনি ক'রে ওই আঁধার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে,—সেখানে নিঃশব্দে,

নৈঃসঙ্গে ওর সন্তানদের জন্ম হ'য়েছে—তার পরেই ওলান্ মাঠে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তার কাজের আধখানা আপন হাতে তুলে নিয়েছে। সেই মায়েরই ছেলের এ বৌ কিনা বেদনায় শিশুর মত কাঁদল—চাষী-চাকররা ওর জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বাড়ীখানা তোলপাড় করে তুলল! স্বামী-সুদ্ধ গিয়ে আঁতুড় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল।

বহুকাল আগের কথা স্বপ্নের মত ওয়াঙের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ওলান্ কাজের মাঝে হাত থামিয়ে মাটিতে ব'সে প'ড়ে শিশুর মুখে ওর বক্ষের অজস্র ধারা ঢেলে দিত—স্তন উচ্ছ্বসিত শুভ্রধারায় ঝরে' মাটি ভিজিয়ে দিত—। স্বপ্ন! না বাস্তবইতো ছিল! কিন্তু বহুদিন—কত সুদীর্ঘ দিন চলে গেলো… সুদূর অতীতের কুয়াসায় বাস্তব ঝাপসা হয়ে এসেছে…মনে হয় বুঝি স্বপ্ন—কেবল স্বপ্ন সে সব।

ছেলে আসে উদ্ভাসিত চোখে মুখে, গর্বে ডগবগ হ'য়ে বলে: 'তোমার নাতি হ'লো যে বাবা। দুধের দাই চাইতো একজন ছেলেকে দুধ দিতে। ছেলেকে দুধ দিয়ে দিয়ে তোমার বৌএর শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে তা ছাড়া চেহারাও ভেঙ্গে যাবে। বড় ঘরে কোনো মেয়েই ছেলেকে নিজে দুধ দেয় না।'

ওয়াঙের মনে একটা বিষাদ ঘন হয়ে ওঠে—কেন, ও নিজেই বোঝে না। বলে: 'তা, নাই যদি পারে, কি আর করা যাবে! ধাত্রী খোঁজ।'

শিশুর বয়স একমাস হ'লে নাং এন্ তার জন্মোৎসব করল। সহরের বহু পরিচিত বন্ধুবান্ধব, শ্বশুর শাশুড়া নিমন্ত্রিত হ'য়ে এল। শ'য়ে শ'য়ে মুরগীর ডিম লাল রং ক'রে প্রত্যেক অতিথিকে দেওয়া হ'ল। ছেলে দশদিন নির্বিঘ্নে কাটিয়ে উঠলে তবে না নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সেই দশদিন উৎসবে গেছে—ভয়ের কালো ছায়াটা বাড়ী থেকে নেমে গেছে। সুতরাং আনন্দে কোলাহলে বাড়ী মুখরিত হয়ে ওঠে।

উৎসবান্তে নাং এন্ তার বাবাকে এসে বলে: 'তিন পুরুষ একসঙ্গে হয়েছে সুতরাং বনেদী ঘরের রীতি অনুসারে পূর্বপুরুষদের নাম পাথরের ফলকে খোদাই ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে হয়—'

ঐ সব পাথরের ফলক প্রত্যেক উৎসবের সময় পূজো করা হবে—বনেদী ঘরে যেমন হ'য়ে থাকে। কারণ ওয়াং পরিবারও তো এখন পাকা বনেদী পরিবার।

এ প্রস্তাব ওয়াঙের খুব ভালো লাগল। তক্ষুনি ও সম্মতি দিল এবং সব ব্যবস্থা হ'তেও দেরী হ'ল না। হলের প্রাচীরে সারি সারি ফলক বসাল। প্রথমটায় ওয়াঙের ঠাকুর্দার, তারপর ওর বাবার। বাকীগুলো খালি রইল ওয়াঙের পরবর্তী বংশধরদের জন্য। ওয়াং একটা ধূপদানী কিনে এনে ফলকগুলির সামনে রেখে দিল।

ওয়াঙের মনে পড়ে যায়—করুণাদেবীর লাল পোশাক মানত ক'রেছিল মন্দিরে গিয়ে পোশাকের দাম দিয়ে এল।

বোধহয় দেবতারা একেবারে মুক্তহস্তে দেন না—দানের মধ্যে ফাঁক রেখে দেন। সহর থেকে ফেরার পথে একজন কিষাণ মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ওয়াংকে সংবাদ দিল, চিং মৃত্যু শয্যায়, ওয়াংকে একবার দেখতে চায়। অমন হঠাৎ এই ভয়ানক দুঃসংবাদটি পেয়ে ও চটে উঠল :

'বুঝেছি, বুঝেছি, ওই ছোট মন্দিরের ব্যাটাদের হিংসে হয়েছে, ওদের লাল কাপড়ের পোশাক দিইনি। কেন দেব? মানুষের যশ নিয়ে কথা। সেকি ওদের এলাকা—ওরা হ'লো ক্ষেত-খামারের দেবতা।'

এদিকে দুপুরের খাবার তৈরী। কমলের অনুরোধ সত্ত্বেও ওয়াং না খেয়ে চলে গেল রোদের মধ্যেই। কমল ছাতা দিয়ে একটা ঝিকে পেছনে পেছনে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সাধ্য কি ওয়াঙের চলার সঙ্গে তাল রেখে মাথায় ছাতা ধরে রাখে সে।

ওয়াং গিয়ে দেখে চিং ঘরে শুয়ে। ঘরে কিষাণ মজুরদের ভিড়। ওয়াং চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করল : 'কি হয়েছে?'

তাড়াতাড়িতে সকলের কথা একসঙ্গে পিচুড়ী পাকিয়ে যায়।

'একটা নতুন লোক এসেছে—মাড়ানী ধরতেও জানে না।'

'নিজেই কাজ করবে সব—কত বলি বুড়ো হয়েছ…'

'চিং মাড়ানী ধরতে দেখিয়ে দিতে গেছে…'

'বুড়ো মানুষ কি অত পারে?…'

ওয়াং গর্জন ক'রে ওঠে : 'নিয়ে আয় ব্যাটাকে আমার সামনে।'

সকলে লোকটাকে সামনে ঠেলে দিল। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে ভয়ে। ভিন গাঁয়ের মানুষ। বিরাট জোয়ান চেহারা—রংটা লালচে, কোনো অঙ্গে শ্রীছাঁদ নেই। ওপরের দাঁতের পাটি নীচের ওষ্ঠের ওপর চেপে বসে আছে। বলদের মত গোল গোল নিষ্প্রভ ভাবহীন দুই চোখ।

ওয়াঙের বিন্দুমাত্র দরদ হল না লোকটার ওপর। দুই গালে গোটা কয়েক চড় বসিয়ে, দাসীর হাত থেকে ছাতাটা টেনে নিয়ে ওর মাথায় ঘা কতক লাগাল। বাধা দিতে কারো সাহস হয় না, পাছে বাধা পেয়ে ওয়াঙের রাগ আরো বেড়ে যায়—এবং বেড়ে গেলেও হয়তো বৃদ্ধ মনিবের নিজের দুর্বল দেহটারই ক্ষতি হবে।

চিং কাতর শব্দ ক'রে ওঠে। ওয়াং ছাতা ফেলে দৌড়ে ওর বিছানার কাছে আসে। পাশে ব'সে ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়। ঝ'রে-পড়া শুকনো পাতার মত হাতখানা। শিরায় যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই। মুখখানা তো এমনিতেই ফ্যাকাসে। কিন্তু আজ যেন কালি লেপে দিয়েছে কে। তারপর সমস্ত মুখে লাল দাগ। আধ-বোজা চোখের দৃষ্টির ওপর ছায়া নেমে এসেছে। কষ্ট শ্বাস। ওয়াং ঝুঁকে প'ড়ে, কাণের কাছে চীৎকার ক'রে বলে: 'চিং ভাই, আমি এসেছি। বাবার কফিনের মত কফিন আমি তোমার জন্য কিনব, ভেবো না।'

কিন্তু চিংএর কাণ রক্তে ভ'রে গেছে—ওয়াঙের একটা কথাও সেখানে পৌঁছুল না। যদি বা পৌঁছুল, বাইরে থেকে কিছু বোঝা গেল না। কষ্টশ্বাসে দেহটা কেবল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সংজ্ঞা আর হ'লোনা। তারপর এক সময়ে সব থেমে গেল।

চিংএর দেহটার উপর প'ড়ে প'ড়ে ওয়াং বড় কান্না কাঁদল। বাবার জন্যও অত কাঁদেনি। সব চেয়ে ভালো দেখে কফিন কিনল। পুরুত ডাকল। নিজে সাদা পোশাক প'রে পায়ে হেঁটে শবানুগমন করল। ছেলেদেরও পায়ে সাদাপটি বাঁধতে হ'ল—যেন আপন পরিবারের কারো দেহান্ত ঘটেছে। নাং এন্‌এর এতটা পছন্দ হয়নি—শত হ'লেও ভৃত্যই তো, হ'লোই বা না হয় একটু উঁচুদরের—তবুও তো বেতনভোগীই। ভৃত্যের জন্য শোক চিহ্ন ধারণ করাতে, ওর মতে অমর্যাদা ঘটে। কিন্তু ওয়াং ছাড়েনি।

ওয়াঙের ইচ্ছে ছিল বাবা আর ওলান্‌এর কবরের পাশেই চিংকে কবর দেয়। কিন্তু দুই ছেলেই আপত্তি ওঠায়। ওয়াং তর্ক ক'রতে পারে না—অশান্তি সহ্য হয় না। কাজেই যে জায়গাটা ওয়াং পরিবারের কবরের জন্য ঘিরে রাখা হ'য়েছে, তারি মুখে চিংকে কবর দেওয়া হয়। ওয়াঙের বড় বাজে। কিন্তু যেটুকু ক'রতে পারল, তা দিয়েই কোনো মতে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। এত বছর সহস্র অনর্থপাত হ'তে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে ওয়াংকে ওই ছোট

মানুষটি ঘিরে রেখেছিল। ছেলেদের বলে রাখল—মরলে চিংএর পাশেই যেন ওকে কবর দেওয়া হয়।

ওয়াং মাঠে যাওয়া আরো কমিয়ে দিল। চিং-হীন মাঠে যেতে ওর বুক ফেটে যায়। তাছাড়া পরিশ্রমও ক'রতে পারে না। একটুতেই বড় ক্লান্তি আসে। চষা জমির উপর দিয়ে চলতে চলতে হাড়গুলো যেন বিষিয়ে ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে ওঠে। সুতরাং দেখাশোনার লোকের অভাবে সব খামার জমিই আগের মত বরগা দিয়ে দিল। কিন্তু একহাত জমিও বেচল না। সালকাবারী বন্দোবস্ত। জমির স্বত্ব ওরই থাকবে।

একজন কিষাণকে তার পরিবার নিয়ে পুরনো বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেয় খুড়ো-খুড়ীর দেখাশোনার জন্ম। হঠাৎ ছোট ছেলের ব্যাগ্র দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ে যায়। বলে: 'তুইও চল। মেয়েটাকেও নিয়ে যাব। চিং নেই, একা একা কোথায় থাকবি? তাছাড়া আমি না থাকলে চাষের কাজই বা তোকে কে শেখাবে?'

সবাইকে নিয়ে ওয়াং চলে যায়। কদাচিৎ আর এ বাড়ী আসে। যদি বা আসে বেশীক্ষণ থাকে না।

ত্রিশ

ওয়াঙের চারদিক কানায় কানায় ভরা। ওর মনে হয় আকাঙ্খা করার আর কিছু নেই। বিনা আয়াসে টাকা আসে; সুতরাং এখনও ও বোবা মেয়ের পাশে রোদে চেয়ারটায় হেলান দিয়ে ব'সে হুঁকো টেনে শান্তিতে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিতে পারে।

পারতও তাই। কিন্তু বড় ছেলে নাং এন্ এর আর কিছুতেই তুষ্টি নেই। যত পায় ততই বেশী চাওয়া ওর রোগ। একদিন এসে ও বাবাকে বলে:

'অনেক কিছু ক'রতে হবে বাবা। জমিদারের বাড়ীতে থাকি বলে ওই ছাপেই আর কিছু আমরা বাবু বনে গেলাম না। মেজ ভাইএর বিয়ের তো ছু'মাসও বাকী নেই। লোকজন বসাবার মত আসবাবপত্র নেই। বাসন-পত্রই বা কোথায় তেমন? তা ছাড়া সদর মহলে সব ভেড়ার পাল গিস্ গিস্ ক'রছে—যা ভুর্‌ভুরে গন্ধ বেরয় ওদের গা থেকে। এ সবের মধ্য দিয়ে লোকজন আসতে বলতেও তো লজ্জা করে। তারপর দু'দিন বাদে ওয়েনেরও ছেলেপুলে হবে। তখন তো ওসব ঘরগুলোও দরকার হবেই।'

ওয়াং তার সুবেশ পুত্রের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ বন্ধ ক'রে হুঁকোতে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে উঠল :

'তারপর আর কি ?

নাং এন্ বোঝে বাবা ভয়ানক বিরক্ত হ'য়েছে। সেও ছাড়বার পাত্র নয়। একটু কঠিন স্বরেই বলে :

'মোদ্দা কথা হচ্ছে সদরের ওই ঘরগুলো আমার চাই। আর চাই আমাদের মত অবস্থার মানুষের উপযুক্ত ভাবে থাকতে হ'লে যা কিছু দরকার সব।'

ওয়াং হুঁকো টানতে টানতে নীচু স্বরে বলে :

'জমি আমার, তুই হাতও ছোঁয়াসনি কোনোদিন।'

এ কথা শুনে নাং ধৈর্য হারিয়ে চাৎকার ক'রে ওঠে :

'আমার কি দোষ! তুমিই তো আমায় পণ্ডিত বানিয়ে স্বর্গে তুললে। আমি কোথায় চাই—তুমি জমিদার, তার উপযুক্ত হ'য়ে চলবে—আর তুমি আমায় গাল দিচ্ছ! তুমি চাও বৌ নিয়ে আমি ঝি-চাকরের মত থাকি।'

নাং ঝড়ের মত বেরিয়ে যায়। আঙ্গিনার পাইন গাছটায় মাথা ঠুকতে যায়। ওয়াং ভয় পায়, কি জানি ও কি ক'রে ফেলে—চিরকেলে বদরাগী ছেলেটা। 'যা ইচ্ছে কর্‌গে বাপু যা—'ওয়াং ডেকে বলে: 'শুধু অনুগ্রহ ক'রে আমার মাথাটি খেতে এসো না।'

নাং এন্‌এর রাগ পড়ে যায়। বাবার মত পাছে বদলে যায় তাই তাড়াতাড়ি বাবার সামনে থেকে চলে যায়। একদিনও সময় নষ্ট না ক'রে সে কাজে লেগে গেল। সুচাও থেকে কারুকার্য করা কাঠের আসবাব আনাল; লাল সিল্কের পরদা দরজায় জানালায় ঝুল্‌ল। বড় ছোট রকমারী ফুলদানী এল। নানা রকমের ছবি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ঝুল্‌ল। রূপসী মেয়েদের ছবিও কতগুলো নিয়ে এল সঙ্গে নাং এন্। দক্ষিণ দেশে দেখে এসেছিল—সেই রকম ক'রে আঙ্গিনায় কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করার উদ্দেশ্যে বিচিত্র রকমের সব পাথর এল। বহু দিন ধরে এ সব নিয়ে মেতে রইল নাং।

এসব কাজে বারবার ওকে বাইরে যেতে আসতে হয়। সদরের ভাড়াটে ইতর লোকগুলোকে ও কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারে না। তাদের মধ্য দিয়ে আসার সময় নাক বন্ধ ক'রে মুখ বিকৃত ক'রতে ক'রতে যায়। দেখে

লোকগুলো হাসে। পেছনে টিট্‌কিরী দেয়: 'তুদিন আগে বাপের ঘরের তুয়ারে সারের ঢিবি থাকত বাছাধন, তা ভুলে গেছ এরই মধ্যে!' কিন্তু বড়লোকের ছেলে—সামনে কিছু বলতে সাহস পায় না। পেছনে বলেই আশ মেটায়।

নূতন বছরের নূতন ক'রে ভাড়ার চুক্তি হয়। এবারে ভাড়াটেরা দেখল ওদের ঘরের ভাড়া অত্যন্ত রকম বেড়ে গেছে। সুতরাং তাদের বাস তুলতে হ'ল। তারা বুঝতে পারল এ কাজ ওয়াঙের বড় পুত্রের। চতুর ছেলে! মুখে কিছু না বললেও বুঝতে কারোই বাকী রইল না যে তলায় তলায় সেই ভূতপূর্ব জমিদারের ছেলেকে চিঠি লিখে এ ব্যবস্থা ও ক'রেছে। এই পুরানো বাড়ীটা দিয়ে যত বেশী হয় মুনাফা পাওয়াই হ'ল সে ব্যক্তির কথা—সে যে-ভাবেই হোক। কাজেই দরিদ্র ভাড়াটেদের কথা তার কাছে অবান্তর।

ছেঁড়া ভাঙ্গা সামান্য যা সম্বল ছিল পোট্‌লা বেঁধে নিয়ে, এই তুর্গত দরিদ্র, সামান্য মানুষেরা গাল দিতে দিতে, অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল। উদ্বেল ক্রোধে শাসিয়ে গেল—দীন দরিদ্রেরও দিন আসে। ধনীদের বাড় যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়—তারও পথ হয়। এবং সে পথেই একদিন ওরা আবার এখানে ফিরে আসবে।

ওয়াং বড় একটা বাইরে আসে না। তাই ওর কাণে এসবের কিছুই গেল না। ছেলে কি ক'রছে না ক'রছে তা নিয়ে ও মাথাও ঘামায় না—খায় দায়, শান্তিতে এক কোণে পড়ে থাকে। নাং এন্‌ সদর মহলগুলো মেরামত ক'রতে মিস্ত্রী লাগিয়ে দিল। আঙ্গিনায় যে ছোট ছোট জলাধার-গুলো ছিল সেগুলোও মেরামত করিয়ে রঙ্গীন মাছ এনে ছেড়ে দিল। সোনালী মাছ আর পদ্ম ফুলে জলধারগুলো হেসে ওঠে। দক্ষিণ দেশে যেমন দেখেছিল এবং মাথায় যতটা এল নাং এন্‌ বাড়ীখানাকে সাজিয়ে তুলল বড় সুন্দর ক'রে।

নাং এন্‌এর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব নিরীক্ষণ ক'রে দেখে, কোথায় কি ত্রুটি রয়ে গেল, কি বাকী রইল সমালোচনা করে। নাং এন্‌ মন দিয়ে শোনে এবং ত্রুটি সংশোধন করে।

ভূতপূর্ব জমিদার-গৃহের বিলুপ্ত শ্রীর পুনরুদ্ধারের কাহিনী কারো অবিদিত থাকে না। এতদিন যারা ওয়াংকে ওয়াং চাষী ব'লে এসেছে, তারা এখন সসম্ভ্রমে ওর নামের সঙ্গে জমিদার কথাটি জুড়ে দেয়।

কত অর্থ যে এই জাতে ওঠার যজ্ঞে ব্যয় হ'চ্ছে ওয়াং কিছুই বুঝতে

পারে না। কারণ নাং এন্ চতুর, এক সঙ্গে টাকা চায় না। থেকে থেকে এসে টুক্‌রো টুক্‌রো কাজের ফিরিস্তি পেশ করে; আজ শ'খানেক ডলার চাই অমুক কাজের জন্ম, গেটের কাছে সামান্য একটু কাজ বাকী র'য়ে গেছে, সামান্য খরচেই হ'য়ে যাবে—একেবারে আন্‌কোরা নতুন দেখাবে গেট্‌টা—।...একটা লম্বা টেবিল কেনার দরকার যে। ছেলে বারে বারে অল্প অল্প ক'রে চায়—ওয়াংও আরামে পা এলিয়ে পরম আরামে পাইপ টানতে টানতে চোখ বুজে ছেলের হাতে বারে বারে টাকা তুলে দেয় চাইলেই। হিসেবও থাকে না—রাখেও না, দিতেও বাধে না। কেননা প্রতি ফসলের সময়ই আপনি টাকা ঘরে এসে হাজির হয়! অনায়াসের টাকা আয়েসেই খরচ হ'য়ে চলে। মেজছেলে নাং ওয়েন্ সেদিন এসে বাবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে:

'জলের মত টাকা যে কেবলই খরচ হ'চ্ছে—এর মানে কি? অত বড়মান্‌ষী চালের দরকার যে কি তাও তো বুঝি না। বাড়ীখানাকে একেবারে রাজপুরী না ক'রে তুললে বুঝি আর চলছে না? এতগুলো টাকা সুদে খাটালে বিশ ডলার হারে সুদ পাওয়া যায় আজকাল—আজ কত হ'তো বলতো? যত সব বাজে জিনিষ এনে জোটাচ্ছে আর টাকার শ্রাদ্ধ! ওসব ফুল, পাতাবাহারের গাছে কোন্ কর্মটা হবে? ফলটলের গাছ হ'লেও না হয় বোঝা যেত।'

ওয়াং স্পষ্ট বোঝে দু'ভাইয়ের বিপরীত এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ ফল বিবাদ এবং পরোক্ষ ফল ওর নিজের শান্তি ভঙ্গ। সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে ও। বলে:

'আরে এসব তোর বিয়ের জন্মই তো রে!'

নাং ওয়েন্ একটু শুষ্ক বক্র হাসি হেসে বলে:

'চমৎকার! বৌএর দামের দশগুণ বৌ-আনায় খরচ! ওসব দাদার বড়মানুষী চাল। শোন বাবা, ব'লে দিচ্ছি আমরা, সব ভায়েরা, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির সমান হক্‌দার। কিন্তু দাদা একাই যে সব তার বড়মানুষী খেয়ালে ওড়াবে সে কিন্তু বড় ভাল কথা নয়।'

ওয়াং মেজ ছেলের জেদ জানে—একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে সে এক পা নড়বে না। সুতরাং ব্যস্ত হয়ে বলে:

'আচ্ছা আচ্ছা, সব বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। ঠিক কথাই তো বলেছিস তুই। বল্‌ছি ডেকে নাং এন্‌কে। আর একটি পয়সা বার কচ্ছিনে।'

নাং ওয়েন্ মস্ত বড় এক কাগজ বের করল – তার দাদা যা যা খরচ ক'রেছে তারই লম্বা ফিরিস্তি দেখে ওয়াঙের মাথা ঘুরে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে: 'ওরে আমি খাইনিরে এখনও। বুড়ো মানুষ এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে চোখে আঁধার ঠেকে। রাখ্ ওটা। দেখব'খন।' বলেই নিজের ঘরে চলে যায়। সেদিনই সন্ধ্যার সময় বড় ছেলেকে ডেকে বলল :

'এবার থামা দেখি বাপু ওসব। আমরা গেরস্ত গাঁয়ের মানুষ, আমাদের অত চালে দরকার কি ?

'ককৃখনও না,' রুষ্ট স্বরে নাং এন্ জবাব দেয় : 'আর আমরা গেঁয়ে নই। সহরে কি নাম মান আমাদের জানো ? লোকে আমাদের এখন বনেদী বলে। আমি তেমনি ভাবেই মাথা তুলে থাকতে চাই। বেশ তো, মেজবাবু যদি কেবল টাকাই চিনে থাকেন, কি আর ক'রব। আমি আর বৌ মিলেই যাতে আমাদের পরিবারে মান বজায় থাকে দেখব।'

ওয়াং আজকাল বাইরে বড় একটা যায় না। এমন কি রেস্তোরায়ও না। বাজারে তো দরকারই হয় না – মেজ ছেলেই ব্যবসা চালায়। কাজেই সহরে যে ওদের এত মান বেড়েছে, চাষী থেকে একেবারে বনেদী পর্যায়ে উঠে গেছে – এ খবর ওয়াঙের কাণেই আসেনি। এখন খবরটা শুনে ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাব গোপন ক'রে বলে :

'দেখ, জমিদার বল্, বনেদী বল্, সবই ওই মাটি থেকে। সব কিছুর মূল ওই মাটিতে—বুঝেছিস্ ? গাছ ওপরে উঠে যায় কিন্তু শেকড় থাকে মাটিতে।'

ওয়াঙের মুখের কথা শেষ না হতেই নাং এন্ বলে :

'হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু মাটি কামড়েই কিছু আর তারা চিরকাল পড়ে থাকে না। তাদেরও ডাল পালা গজায়, ফুল হয়, ফল হয়।'

অমন মুখে মুখে জবাব ওয়াঙের সহ্য হয় না। ছেলের কাছে হারও মানবে না। একটু রুক্ষ স্বরে সে বলে :

'এই যা বললাম। সব থামিয়ে দে। আর টাকা দেব না আমি। আর দেখ্ ফুল ফল পেতে হ'লে ওই মাটির মধ্যেই গাছের শিকড়কে জিইয়ে রাখতে হবে যত্ন ক'রে। বুঝলি ?'

সন্ধ্যে হ'য়েছে। আর এসব গোলমাল ওয়াঙের ভালো লাগছে না। ছেলেটা কেন তার যত বিবাদ, যত দাবি-দাওয়া, সব নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় না ?

এই লোকটা ওর সামনে থেকে চলে গেলে ওয়াং নিরালায় সন্ধ্যার এই স্নিগ্ধ আঁধারের গভীর প্রশান্তিতে ডুব দেবে। কিন্তু এ ছেলেকে নিয়ে সুখ ওয়াঙের কপালে লেখা নেই। তার নিজের এবং নিজের মহলের ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, কাজেই কটা দিন সে হয়ত' সুবোধ ছেলে হয়ে থাকবে। কিন্তু না—নাং এন্ আবার আরম্ভ করে :

'তুমি যখন বলছ তখন থামিয়েই দিচ্ছি সব। কিন্তু আর একটা কথা আছে।'

ওয়াং পাইপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে চিৎকার ক'রে ওঠে :

'খা খা, খেয়ে ফেল্ আমাকে।'

নাং এন্‌ও না দমে শক্ত হয়ে জবাব দেয় :

'আমার সাত গুষ্টির কারো কথা নয়, বলছি তোমারই ছোট ছেলের কথা। লেখাপড়া শেখালে না, মুর্খ ক'রে রাখলে, সেই কথাই বলছিলাম।'

ওয়াং অবাক হয়। এ যে একেবারে নূতন কথা। ও যে বহুদিন আগেই ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের পাকা ব্যবস্থা ক'রে রেখে দিয়েছে!

'থাক বাপু যথেষ্ট হয়েছে', ওয়াং বলে : 'আর পণ্ডিতে কাজ নেই। দু'জনেই যথেষ্ট—। ও ওই জমিজমা নিয়েই থাকবে।'

হ্যাঁ, সেই জন্মই তো,' নাং এন্ জবাব দেয় : 'রাতে ও চুপে চুপে কাঁদে, আর শুকিয়ে অমন কাঠ হচ্ছে দিন দিন।'

কাঁদে! বলে কি! ছোট ছেলের মনোগত ইচ্ছার খোঁজ রাখার ওয়াং কখনও দরকার বোধ করেনি। সে যে কি ক'রতে চায় সেকথা একবারও জিজ্ঞাসা করার কথা ওর মনে হয়নি। জমির কাজে ওকে রাখার সংকল্প ওয়াং আগে থেকেই স্থির ক'রে রেখেছিল। আজ নাং এন্‌এর কথা যেন ওকে একেবারে বসিয়ে দিল। মুখ দিয়ে একটা কথা সরল না। ধীরে ধীরে পাইপটা কুড়িয়ে নিয়ে ছোট ছেলের কথাই ভাবতে লাগল। বড় দু'ভাই থেকে ছেলেটা একেবারে আলাদা ধরনের। মুখে একটি কথা নেই, ঠিক ওর মার মত। ওর ওই নীরবতার আড়ালেই ও সকলের দৃষ্টি থেকে ঢাকা প'ড়ে আছে। কারোই চোখে পড়ে না।

ওয়াং একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করে : 'কিছু বলেছে তোকে?'

নাং এন্ জবাব দেয় : 'তুমিই জিজ্ঞাসা ক'রোনা একবার।'

'কিন্তু একজনকে তো জমিজমা নিয়ে থাকতেই হবে।' ওয়াং হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠে।

'কিন্তু কেন?' নাং এন্ বলে: 'তোমার মত লোকের ছেলে মূর্খ চাষাভূষোর মত হ'য়ে থাকবে? লোকে বলবে কি তোমায়? আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে আর বলবে তুমি কৃপণ, তুমি কঞ্জুষ। বলবে' নিজে থাকে রাজার হালে আর ছেলেকে রেখেছে চাষা বানিয়ে।'

অাঁতে ঘা দিয়ে কথাগুলো নাং এন্ বলে। ও জানে লোকমত সম্বন্ধে ওর বাবার অসীম দুর্বলতা। আবার বলে: বাড়ীতে মাষ্টারও তো একজন রেখে দেওয়া যায়। কিছুটা এগুলে পরে দক্ষিণে কোথাও পাঠান যেতে পারে ভালো লেখাপড়া শেখার জন্য। বাড়ীতে আমরাই তো দু'জন রইলাম তোমার কাজকর্ম দেখার জন্য। ভাবনা কি তোমার, ও যা চায় ক'রতে দাও।'

ওয়াং অবশেষে বলে: 'আচ্ছা দে দেখি ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে।'

২

কিছুক্ষণ পরে ছোট এসে সামনে দাঁড়াল। ওয়াং তাকাল ওর দিকে, ভাল ক'রে দেখবে আজ। দোহারা গড়ন—না বাপের মত, না মায়ের মত; কেবল মায়ের গভীর নীরব অতল গাম্ভীর্যের আবরণ মুখে; কিন্তু মায়ের চাইতে মুখখানা সুন্দর। ছোটখুকী ছাড়া ওয়াঙের অন্য সব সন্তানদের মধ্যে এই ছেলেই বেশী সুন্দর। কিন্তু সারা কপাল জুড়ে অতি বিস্তৃত, ঘন কৃষ্ণ ভ্রূ-জোড়া ওর কচি ম্লান মুখখানায় নিতান্ত বেমানান, কিছু সৌন্দর্যহানিও ঘটিয়েছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করা ওর প্রায় মুদ্রাদোষই। কুঞ্চিত ক'রলেই ভ্রূ জোড়া একসঙ্গে মিলে একটা ঘন কালো প্রশস্ত রেখার সৃষ্টি করে কপাল জুড়ে।

ওয়াং ছেলের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে বলল:

'তোর দাদা বলছিল, তুই লেখাপড়া ক'রতে চাস্।'

'হুঁ—' সংক্ষিপ্ত উত্তর, ঠোঁট হয়ত' নড়লওনা।

ওয়াং পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে নূতন তামাক ভরে নিল।

'বেশ। বুঝতে পাচ্ছি, জমিজমার কাজ তোর পছন্দ হচ্ছে না। তিন তিনটে ছেলে, অথচ জমিগুলো দেখবার একজন কেউ আমার নেই।' স্বরে তিক্ততা মেখে ওয়াং বলে। কিন্তু ছেলে কোন উত্তর করল না। সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম-বেশে আচ্ছাদিত দেহ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। ওয়াং এই নীরবতায় রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'উত্তর দিচ্ছিস্ না যে বড়! ঠিক ক'রে বল, সত্যি তুই জমিজমা নিয়ে থাকতে চাস্ কি না!'

আবার একশব্দে উত্তর: 'উহুঁ।'

ওয়াং ছেলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে—জীবনের এই সায়াহ্নে ছেলেরা ওকে শান্তিতে থাকতে তো দিলই না, বরং দুর্বহ বোঝা ক'রে তুলল। ওয়াং মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু পথ পায় না। অত্যাচার, ঘোর অত্যাচার ক'রছে ছেলেরা ওর ওপর। ওয়াঙের মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। তিক্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে ওঠে:

'যা খুশী করগে যা; আমার কি এল গেল! দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।'

ছোট পালিয়ে বাঁচে। ওয়াং বসে থাকে একা। ভাবে, ছেলেগুলোর চাইতে মেয়েদুটো ঢের ভালো। বোবা মেয়েটা কিছু চায় না—যা কিছু দিয়ে পেটটা ভরলে হ'ল, আর পাকাবার জন্য একফালি কাপড়। আর একজন তো বিয়ে হয়ে পরের ঘরে চলে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়ায় ওয়াংকে ঘিরে শূন্যতার যবনিকা নেমে আসে।

কিন্তু বরাবর রাগ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে ওয়াং যা ক'রত এবারও তাই করল। ছেলেদের স্বাধীন ইচ্ছায় আর বাধা দিল না। নাং এন্‌কে ডেকে বলে দিল, ছোট যদি লেখাপড়া শিখতে চায়ই নেহাৎ, তবে তার জন্য কোন মাষ্টার রেখে দেয়, ওয়াঙকে আর এ নিয়ে যেন বিরক্ত না করা হয়। যার যা খুসী করুক। মেজকে ডেকে বলল:

'কেউ যখন জমির কাজ করবে না তখন তাকেই ওদিক দেখেশুনে বন্দোবস্তের টাকা পয়সা আদায়পত্র করার ভার নিতে হবে।'

মেজ খুসী হল; কারণ টাকাগুলো তার হাত দিয়ে যাবে তো, তাহ'লে তার জানা থাকবে জমি থেকে কি আয় হ'ল না হ'ল। দাদার খরচের হিসাব বাবাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে তখন দেখিয়ে দেবে।

অতি-হিসেবী মেজ ছেলেকে ওয়াং যেন বুঝে উঠতে পারে না। বিয়ের দিনেও ওর হিসেবী মন বেহিসেবী হল না। ভোজ্য পানীয়ের চুল চেরা হিসেব রাখল নিজের তত্ত্বাবধানে সাবধানে। নিজে পরিবেশন করাল; ভাল জিনিষ দিল সহরবাসী অতিথি বান্ধববর্গকে যারা 'ভালো'র মর্যাদা বোঝে; প্রজা ও মধ্যম পর্যায়ের নিমন্ত্রিতদের ভাগে রইল তাদের দৈনন্দিন সাদামাটা

পানাহার থেকে সামান্য উন্নততর মধ্যম ব্যবস্থা, যা তারা পরম রাজভোগ ব'লে উল্লাস ক'রবে।

বাইরে থেকে যা উপহার এল, তার দিকেও হিসেবী চোখ রাখল। অনুচর পরিচরদের স্বল্পতম যেটুকু না দিলে নয়, তাই দিল। কোকিলার হাতে বকশিশের ঐ রকম একটা পরিমাণ এসে পড়াতে সে তো নাক সিঁটকে ভ্রূ কুঁচকে লোকজনের সামনেই চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিল :

'বাবাঃ' কি হাড় কেপ্পন! হবেই বা না কেন? চাষার পোর আর কত হাত হবে। সব কানাকড়ি ধুয়ে বাক্সে তোলো। অমন ঠাট ক'রে থাকলে কি হবে, দেখলেই চেনা যায় ও ময়ূরের পেখম লাগানো দাঁড়কাক।'

এই কুৎসিৎ ইঙ্গিত বড়র কাণে গিয়ে ওকে লজ্জায় এতটুকু ক'রে ফেলল। কোকিলার ক্ষুরধার রসনার তীব্রতাকে নাং এন্‌এর বড় ভয়; আড়ালে ডেকে এনে আরো টাকা দিয়ে তার মুখবন্ধ ক'রে তবে রক্ষা। কিন্তু মেজর ওপর বড় রাগ হল। বিয়ের দিনে সমাগত নিমন্ত্রিতদের সামনেও দুই ভাইয়ের মধ্যেকার এই ধূমায়িত অপ্রীতি অপ্রকাশ রইল না।

নাং এন্‌ তার নিজের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে খুব কমই নিমন্ত্রণ ক'রেছিল। মেজর যেরকম অতিহিসেবী স্বভাব, বন্ধুদের সামনে অপ্রস্তুত হবার ভয় ছিল, তা ছাড়া কনে গ্রামের মেয়ে সে লজ্জাও ছিল। নববধূর চেয়ার এলে নাং একদিকে সরে গেল। অতবড় ধনী পিতার পুত্র হয়ে মানিকের পাত্র কেনার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভাই এই মেটে হাঁড়ি নিয়ে এল; এই রুচিহীনতা নাং এন্‌এর পছন্দ হয়নি। বৌ নিয়ে ভাই ওকে প্রণাম ক'রলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সামান্য একটু মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল মাত্র। বড় বৌ চাল চলনে নিখুঁত। তার স্থান থেকে যতটুকু মাথা না নোয়ালে নয় কেবল ততটুকু মাথা নুইয়ে সে ব্যবহার-রীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখল।

এই বিশাল পুরীর মধ্যে একমাত্র ওয়াঙের শিশু পৌত্র নিরুদ্বেগে, আপন ভুলে দিন কাটায় পরম আনন্দে। আর কারো মনেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই।

কমলের পাশের ঘরে বিরাট পালংএর কারুশোভিত বেষ্টনীর ছায়ায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে ওঠে ওয়াং: এ শতমহলা পুরী কোথায় মিলিয়ে গেছে—সেই অনাড়ম্বর অন্ধকার মেটে ঘর, সেখানে যেমন খুসী

চলতে পারো, ঠাণ্ডা চা'টা মেজেতে ঢেলে দিতে পারো। চলতে গেলেই এখানকার মত সুশৃঙ্খল সজ্জায় অসাবধানে বিপর্যয় ঘটাবার ভয় থাকে না সেখানে। পৈঠে থেকে পা বাড়ালেই পরমাত্মীয় মৃত্তিকার বিস্তার—উদার আকাশের সুনীল উন্মুক্তি!

ভাইদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকে। ভিন্নমুখী মনোধারা—সংঘর্ষ অনিবার্য। বড়র ভয়, পাছে খরচের হিসেব ক'রতে গিয়ে লোকদৃষ্টিতে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে বসে; মেজো অপচয়ের ছিদ্রপথে অর্থের ক্ষয় ঘটতে দেবে না কিছুতে; আর চাষার ছেলের মত ক্ষেতে মাঠে যে দিনগুলো বৃথাই চলে গেল, তার প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ছোট।

নাং এন্‌এর শিশু পুত্র শুধু নিজের জগতে তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। ছোট ছোট টলায়মান পায়ে ছুটে বেড়ায় সারা বাড়ী। এই বড় বাড়ীটাই বেড়াবার একমাত্র জগৎ, এর বাইরে কিছু আছে ব'লে তার মনেই হয় না। বাড়ীটা ছোট কি বড় সে বিচার করে না সে। ছোট হোক বড় হোক, এ ঘর ওর নিজের, এখানে ওর বাবা আছে, মা আছে, দাদু আছে, আরও অনেকে আছে যারা ওর সেবক, ওর আজ্ঞাকারী। বৃদ্ধ ওয়াঙের শান্তির উৎস, সুখের খনি এই শিশু ভোলানাথ। ওকে দেখে দেখে ওয়াঙের চোখ ভরে না; ওর সঙ্গে হেসে খেলে, প'ড়ে গেলে বুকে ক'রে তুলে নিয়ে ওয়াঙের মন ভরে না। মনে পড়ে ওর বাবা কেমন ক'রে ওর ছেলেদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আগলাতো। নাতির কোমরে কোমরবন্ধ জড়িয়ে তাতে একটা ফিতে লাগিয়ে ধরে ধরে বেড়ায় ওয়াং, খোকা যেন প'ড়ে না যায়। বড় ভাল লাগে ওর। অমনি ক'রে এ-মহল থেকে ও-মহলে, এ-উঠান থেকে সে-উঠানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। শিশু কখনও পুকুরে মাছদের সাঁতারে সাঁতারে লুকোচুরী খেলার দিকে কচি কচি আঙুল দিয়ে নির্দেশ ক'রে খল খল ক'রে হেসে ওঠে; কখনও তার অর্ধোচ্চার কাকলীতে অনর্গল কত কি ব'লে যায়, কখনও মুঠো ক'রে ফুল-সুদ্ধ গাছের ডগাটা টেনে ছেঁড়ে। কোথাও কোন বাধা নেই, সব কিছুই যেন ওর স্বাধিকারের এলাকা, ওর খুসীর জন্য সব। এই শিশুর লীলায় ওয়াং কি যে শান্তির সম্পদ আহরণ করে তা বলা যায় না।

শিশুর সংখ্যা বেড়ে চলে। বড় বৌ প্রকৃত গৃহিণীর মত প্রতিবৎসর একটি ক'রে পুত্ররত্ন উপহার দিতে লাগল। প্রতি শিশুর একজন ক'রে পরিচারিকা

এল। শিশু আর পরিচারিকার সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলে। কেউ যদি এসে ওয়াঙকে বড়ছেলের বংশ বৃদ্ধির খবর দিত সে খালি হাঃ হাঃ ক'রে হেসে বলত' :

'আসুক, আসুক। আমার মাটির দৌলতে ঘরে ভাতের অভাব নেই।'

মেজ বৌও যথাসময়ে জন্ম দিলেন একটি কন্যার—যেন বড় জায়ের সম্মান দেখিয়ে। পাঁচ বছরের মধ্যে চার নাতী, তিন নাতনীর কান্না হাসি, কল-কলে ঘরদুয়ার টলমল ক'রে উঠল। এদের নিয়ে মেতে পাঁচটা বছর আফিংখোর খুড়ো খুড়ির কথা ওয়াং প্রায় ভুলে বসে ছিল। তবে ঠিক সময় তাদের আহার বস্ত্র আর মৌতাত জুগিয়ে এসেছে। পঞ্চম বছরে শীত যা পড়ল, গত ত্রিশ বছরে অমন হয়নি। যতদূর ওয়াঙের মনে পড়ে, এর আগে খাত কখনও জমেনি। এবার জমা খাতের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে। গরম কাপড়, চামড়ার জামার ভেতর দিয়ে রক্ত পর্যন্ত বরফের হিম স্পর্শ পৌছায়। প্রতি ঘরে আগুনের জ্বালাও মানুষের নিশ্বাসের শীতলতায় নিস্তেজ হয়ে আসে। বহুদিন থেকে ওয়াঙের খুড়ো-খুড়ী আফিংএর সঙ্গে সঙ্গে গায়ের মাংস অবধি ফুঁকে ফুঁকে কঞ্চির মত হ'য়ে গেছে। রাতদিন দু'জনে বিছানায় পড়ে থাকে। শরীরের কোথাও একফোঁটা উষ্ণতার লেশ নেই। ওয়াং শুনেছিল খুড়ো আর উঠে বসতে পারে না, কাশির সঙ্গে রক্ত বেরয়। ওয়াং দেখতে এল ; বুঝতে বাকী রইল না বৃদ্ধের ডাক এসেছে।

ওয়াং তার কর্তব্য করবে। উৎকৃষ্ট না হ'লেও বেশ ভাল কাঠের দুটি শবাধার কিনে কাকার ঘরে এনে তাকে দেখাল। মৃত্যু-পথ-যাত্রী বৃদ্ধ বৃদ্ধা মনে শান্তি পায়। শুকন হাড়ের আঁটিটাকে রাখার স্থান হলো, এ স্বস্তি নিয়ে বৃদ্ধ চোখ বুজতে পারবে এবার। কম্পিত, দুর্বল, অস্পষ্ট স্বরে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল :

'তুইই আমার আসল ছেলেরে বাপ, তুইই আমার ছেলে। ঐ হতভাগাটা কোন্ জাহান্নামে গেছে কে জানে !'

খুড়ীর দেহে একটু বেশী শক্তি আছে স্বামীর চাইতে। বলল :

'আমায় কথা দে বাপ ছেলেটা ফেরার আগেই যদি আমরা মরি তবে তার একটা বিয়ে থাওয়া তোরা দিয়ে দিবি। আমাদের বংশটা লোপ হ'তে দিসনে বাপ।' ওয়াং প্রতিজ্ঞা করে।

তারপর হঠাৎ একদিন কাকা এপারের তল্পী গোটাল। কেউই কিছু

জানতে পারে নি। ঝি খাবার দিতে গিয়ে দেখল প্রাণহীন দেহটা কাঠ হ'য়ে বিছানায় পড়ে আছে। সেদিন অসম্ভব শীত। বরফের ঝড় বইছিল সকাল থেকেই। তারি মধ্যে ওয়াং কাকাকে কবর দিয়ে এল ওদের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে, ওর বাবার সমাধির পাশে, আর ওর নিজের জন্য নির্বাচিত জায়গার ঠিক ওপরে।

সমস্ত পরিবারকে একবছর ধরে শোকচিহ্ন ধারণ ক'রতে হ'ল। যে লোকটার মৃত্যুতে এদের সুদীর্ঘকালের মুস্কিল আসান হ'লো, তার বিয়োগ-বেদনায় বিধুর হ'য়ে শোকচিহ্ন ধারণ করল তা নয়—এ হচ্ছে বড়ো ঘরের প্রচলিত রীতি। পরিবারের কারো মৃত্যু হ'লে শোক না হ'লেও একবৎসর শোকচিহ্ন ধারণ করা অভিজাত-শাস্ত্রের অনুশাসন।

খুড়ীকে আর একা ফেলে রাখা যায় না। সহরের বাড়ীতে এনে শেষ মহলের একটা ঘর তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল কোকিলাকে ওয়াং বলে দিল, খুড়ীর পরিচর্যার জন্য একজন দাসী নিযুক্ত ক'রে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতে। বৃদ্ধা পরম তৃপ্তি-ভরে বিছানায় শুয়ে আফিংএর হুকো মুখে দিয়ে ঘুময়। পাশে রাখা কফিনটা দেখে সে পরকাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে।

ওয়াং অবাক হ'য়ে যায়—সেদিনকার সেই মেদবহুল প্রচুর-দেহা গ্রাম্য নারী, যার আলস্য, আর রসনার ক্ষুরধার ওয়াঙের পরম ভয়ের বস্তু ছিল—আজ তারই এই মূক বিশীর্ণ পাণ্ডুর মূর্তি! অবলুপ্ত-মহিমা জমিদার পরিবারের লোলচর্ম পাণ্ডুরবর্ণা বৃদ্ধা কর্ত্রীর ছবির সাথে এ ছবি যেন একেবারে এক হয়ে মিলে গেছে।

একত্রিশ

ওয়াং আজন্ম লড়াইয়ের কথা শুনেই এসেছে কেবল। সেবার যখন দক্ষিণ দেশে ছিল দুর্ভিক্ষের বছরে, তখন আভাস পেয়েছিল মাত্র। তার চাইতে বেশি কিছুর অভিজ্ঞতা ওর আজও হয়নি, যদিও ছোটবেলা থেকে অমুক জায়গায় যুদ্ধ হ'চ্ছে বলে বহুবার লোকজনকে বলাবলি ক'রতে শুনেছি। মাটি, জল, আকাশের মতই যুদ্ধের মধ্যেও ভয় করার মত ওয়াং কিছুই খুঁজে পায় না। যুদ্ধ যে কেন হয় কেউ বলতে পারে না। তবে প্রায়ই লোককে বলাবলি ক'রতে শোনে—'চল্লুম লড়াইয়ে।' বিশেষ ক'রে দুর্ভিক্ষের সময়ে এই সদিচ্ছার প্রকাশ বেশী দেখা যায়—ভিক্ষা করার অগৌরবের চেয়ে সৈনিক জীবনের ক্লেশ সয়

ভালো। বাড়ীতে গোলমাল হ'লেও কাউকে কাউকে অমন কথা বলতে শুনেছে। ওর খুড়তুত ভাইও বলেছে। এ পর্যন্ত দূরে দূরেই লড়াই হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ-আসা দমকা হাওয়ার মত এও যে ঘরের কোণে এগিয়ে আসবে কে ভেবেছিল ?

ওয়াং প্রথম শুনল মেজছেলের কাছ থেকে। সেদিন দুপুরে খেতে এসে সে ব'লল : 'দক্ষিণে যুদ্ধ বেধে গেল বাবা। এদিকেও এল বলে। ধানের বাজারটা হঠাৎ তাই চড়ে গেল। আরও চড়বে বলে মনে হচ্ছে। ওরা যতই এগুবে ততই দাম বাড়বে। ধান ছাড়ছিনে এখন। ওরা আসুক, খুব ভাল দাম পাওয়া যাবে।'

'বেশ ভালোই। যুদ্ধ এদিকে মাঝে মাঝে হ'লে তো মন্দ হয় না। চিরজন্ম শুনেই এলুম লড়াই। কিন্তু পদার্থটা যে কেমন তা আর দেখা ভাগ্যে হ'ল না এপর্যন্ত। এবার তা'হলে দেখে নেওয়া যাবে।' তারপর ওর মনে প'ড়ে গেল —সৈন্যেরা ওকে ধরে নেবে বলে কি ভয়টাই না পেয়েছিল সেবার। এখন তো আর সেই ভয় নেই। এই বুড়ো হাবড়াকে নিয়ে তো আর কোন কাজে আসবে না। তাছাড়া ও সেদিনকার মত গরীব নেই আর যাদের টাকা আছে, তাদের ভয় কি ? সুতরাং এর বেশী আর মাথা ঘামাল না। সামান্য একটু কৌতূহল ছাড়া আর কোন মনোবিকার হ'ল না ওয়াঙের। ছেলেকে বলল :

"যা ভাল বুঝিস কর। ধান আটক রাখতে হয় রাখ। সব তো তোর হাতেই।'

রোজকার মতই, যখন ভালো লাগে নাতি নাতনীদের সঙ্গে খেলা করে, খায়, ঘুমোয়, হুঁকো টানে : মাঝে মাঝে ওরই মহলের এক কোণে ব'সে-থাকা বোবা মেয়েটাকে দেখে আসে।

গ্রীষ্মের প্রথম দিকে উত্তর-পশ্চিম থেকে পঙ্গপালের ঝাঁকের মত মানুষের ঝাঁক এসে সহর ছেয়ে গেল। ভোরবেলা ওয়াঙের নাতি ভৃত্যের সঙ্গে বাইরে গেটে দাঁড়িয়েছিল। দলে দলে ধূসর-বর্ণের কোট-পরা মানুষের অন্তহীন সারি দেখে সে দৌড়ে এসে বলল :

'দাদু দাদু, দেখ'সে শিগ্‌গির কি সব আসছে।'

নাতির মন রাখার জন্য দাদু গেটে যেয়ে যা দেখল, তাতে তার চক্ষু স্থির। অগুন্তি মানুষ, রাস্তাঘাট ছেয়ে—সহর ছেয়ে—। ওয়াঙের হঠাৎ অনুভব হয়, একবেশ-পরা এই সংখ্যাতীত লোকগুলির উদ্দাম দাপটে আলো বাতাসের বুঝি স্নায়ু ছিঁড়ে গেল। ওয়াং পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখল—এদের প্রত্যেকের

হাতে এক এক-খানা একরকম মাথায় ছোরার মত লাগান অস্ত্র। প্রত্যেকের মুখে একরকম বন্য ভীষণতা। কচি বয়সের কতগুলো ছেলেও ছিল এদের মধ্যে, কিন্তু সকলের মুখে ঐ এক ছাপ। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওয়াঙের বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়। নাতিকে তাড়াতাড়ি কাছে টেনে এনে বলল :

'লোকগুলোকে তেমন ভাল ঠেকছে না : চল্ দাদু, ভিতরে গিয়ে গেট্টায় হুড়কো লাগিয়ে দি।'

কিন্তু ফেরার আগেই ঐ জনসমুদ্র থেকে কে যেন ওকে ডেকে বলল :

'দাদা না? তাইতো দাদাই যে!'

ওয়াং ডাক শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখে—ভাই, কাকার ছেলে। অন্যদের মতই ধূসর রংএর ইউনিফরম্ পরা, আপাদমস্তক ধূলোয় ভরা। কিন্তু ওর মুখটা যেন আরো ক্রুর, আরো ভীষণ; চীৎকার ক'রে হেসে সঙ্গীদের বল্‌ল সে :

'ওহে বন্ধুগণ এসো হে আজ আমার বড়লোক ভাইয়ের বাড়ীই অতিথি হওয়া যাক।'

ওয়াং ভয়ে একদম কাঠ হ'য়ে গেছে। কিন্তু অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করেই তারা ওর পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে! ও শুধু স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। নর্দমার ময়লা জলের প্রবাহের মত এরা আঙ্গিনা, ঘর, বাগান, যত কোণ, যত ফাটল সব, যত আনাচ্ কানাচ্ প্লাবিত ক'রে দেয়। যথেচ্ছভাবে মেজের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দেয়, চৌবাচ্চায় হাত ডুবিয়ে জল খায়, কারুকার্য করা টেবিলগুলির গায়ে ছোরা ধার দেয়, এখানে সেখানে থুথু ফেলে, বীভৎস চীৎকারে আবহাওয়া ঘোলাটে, পঙ্কিল ক'রে তোলে।

ওয়াং চোখে অন্ধকার দেখে। নাতিকে নিয়ে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বড় ছেলের মহলে গিয়ে উপস্থিত হয়। নাং এন্ তার ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছিল। বাবাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর সব শুনে করুণ আর্তনাদের স্বর বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ও বাইরে চলে এল। পিতৃব্যকে আদর ক'রে ঘরে তুলবে না অভিশাপ দেবে তা বুঝতে পারে না। পেছন ফিরে বাবার দিকে তাকিয়ে ভীত করুণ ভাবে বলে : 'ওঃ সবার হাতেই যে ছুরি রয়েছে দেখছি।' তারপর নিজেকে সংযত ক'রে অত্যন্ত সৌজন্যের সুরে বলে :

'কে, কাকা? এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়ল? এস এস, এ'তো তোমারই ঘর বাড়ী।'

কাকা অসম্ভব রকম মুখব্যাদন ক'রে সব কটি দাঁত বের ক'রে হেসে বলল : 'ক'জন অতিথিও আছে হে সঙ্গে।'

'বেশতো এতো সৌভাগ্য। তোমরা এস বিশ্রাম কর সব ততক্ষণ, আমি রান্না করতে বলিগে, না খেয়ে কেউ যেন যান না, দেখো কাকা।'

দাঁত বের ক'রে কাকা উত্তর করে :

'তাড়াতাড়ি নেই কিছু, বাবাজী। আমরা দুটো দিন একটু জিরুব বলেই এসেছি! তাই বা কেন, কি বলোহে সব—ডাক যতদিন না পড়ে এখানেই থাকা যাক্, আর বার বার নড়াচড়া ক'রে কি হবে?'

এই কথা শুনে ওয়াং আর নাংএর মনের মধ্যে প্রলয়ের ঝড় ওঠে। ভাব গোপন ক'রে, যতটু পারল নিষ্প্রাণ হাসি মুখে টেনে এনে বলল :

'খুব ভালো কথা—আমাদের পরম সৌভাগ্য—'

নাং এমনি ভাব দেখাল যেন ওদের আপ্যায়নের জন্য সে বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, সুতরাং তার ব্যবস্থা ক'রতে এক্ষুণি তাকে যেতে হবে। বাপকে টেনে নিয়ে সে গিয়ে অন্দরমহলে খিল এঁটে দিল। দু'জনে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে—কি করা যায় ভেবে উঠতে পারে না, সব গুলিয়ে গেছে।

মেজ ছুটতে ছুটতে এসে দরজায় ধাক্কা মারে। দরজা খুলে দিতে ও হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল :

'আমি তোমাদের বলতে এলাম, কিছু ব'লো না যেন রাক্ষসগুলোকে। বাবা, চারদিক ভরে ফেলেছে একেবারে। আমাদের ওখানকার একজন কেরাণী, বুঝেছ, আমরা একসাথেই কাজ করি—হুড়মুড় ক'রে একদল সৈন্য ঢুকে পড়ল ওর বাড়ী, যে ঘরে ওর রোগা বউটা শুয়ে ছিল সেই ঘরে। একটু প্রতিবাদ করাতে একখানা ছোরা এমন ভাবে ওর বুকে এপিঠ ওপিঠ ফুঁড়ে দিল যেন শরীরটা এক ডেলা মাখা। কিছু ব'লোনা, কিছু ব'লোনা, যা খুসী করুক। ঠাকুরের কাছে মানত কর শিগ্‌গিরই যেন আপদগুলো বিদেয় হয়।'

তিনজনের সব চাইতে বড় ভাবনা হ'ল এই উচ্ছৃঙ্খল, বুভুক্ষিত জানোয়ার-গুলোর লালসার আগুন হ'তে বাড়ীর মেয়েদের বাঁচাবে কেমন ক'রে। নাং এন্‌এর তার সুন্দরী তন্বী স্ত্রীর জন্য সবচেয়ে বেশী ভয়। সে ব্যবস্থা দিল : 'সব চাইতে ভেতরের মহলে মেয়েদের রাখা যাক্। সামনের দরজা বন্ধ, খিড়কীর দরজা খোলা থাকবে। দিনরাত কড়া পাহাড়া দিতে হবে।'

তাই হ'ল। মেয়েদের আর ছোটদের নিয়ে রাখা হ'ল কমলের মহলে।

নাং এন্ আর ওয়াং দিন-রাত কড়া চোখ রাখে। নাং এন্ এসে মাঝে মাঝে দেখে যায়। আর সব যেমন তেমন, কিন্তু ওয়াঙের ভাই আপনার লোক, সর্বত্র তার অবাধ গতি। তাকে ঠেকানো যাবে কি ক'রে? যখন তখন সে এসে দরজায় ধাক্কা দেবে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঢুকে পড়বে। হাতে ছোরাখানা খোলাই থাকে। নাং এন্ ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ। মুখে রাজ্যের তিক্ততা, কিছু বলতে সাহস নেই, চোখের সামনে ছোরাটা ঝলমল করে যে। পিতৃব্য সব কিছু ভাল ক'রে দেখে, প্রত্যেক মেয়ের রূপের তারিফ করে।

একদিন বড় বৌএর দিকে তাকিয়ে কুৎসিৎ অট্টহাসি হেসে বলল: 'বাবাজীর পছন্দটি বেশ মিহি। দিব্যি সহুরে ফুলটি—ফুলের কুঁড়ির মত ছোট ছোট পা দুখানি বেশ মানিয়েছে।' মেজ বৌএর মোটা-সোটা চওড়া গড়ন। রংটা লাল। অবশ্য দেখতে মন্দ নয়। তাকে দেখে বলল: 'বাঃ বেড়ে লাল মূলোটি তো।' কুৎসিৎ রসিকতা শুনে বড় বৌ যেন লজ্জায় মরে গিয়ে ঐ নোংরা দৃষ্টির সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু মেজ বৌ তার স্থূল দেহের কাঠামোর ভেতরকার স্থূল সাদাসিদে মনটি দিয়ে রসিকতা উপভোগ করে। জামার হাতে মুখ লুকিয়ে সে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল: 'লাল মূলো পছন্দ করে এমন লোকও আছে তো দেখি।' প্রশ্রয় পেয়ে শ্রীমান মেজ বৌর হাত ধরতে এগিয়ে এল। বলল: 'আমি তো করি।'

এই লোকটার সঙ্গে কথা বলার সম্পর্কও মেজ বৌএর নয়। অথচ সেই স্থলে এতখানি বেহায়াপনা দেখে নাং এন্ লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। বিশেষ ক'রে স্ত্রীর সামনে। সহরের মেয়ে—তা ছাড়া এদের চাইতে ঢের বেশী ভদ্র আবেষ্টণে এবং ভদ্র ভাবে মানুষ হয়েছে। এরকম রীতিবিরোধী ও নির্লজ্জ আচরণ তার রুচিতে বাধে। নাং এন্ বার বার স্ত্রীর দিকে চেয়ে তার চোখ মুখের ভাব দেখে। নাং এন্‌এর কাকার চোখ এড়ায় না—ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রী-ভীতি চোখে পড়ে যায়। বলে: 'এরকম পাথুরে ঠাণ্ডা মাছের চাইতে আমার লাল মূলোই ভাল দেখছি।'

এই রসিকতায় বড বৌ সাম্রাজ্ঞীর মত মর্যাদায় মাথা তুলে উঠে চলে গেল।

এমনি ক'রে কমলের সঙ্গেও ঠাট্টা ইয়ার্কি ক'রে সে চারিদিক দেখে বেড়ায়। নাং এন্ কিছু বলতে পারে না। নিস্ফল ক্রোধে ও অন্তরে গুমরে মরে। একদিন মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে এল সুযোগ্য ছেলে।

ওয়াং সঙ্গে এল। মা বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ছেলের সাধ্য নেই সে ঘুম ভাঙায়। কিন্তু বন্দুকের বাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে সে ঘুম ভাঙিয়ে ছাড়ল। চোখ খুলে বিকারগ্রস্তের মত বৃদ্ধা অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। এ কি স্বপ্ন দেখছে সে? ছেলে অসহিষ্ণু হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: 'বাঃ বেশ আছ, এতদিন পরে আমি এলাম, আর তুমি নাক ডাকাচ্ছ।'

বৃদ্ধা বিছানা থেকে একটু উঠে তেমনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে পরম বিস্ময়ে বলে: 'ওরে বাছা, আমার বাপধন, এলি তুই?'

অনেকক্ষণ ধরে পলকহীন দৃষ্টিতে সে পুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘকাল পরে ঘর-ফেরা পুত্রকে সে কি দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রবে, বৃদ্ধা ভেবে পায় না। তাড়াতাড়ি আফিংএর পাইপটা এগিয়ে দেয়, যেন ওর দুনিয়ায় এর চাইতে ভালো আর নেই কিছু। পরিচারিকাকে হুকুম করে:

'দে দে ওকে সেজে দে শিগগির।'

ছেলে অবাক হয়ে বারণ করে। ওয়াঙের ভয় করতে লাগল যদি ভায়া বলেই বসে এমন ক'রে নেশা করিয়ে তার মার রক্ত মাংস শুষে নেওয়া হয়েছে কেন? তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের সুরে বলল: 'কি আফিংটাই টানে খুড়ী রোজ। কত বলি, কিন্তু একছিঁটেও কমাবে না। টাকা কি কম যায়। রোজ মুঠো মুঠো টাকা। না দিলে ভয়ানক রেগে যায়। এ বয়সে চটাতেও সাহস করি না—' বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখটা পড়ে নেয় কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা সে কোনও উত্তর না দিয়ে মায়ের ক্ষীণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। বৃদ্ধা আবার ঘুমে ঢলে পড়ল—সেও হাতের বন্দুকটা লাঠির মত ক'রে ঠক্ ঠক্ ক'রে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল।

ওয়াং লাংএর সুন্দর সাজানো বাড়ীখানায় যেন প্রলয় লাগল। এই যুদ্ধ-ফেরৎ মানুষগুলো স্বভাবের বন্যতায় গাছপাতা ছিঁড়ে ভেঙে, ভারী বুটের আঘাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা আসবাবপত্র ভেঙে চুরে একেবারে নয় ছয় ক'রে দিল। রঙীন-মাছ-জিয়োন জলাধারগুলো যে লজ্জাস্কর ভাবে নোংরা করলো তা পশুর স্বভাবেই সাজে; ফলে, মাছগুলোর খেলা ফুরিয়ে গেল অসময়ে—সাদা ফুলো পেট উল্টো দিকে ক'রে তারা পচে ভেসে উঠল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওয়াঙের ভয় ওই আত্মীয়টিকেই সব চেয়ে বেশী। পরিচারিকা মহলে ও লোকটার আনাগোনা ইয়ার্কি অত্যন্ত চোখে ঠেকার মত। ওয়াং আর তার ছেলেরা উপায় খুঁজে পায় না। কেবল অসহায় ভাবে এ ওর মুখ চায়। ভয়ে দুশ্চিন্তায় ওদের চোখ বসে গেছে—চোখের কোলে পড়েছে কালি। রাতে ঘুম নেই।

একদিন কোকিলা পথ দেখিয়ে দিলে :

'এক কাজ কর, একটা দাসীকে দিয়ে দাও ওকে। যতদিন থাকে ওটাকে নিয়েই পড়ে থাকবে'খন। নইলে হয়ত ওর পাত্রাপাত্র জ্ঞানও থাকবে না।

ওয়াং যেন আঁধারে হঠাৎ আলো দেখতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে : 'ঠিক ঠিক ঠিক বলেছ।' ওয়াং মরীয়া হ'য়ে উঠেছে, এত ভয় এত উদ্বেগ নিয়ে ও দিন কাটাতে আর পারছে না। এক মুহূর্তও না। কোকিলাকে বলে দেয় তক্ষুণি যেন শ্রীমানকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসে দাসীদের মধ্যে কাকে সে চায়—সবাইকেই তো সে দেখেছে।

কোকিলা ফিরে এসে জানায় : 'কমলের কাছে থাকে যে ছোট কৃশ মেয়েটি, তাকেই তার চাই।'

সেই দুর্ভিক্ষের বছর ওয়াং এই মেয়েটিকে কিনেছিল। তখন এই এতটুকু ছিল। অনাহার-ক্লিষ্ট, অস্থিসার এই এক মুঠো শরীর ছিল। মুখখানা ছিল বিষাদে ভরা—চোখে জল আসতো দেখে। মেয়েটা সকলেরই আদরের। কমল আদর ক'রে নাম দিয়েছে—যুঁই। শক্ত পরিশ্রমের কাজ একে ক'রতে দেয় না কমল ; কোকিলাকে একটু আধটু সাহায্য করে, আর কমলের এটা ওটা এগিয়ে দেয়, চা-ঢেলে দেয়, পাইপ ভরে দেয়—এমনি ধারা কাজ।

কমলের চা ঢালছিল যুঁই। ওর সামনেই এসে কোকিলা বসল। যুঁইয়ের হাত থেকে চা-দানী পড়ে চুরমার হয়ে গেল, চা গেল গড়িয়ে ; চীৎকার ক'রে কমলের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে, মেজেতে মাথা কুটে, কুটে আকুল হয়ে কেঁদে কাকুতি মিনতি ক'রতে লাগল : 'মা, মা, বাঁচাও আমায়, আমাকে অমন ক'রে ভাসিও না।'

কমল বিরক্ত হয়ে উঠল : 'আ মলো যা! যতসব ন্যাকামো! ও কি তোকে খেয়ে ফেলবে? পুরুষ মানুষ তো আর বাঘ না! ঢং দেখ না!'

কোকিলার দিকে ফিরে বলল: 'জোর ক'রে নিয়ে যা ছুঁড়ীকে। দিয়ে আয়গে।'

যুঁই হাত জোড় ক'রে আকুল মিনতি করে। কান্নায় আলোড়িত হয়ে ওঠে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ছোট দেহটুকু ভয়ে ঝড়ের মার-খাওয়া বেতসপত্রের মত কাঁপে। প্রত্যেকের মুখের দিকে করুণ আবেদন-ভরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চায়।

কমলের কথার ওপর কথা বলার সাহস এ বাড়ীতে কারো নেই—ছেলেদেরও না, বউদেরও না। ওয়াঙের ছোট ছেলে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কমলের দিকে তাকিয়ে—ওর চোখের পলক যেন আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেছে। হাত দু'টো অব্যক্ত বেদনায় মুঠো হয়ে বুকের ওপর চেপে বসে, বুঝি ভেতরের উন্মথিত বেদনা-পারাবারকে দু'হাতে চাপা দিতে চায়। ভৃত্য, পরিচারিকা, শিশুর দল যারা ওখানে ছিল—কারো মুখে কথা নাই। ভয়-বিহ্বলা যুঁইয়ের চাপা কান্নার গুমরানী ছাড়া আর কোনো শব্দও নাই

ওয়াঙের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। ওর স্বভাব-কোমল মন দুলে ওঠে। এদিকে কমলকে রাগাবারও সাহস নেই। একটু দ্বিধার দৃষ্টিতে যুঁইয়ের দিকে তাকায়। যুঁই যেন ওয়াঙের মুখেই তার বুকখানা প'ড়ে নিল; ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ে দু'হাতে ওয়াঙের পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে মাথা কুটতে লাগল। ওয়াং দৃষ্টি নত ক'রে একবার ভূলুণ্ঠিতাকে দেখল। ঐ তো একটুখানি শরীর। কি ভয়ানক কাঁপছে। ওর চোখের সামনে জেগে উঠল ওর ভাইয়ের মূর্তি। চোয়াড়ে, ষণ্ডামার্কা চেহারা। যৌবন পেরিয়ে গেছে কবে। সমস্ত ব্যাপারটা ওর ভারী নোংরা, কুৎসিৎ মনে হয়। ওয়াং কোকিলাকে ডেকে মৃদুস্বরে বলে:

'জোর জবরদস্তি ক'রে লাভ নেই কোকিলা।'

কমলের কাণ এড়ায় না। খন্ খন্ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে:

'ঢং দেখে আর বাঁচিনে। উনি যেন চিরকাল কচি খুকীটি থাকবেন। সব মেয়েরই একদিন ঐ ঘাটের জল খেতে হবে: তার জন্য অত কান্না, অত আদিখ্যেতা কেন বা? নে ওঠ্—কথার অবাধ্য হোস্‌নে বলছি।'

ওয়াং স্বরে প্রশ্রয় মিশিয়ে কমলকে বলে:

'আহাহা, যেতে দাও না। দেখাই যাক না একবার চেষ্টা ক'রে কি করা যায়। তারপর না হয় যা খুসী ক'রো।'

অনেক দিন থেকেই একটা নূতন বিলিতী ঘড়ি আর একটা চুণীর

আংটির সখ কমলের ছিল। কথাটা মনে পড়ায় যুঁইয়ের ব্যাপার নিয়ে আর জেদ ক'রল না। চুপ ক'রে গেল। ওয়াং কোকিলাকে বলল :

'যাওতো ভায়াকে ব'লে এসোগে, টুক্‌টুকেটি দেখে তো ভায়ার মাকাল ফলের উপর চোখ পড়ল। ছুঁড়ির ভেতরে যে খারাপ রোগ রয়েছে। সুতরাং কি ক'রবে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো। এ ছুঁড়িকে না হ'লে যদি তার নাই চলে, বেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর নয়তো বলুক—মেয়ের অভাব কি, কতো রয়েছে।'

ব'লে সামনের দাসীদের দিকে তাকায়। ওয়াঙের চোখে চোখ পড়তেই ওরা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে মুখ ফেরায়। যেন কত লজ্জা পেয়েছে। একজন কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে, বলিষ্ঠ নিটোল গড়ন—হাসতে হাসতে বলে :

'আমায়ই পাঠিয়ে দাও না কর্তা। কি হয়েছে, গিলেতো আর ফেলবে না।'

ওয়াং যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কোকিলা ওকে নিয়ে চলে যায়। যুঁই তবু ওয়াঙের পায় লুটিয়ে পড়ে থাকে। কান্না থেমে গেছে—যেন ঝড়ের পর নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ সাগরের বুক। কিন্তু এদিকে কাণ পেতে রয়েছে যুঁই আবার কিছু যদি হয়। কমলের রাগ পড়েনি। একটিও কথা না ব'লে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওয়াং ধীরে ধীরে যুঁইকে ধরে তোলে। যুঁই উঠে দাঁড়ায়—পাণ্ডুর, মূর্ছিত যুঁই ফুলটিরই মত ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে। ওয়াং দেখল রক্তহীন ভীত মুখ খানায় যেন বিশ্বের কমনীয়তা বাসা বেঁধে আছে। ছোট দু'খানি লাল করুণ ঠোঁট। মায়া হয়।

স্নেহভরা কণ্ঠে ওয়াং বলে :

'দেখ বাছা, কদিন গিন্নীর চোখের একটু আড়ালে থেকো। রাগটা পড়ুক। আর ভায়ার চোখের সামনে পড়ো না যেন—সাবধান। দেখলে বলা যায় না—হয়ত' আবার তোমায় নিয়ে টানা হ্যাঁচ্‌ড়া ক'রবে।'

যুঁই চোখ তুলে আবেগ-ভরা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে নীরবে ছায়ার মত ধীরে ধীরে সরে গেল!

মাস দেড়েক পরে যুদ্ধের ডাক এল। হাওয়ার মুখে শুক্‌নো পাতার মত নিমেষে সৈন্যের দলকে নিয়ে গেল উড়িয়ে। পেছনে প'ড়ে রইল শুধুই ধ্বংস, অনাসৃষ্টি আর ক্লেদ আর সেই দাসীর গর্ভে ওয়াঙের ভাইয়ের কামনার ফল।

কোমরে ছোরা গুঁজে রাইফেল কাঁধে ফেলে যাবার সময় সে রসিকতা ক'রে ব'লে গেল :

'কে জানে আর হয়ত ফিরব না। মাকে বলো নাতি রেখে গেলাম তার জন্ম।' আরো দু একটা কুৎসিৎ পরিহাস ক'রে সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

বত্রিশ

সৈন্যেরা আসাতে একটা উপকার হ'ল। ওরা চলে যাওয়ার পর ওয়াং ও তার দুই ছেলের মধ্যে অন্ততঃ একটা বিষয়ে একতা দেখা গেল। তিনজনে মিলে এই বর্বর মানুষগুলির সমস্ত অনাচারের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলতে উঠে পড়ে লেগে যায়। ভৃত্যদের লাগিয়ে দেয় আঙ্গিনার আবর্জনা পরিষ্কার ক'রতে। মিস্ত্রী লাগে আসবাবগুলোর নষ্ট শিল্পের উদ্ধারে। ঘরে দরজায় ওদের তাণ্ডবের যত চিহ্ন পড়েছিল, রাজমিস্ত্রী লাগে সে সবের সংস্কারে। জলাধারের জল বের ক'রে ফেলে নূতন জল ভরা হয়। নাং এন নূতন ক'রে রংবেরংএর মাছ কিনে আনে। আবার নূতন ক'রে ফুল ফলের গাছ লাগায়। ভাঙ্গা ডাল, ছেঁড়া পাতা নিয়ে আধখানা হ'য়ে তখনও যে গাছগুলো দাঁড়িয়েছিল, ছেঁটে ছেঁটে তাদের শ্রী ফেরান হয়। একবছরের মধ্যে পুরানো বিশ্রী ইতিহাসটা চাপা পড়ে' আবার সব যেমনকার তেমন হ'য়ে ওঠে। ছেলেরা সব নিজ নিজ মহলে ফিরে যায়।

পিতৃব্য-পুত্রের প্রসাদ-গর্বিতা সেই দাসীটি ওয়াঙের নির্দেশে ওর খুড়ীর পরিচর্যার ভার পেল। বৃদ্ধার মৃত্যু পর্যন্ত তার সেবা করার এবং মৃত্যুর পরে তার শেষ ক্রিয়া করার অধিকারও ওয়াং একেই দিল। ওয়াং ভয়ে ভয়ে ছিল, এই মেয়েটার গর্ভে ছেলে হ'লেই সর্বনাশ। এদের পরিবারে আধা স্থানের দাবী তার থাকবে। ভাগ্য ভাল—হ'ল মেয়ে। দাসীর মেয়ে—দাসীর চাইতে বেশী ভাগ্যের অধিকার তার নেই; আর মেয়ের মায়ের স্থানও মেয়ের মা হবার অগৌরবে যথা-পূর্বং থাকলে বলার কিছু নাই।

কিন্তু ওয়াং অন্যায় বিচার করল না। ব্যবস্থা ক'রে দিল খুড়ীর মৃত্যুর পর, মেয়েটা—অবশ্য যদি সে চায়—ওই মহলেই থাকতে পারবে। টাকাও দিল কিছু। দাসী ওই থাকার ব্যবস্থায়ই আশাতীত খুসী হ'য়েছিল। আবার টাকার কথায় ওয়াঙকে বলল :

'টাকাটা এখন রেখে দিন। যদি পারেন--কিষাণ তো আপনার মেলাই আছে তাদের মধ্যে গরীব গরবা দেখে কারো সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন—নইলে আমি একা থাকতে পারব না। ঐ টাকাটা বিয়ের সময় যৌতুক দেবেন। ভগবান আপনার ভালো করবেন।'

এ আর তেমন কি কঠিন কাজ। ওয়াং কথা দিলে—তাই হবে, ওকে বিয়েই দিয়ে দেবে। গরীব হোক যাই হোক, কারো ঘরে যাতে মেয়েটার একটু ঠাঁই হয়, ওয়াং সে চেষ্টা ক'রবে। ওর চোখের সামনে থেকে প্রায় ভুলে-যাওয়া অতীতের একখানি পরদা সরে গেল। ওয়াংও তো একদিন দরিদ্র ছিল। একদিন এইখানে, এই গৃহে সে এসে দাঁড়িয়েছিল তার জীবনের সঙ্গিনীকে যাচ্ঞা করতে। এত বছর—ওর আয়ুষ্কালের প্রায় অর্ধেক হবে—ওলান্এর কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে ও কাটিয়ে দিল। আজ ওলান্এর কথা মনে পড়ে যায়। কেমন যেন মনটা ভারী হ'য়ে আসে। ঠিক দুঃখ নয়—বেদনাও নয়। কত দিনের কথা—যেন কোন্ যুগের। স্মৃতিটি অবধি যেন পুরানো হ'য়ে মরচে ধরে গেছে—স্মৃতিতেও যেন বেদনা নেই। কেবল ক্ষণিকের একটু বিষাদ। আর স্মৃতিটি নাড়া পড়ে তলানি পড়া পুরানো সুখ দুঃখের কাহিনী ওপরে ভেসে ওঠায় একটু সাময়িক অন্ধকার মাত্র।

ধরা ধরা স্বরে দাসীকে ওয়াং বলে :

'দুটো দিন একটু সবুর কর্ মা, বুড়ীর তো হ'য়ে এল, তারপর তোর ব্যবস্থা করছি।

একদিন সকালে দাসী এসে খবর দিয়ে গেল—ওয়াঙের খুড়ী সেই যে রাতে ঘুমিয়েছে, সে ঘুম আর ভাঙেনি। মৃতদেহ সে কফিনে পুরে রেখেছে। তাইতো! এখন তো ওয়াঙের প্রতিজ্ঞা রাখতে হয়। কিন্তু কোথায় পাত্র। মনে প'ড়ে যায় সেই ভালো মানুষ গোছের দাঁত উঁচু ছেলেটির কথা যাকে কাজ দেখাতে গিয়েই চিং মরল। তা সে হতভাগার দোষ কি? ইচ্ছে ক'রে মারেনি তো। আহা বেচারা নির্দোষী। মিছেই মারটা খেল সেদিন। এ ছাড়া আর কৈ—কারো কথা মনে পড়ল না ওয়াঙের!

ওকেই পাত্র ঠিক ক'রে ওয়াং ডেকে পাঠায়। আজ ওর কি যেন খেয়াল হ'ল—হলে গিয়ে মঞ্চের ওপর বসে দুজনকে সামনে দাঁড়াতে আদেশ করে। তারপর বলে—ধীরে, অতি ধীরে—যেন স্বল্পায়ু রোমাঞ্চকর মুহূর্তটির ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশও বৃথা না যায়। মুহূর্তটিকে যেন ওয়াং আঁকড়ে ধ'রে থাকতে

চায়। ধীরে ধীরে এই দুর্লভ ক্ষণটির সবখানি রস পান ক'রে ক'রে ওয়াং বলে :

'দেখে নাও ভালো ক'রে—পছন্দ হয় কিনা। চাওতো একে বিয়ে ক'রতে পার। আমার ভাই ছাড়া আর কারো হাত পড়েনি ওর ওপর।'

চাওতো! চাইবে না কি? এ যে অযাচিত, আশাতীত করুণা। কৃতজ্ঞতায় নুয়ে বেচারা কৃষাণ এই দয়ার দান মাথায় তুলে নেয়। ওর মত দীন দরিদ্রের বিয়ে কি কপালে জুট্‌তো কোনো কালে? তারপর এমন মেয়ে—অমন শক্ত সমর্থ শরীর—অমন সাদা মন!

ওয়াং মঞ্চ থেকে নেমে আসে। আজ যেন ওর সব কাজ সারা হ'য়ে গেল। জীবনে ওর যা কিছু রচনার ছিল, যা কিছু সৃষ্টির, যা কিছু যাচ্‌ঞার ছিল, আজ ওর সব পাত্র ভ'রে উঠলো। ও সব পেয়েছে—যা চেয়েছিল তার বেশী পেয়েছে। এ সার্থকতা এমনি ক'রে ওকে এসে ধরা দেবে তা কি ও স্বপ্নেও ভেবেছিল? এ অসম্ভব কি ক'রে সম্ভব হলো? কোথা দিয়ে হ'ল টেরও পেল না ওয়াং।

সব তো হ'য়েছে,—এবার ওর ছুটি—আরাম—শান্তি। এবারে নিরালায় বসে বসে পরম সুখে ঝিমোবার অবসর পাবে ওয়াং। পঁয়ষট্টির কোঠায় বয়স এল—ছুটি নেবার সময় হয়েছে বৈকি। ছেলেরা যোগ্য—তাদের ছেলেতে মেয়েতে ঘর ভরলো, দিন দিন শশী-কলার মত বাড়ছে তারা।

আর কি কাজ বাকি আছে ওয়াঙের? এক ছোটর বিয়ে। শিগ্‌গির সেরে ফেলবে। তারপর? তারপর শান্তি—আরাম, বিশ্রাম।

কিন্তু শান্তি ওয়াঙের ভাগ্যে নেই। কোন্ মৌমাছির ঝাঁকের মত সৈন্যদল এসেছিল। তারা চলে গেল, কিন্তু হুলের কাঁটা রেখে গেল।

যতদিন আলাদা মহলে ছিল—দুই বউএর মধ্যে অত্যন্ত সৌজন্যের পালিশটুকু বজায় ছিল। কিন্তু এখন এক জাগায় থেকে সংঘর্ষ আর বাধা মানল না। বিবাদ বাধল নয়, অষ্টপ্রহর লেগে রইল। কারণ বড়ো কিছু নয়—মেয়েলী বিবাদ। বেশীর ভাগই উপলক্ষ ছেলে-মেয়েরা। ছোট শিশুরা বোঝে না মায়েদের এই বিবাদ-কলহ। খেলার আনন্দে তারা মেতে ওঠে, আবার কুকুর বেড়ালের মত ঝগড়া মারামারিও করে। ওদের হাসি কান্নার বাল্য-লীলার মাঝে এসে দাঁড়াল মায়েরা—কোমর এঁটে, মুখ শানিয়ে। কোঁদল চলে কেন ওর ছেলে এর ছেলেকে মারলো! এর ছেলের একতিলও দোষ

নেই, সব দোষ ওর ছেলের। এ মা সে মার ছেলেকে ধ'রে ঠ্যাঙায়, সে মা এ মার ছেলেকে ঠেঙ্গায়। প্রায় মুখ দেখা বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

তারপর সেই যে ওয়াঙের যোদ্ধা ভাই নাগরিকা বড় বৌকে ফেলে মেজবৌএর তারিফ ক'রেছিল—মেজন্য সে অপরাধ বড় বৌ ক্ষমা ক'রতে পারেনি। মেজ বৌকে দেখলেই সে নাক সিটকোয়, আর ভ্রূ কোঁচকায়।

একদিন সকলকে শুনিয়ে বড় বেৌ বলল : 'যে বৌ পুরুষের সাথে অমন বেহায়ার মত ঢলাঢলি ক'রতে পারে, তাকে নিয়ে ঘর করায় বিপদ আছে।'

মেজ বৌ পেছনে পড়ে থাকেন না, তিনিও শুনিয়ে দিলেন :

'আমায় একজন একটু ভাল দেখতে বলেছে বলে দিদির হিংসা হয়েছে।'

এর পরের পালা—ক্রুদ্ধ দৃষ্টির বিনিময় আর মনের মধ্যে আরো তিক্ত বিদ্বেষের বিষ জলে ওঠা। বড় বৌ নাগরিকা—মার্জিতরুচি আর আচরণ নিক্তিতে ওজন করা, এতটুকু ভুলচুক নেই, কাজেই তার তরফের সংগ্রাম নিঃশব্দে। তার ক্রোধের প্রকাশ মেজ বৌকে নীরব উপেক্ষায়। তবে ছেলেরা গ্রাম্য মেজ বৌএর মহলে গেলে তিনি সরবেই তাদের শাসন করেন : 'ফের গেছিস্ ঐ ছোটলোকগুলোর সঙ্গে মিশতে! তোরাও অমনি অসভ্য হয়ে উঠবি সব!'

মেজ বৌকে শুনিয়েই বলে। মেজ বৌও তার ছেলেদের উচ্চকণ্ঠে শাসন করে : 'এই হতভাগারা, মরবার আর জায়গা পেলি না তোরা। সাপের সঙ্গে গেছিস্ খেলতে, দেখিস্ ছোবল যদি না মেরেছে!'

দুই জায়ের এই পরস্পর বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়ে চলে, দু'ভাইয়ের অসম্প্রীতি এ আগুনের ইন্ধন যোগায়। বড় ভাইএর চেষ্টা—সহুরে পত্নীর কাছে তার বংশ-মর্যাদা কোথাও যেন না ক্ষুণ্ণ হয়। মেজ সতর্ক—চাল দেখাতে গিয়ে ভাগ হবার আগেই সম্পত্তি দাদার আঙুলের ফাঁক দিয়ে না গলে যায়। জমিদারীর লেন দেন এখনও বাবাই করে, কিন্তু সব যায় আসে মেজ'র হাত দিয়ে, কাজেই আয়ব্যয়ের চুল-চেরা হিসেব তার নখাগ্রে। বড়র লজ্জা ঐখানে—বড় হয়েও শিশুর মত বাবার কাছে এটা সেটার জন্য হাত পাততে হয়। সুতরাং নারীজগতের ধূমায়িত কলহ পুরুষমহলেও ব্যাপ্ত হবার অবারিত পথ পায়। দুইমহল ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত গর্জায়। কোথায় ওয়াঙের বহুপ্রার্থিত শান্তি! চৌচির হ'য়ে ভেঙ্গে পড়েছে শান্তির ইমারত। অসহায় বৃদ্ধ নিষ্ফল বেদনায় নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

যুঁইকে নিয়ে সেদিনের ঘটনার পর থেকে ওয়াঙের নিজের মনেও অশান্তি চলছিল। মেয়েটার ত্রাণকর্তা হিসেবে ওয়াঙের গিয়ে দাঁড়ানোটা কমলের মনঃপুত হয়নি। কাজেই ওয়াং তার প্রসন্নতা এবং নিরপরাধ মেয়েটা তার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হ'ল। কিন্তু মেয়েটা নীরবে প্রভুপত্নীর সেবা ক'রে যায়, সারাদিন কাছে কাছে থাকে, পাইপ ভরে দেয়—সব হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। কোনো কাজে কমলের আদেশের অপেক্ষা রাখে না। রাতে কমলের ঘুম হয় না—বিছানায় প'ড়ে এপাশ ওপাশ করে। যুঁই সারা রাত জেগে বসে ওর হাত পা টিপে দেয়—ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু কমল তবুও প্রসন্ন হয় না।

ওর ওপর কমলের ঈর্ষা। ওয়াং ঘরে এলেই নানা অছিলায় যুঁইকে ঘর থেকে সরিয়ে দেয়। অমুদার কুৎসিৎ ইঙ্গিতে ওয়াঙকে বিব্রত ক'রে তোলে। ওয়াং এতদিন যুঁইএর কথা বিশেষ ভাবেনি। অসহায়া এক ফোঁটা মেয়েটার সেদিনকার ভয় পাওয়ার কথাটাই মনে ছিল।

ওর বোবা মেয়েটার মতই ভীরু অসহায়া মেয়েটার ওপর ওয়াঙের ছিল একটু করুণা মেশান বাৎসল্য। তেমন ভালো ক'রে ও যুঁইকে এতদিন দেখেনি। কমলের অভিযোগে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখার কথা মনে হয়। সত্যিতো বড় সুন্দর, লাবণ্য-পারাবার মুখখানা—যুঁই ফুলের মতই ওর মুখের স্নিগ্ধ ম্লানিমাটুকু।

বৃদ্ধ ওয়াঙের দশ বারো বছরের ঘুমিয়ে-পড়া রক্ত কি যেন একটা বিচিত্র চেতনায় জেগে ওঠে।

কিন্তু বলে: 'কি যে ছাইভস্ম বলছ ঠিক নেই। আমি কি এখনও যুবোটি আছি নাকি? মহারাণীর দরবারেই বা বান্দা ক'দিন হাজির হয়?'

এই নজিরে যে মুহূর্তে কমলের সন্দেহ উড়িয়ে দেয়—সেইক্ষণেই ওর অপাঙ্গ দৃষ্টির পথে যুঁইএর মুকুলিত রূপশ্রী রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

অন্যদিকে যতই কাঁচা হোক কমল পুরুষদের চেনে। সে জানে নির্বাণের মুখে এসে প্রদীপ যেমন শেষবারের মত দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে, তেমন ক'রে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে পুরুষ আকস্মিক একটা সংক্ষিপ্ত যৌবনে জেগে ওঠে একবার। তাই যুঁইকে ওর ভয়। যত রাগ ওই যুঁইএর ওপর। রাগে ভাবে দেবে ওকে দূর ক'রে, নয়তো ওই রেস্তরাঁয় বেচে দেবে। কিন্তু কমল আরামপ্রিয়। বয়সের দরুণ কোকিলা বড় অলস হ'য়ে

পড়েছে। এখন অবলম্বন ওই য়ুঁই। য়ুঁই না হ'লে কমল চোখে অন্ধকার দেখে। আশ্চর্য ক্ষমতা মেয়েটার—কমল টের পাবার আগেই তার প্রয়োজনের খবর ও পায়। সুতরাং ওকে ছাড়া কমলের চলে না। অথচ রাখারও বিঘ্ন। সংগ্রামে অনভ্যস্ত কমল উভয় সংকটে প'ড়ে আরো উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। ওয়াং দূরে দূরে থেকে আত্মরক্ষা করে। নাইবা সামনে গেল দুদিন। দু'দিনের রাগ যাবে দু'দিন পরে। কটা দিন অপেক্ষা ক'রেই দেখা যাক্।

কিন্তু প্রতিক্ষায় এই কদিনের ফাঁক ওয়াঙের অজ্ঞাতসারেই একখানা অতি সুন্দর ম্লান মুখের চিন্তায় ভরে ওঠে।

অশান্তির ভরা পূর্ণ হবার যেটুকু বাকী ছিল—সেটুকু ক'রে দিল ছোট। নিতান্ত শান্ত, নীরব ছেলে—সারা দিন বইয়ে মুখ-গোঁজা। রোগা পট্কা বইয়ের পোকা ওই ছেলেকে কেউ বড় একটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি কোনোদিন। কাজেই ওর কথা কারো মনেও হয় না।

সৈন্যরা যখন এখানে ছিল ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত, আত্মহারা হয়ে গল্প শুনত লড়াইয়ের যত দুঃসাহসিক অভিযানের। মাষ্টার মশাইয়ের কাছেও এমনতরো সব বই চেয়ে নিয়ে পড়ত যাতে থাকত লড়াইয়ের গল্প—সিউ হ্রদের ধারে সেই সেকেলে যে ডাকাতের দল লুকিয়ে থাকত তাদের গল্প। ওই সব পড়ে পড়ে ওর মনের মধ্যে গড়ে উঠল এক কল্পনার জগৎ।

সেদিন এসে বাবাকে বলল: 'বাবা আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। যুদ্ধে নাম লেখাব। যুদ্ধ হ'চ্ছে, চলে যাব।

ওয়াং শিউরে ওঠে। এ কি সর্বনেশে খেয়াল। ভয়ে ও চীৎকার ক'রে ওঠে: 'এ সব আবার কি পাগলামী! আমায় কি একটুও শান্তিতে থাকতে দিবিনে তোরা?'

ছেলেকে বোঝায় ওয়াং, ধম্কায়, মিষ্টি কথা বলে। ছেলের প্রশস্ত কালো ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। দেখে ওয়াং বলে:

'দেখ্ বাবা, তারকাঁটা তৈরী করার জন্য আর ইস্পাত লাগে না। তোর মত ঘরের ছেলে সৈন্য হবে কোন দুঃখে বল্তো! তা ছাড়া তুই আমার ছোট ছেলে, আমার চোখের মণি। তুই কোথায় কোথায় মাঠে ঘাটে বনে-বাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াবি আর আমি বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমব কেমন ক'রে?'

কিন্তু ছেলের সংকল্প টলে না। গাঢ়-কৃষ্ণ ভ্রূ জোড়াকে কুঞ্চিত ক'রে বাবার দিকে দৃঢ়ভাবে তাকিয়ে জানিয়ে দেয় সে যাবেই।

ওয়াং আদর করে ভোলায়: 'ইস্কুলে পড়তে যাবি না, তুই? তোকে দক্ষিণের খুব বড় একটা ইস্কুলে পাঠাব ঠিক ক'রে রেখেছি। সাহেবদের ইস্কুলে যদি যেতে চাস্ তাই পাঠাব। কত নতুন জিনিস দেখবি, জানবি। আমরা সাতজন্মেও সে-সব দেখিনি। কাণেও শুনিনি। যুদ্ধে গেলে আর পড়বি কি ক'রে? তা ছাড়া বড় ঘরের ছেলে তুই—আমার অত টাকা, অত সম্পত্তি—তুই যদি আজ সেপাই হয়ে লড়ায়ে যাস তবে আমার মুখে চূন কালি পড়বে যে রে। ছিঃ বাবা, ও সব পাগলামো ছাড়্।'

ছোট নীরব। ওয়াং আবার কোমল স্বরে বলে:

'মাণিক আবার, বুড়ো বাপকে কষ্ট দিসনে। বল্‌তো কোন দুঃখে তুই লড়ায়ে যেতে চাস্!'

কালো ভ্রূজোড়ার নীচে চোখ দুটো চকিতে জ্বলে ওঠে ছোটর। বলে:

'লড়াই হবে বাবা, লড়াই হবে। এমন ভীষণ লড়াই জন্মে হয়নি। বিপ্লব হবে বুঝেছ? সব ওলট্ পালট্ হ'য়ে যাবে। আমাদের দেশ মাটি সব সব মুক্ত হবার দিন এসেছে। আমরা স্বাধীন হব।'

ওয়াং আকাশ থেকে পড়ে। অবাক্ করলে ছেলে! যত সব সৃষ্টি-ছাড়া কথা ওর।

'দেশ মাটি মুক্ত হবে বলছিস্ কি রে? ওতো মুক্তই আছে। আমার জমিগুলো তো সবই পুরো-দস্তুর আমার। কারো দখল নেই ওতে। আমি খুসীমত বরগায় দি—টাকা আসে। নইলে তোদের খাওয়া, ভালো ভালো জামা সব আসে কোত্থেকে? আমি বাপু অতশত বুঝিনে। এর চাইতে আর কি বেশী চাস্ রে?'

একটু বিরক্ত হ'য়ে ছেলে জবাব দেয়: 'তুমি সেকেলে লোক, ওসব বুঝবে না।'

ওয়াং ভাবতে বসে যায়। ছেলের মুখের দিকে চায়—কি যেন একটা গভীর বেদনা লেখা মুখে। কিসের বেদনা? কি কষ্ট ওর? সবই তো দিয়েছি! ওর প্রাণটাই তো আমার দেওয়া। জমি ছেড়ে আসতে চাইলে—দিলাম। পড়তে চাইলে—দরকার ছিল না পড়াশোনার, তাও দিলাম বন্দোবস্ত ক'রে। ভেবে কূল পায় না ওয়াং। কি চায় ও? আমার কাছ থেকেই তো ও সব পেয়েছে। আর কি দিতে পারি? কিসের দুঃখ ওর?

আরো ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ওয়াং। মাথায় তো বেড়েছে পুরো—কিন্তু তেমনি কৃশ। যৌবনের চঞ্চলতারও কোন চিহ্ন মুখে নেই। তবে! তবে কি? বুঝবার জন্ম বলে:

'তোর বিয়েটা দিয়ে ফেলছি শিগ্‌গির।'

কুঞ্চিত কালো ভ্রূর তলায় ছোটর দৃষ্টি অগ্নিশিখার মত দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে। কঠিন ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলে:

'তা হ'লে আর পাবে না আমাকে। একেবারে চলে যাব, খোঁজও পাবে না। বড়দার মত আমার সব কিছুর সমাধান ওই দিয়ে হবে, ভেবো না।'

ওয়াং বোঝে—ভুল হ'য়েছে। সুতরাং সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলে:

'না, না, তুই যদি না চাস্ তবে বিয়ে দেব কেন জোর ক'রে? তবে এই বলছিলাম কি—এই এখানে তো—হ্যাঁ যদি দাসীদের মধ্যে কাউকে—'

মুহূর্তে ছোটর দেহ ঋজু হ'য়ে উঠল। ওই ঋজু দেহ, উন্নত মস্তক, গভীর দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত মর্যাদা কিশোর বালককে অপূর্ব মহিমা দিল। হাত দুটো যুক্ত ক'রে বুকের ওপর রেখে ছোট বলে:

'সাধারণ ছেলের দলের মধ্যে আমায় ফেলো না। আমার আশা আকাঙ্ক্ষা অন্য রকম। আমার বুকের মধ্যে রয়েছে মহা-স্বপ্ন। আমি বড় হ'তে চাই, গৌরবের মধ্যে বাঁচতে চাই। স্ত্রীলোক তো সবখানেই পাওয়া যায়।'

তারপর হঠাৎ মুখের ভাব একেবারে বদলে যায়। যেন কি একটা ভুলে যাওয়া কথা এই মাত্র মনে পড়ে গেল এমনিতরো ভাব। মুহূর্ত-পূর্বের মর্যাদার মেঘস্পর্শী উচ্চতা থেকে যেন নিমেষে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসে। হাত দুটো শিথিল হ'য়ে দুই পাশে ঝুলে পড়ে। এবারে স্বাভাবিক স্বরে ছোট বলে:

'কিন্তু বাবা, তোমার দাসীগুলোকে কি বেছে বেছে কুৎসিৎ দেখে এনেছে? কি কুৎসিৎ সব ক'টা। এক তোমার অন্দর মহলে—ভেবোনা আমার লোভ রয়েছে বলে বলছি, আমি বলছি অন্দর মহলে যে ছোট কৃশ মেয়েটি কাজ করে ঐ মেয়েটি বড় সুন্দর। ওর মত অমন সুন্দর তোমার গোটা বাড়ীটায় নেই।'

ওয়াং বোঝে—যুঁই।

একটা বিজাতীয় হিংসা ওর স্নায়ুতে স্নায়ুতে জ্বলে ওঠে। নিজেকে আরো বেশী বৃদ্ধ বলে অনুভব হয়—ওয়াং বৃদ্ধ হ'য়ে গেছে, স্থবির হ'য়ে গেছে,

অনাবশ্যক লোল মাংসে ভারগ্রস্ত ওর উদর, শুভ্রায়মান কেশে বার্ধক্য অতি স্পষ্ট। আর সামনের ওই যুবক – ওরই পুত্র। এর অনুদেহের সুঠাম দীর্ঘতায় ভরা যৌবন দীপ্ত হ'য়ে জ্বলছে। ওই যুবক – ওয়াং ভুলে যায়—ওই যুবক ওর পুত্র, ও তার জনক। আজ যেন ওরা পিতাপুত্র নয়—দুটি পুরুষ মাত্র। কেবলই ওই—পুরুষ, আর কিছু না। ওয়াং ক্রোধে হিংস্র হ'য়ে ওঠে :

'পড়েছে? তোরও দাসী মহলে চোখ পড়েছে? ওসব হবে না—বলে দিচ্ছি। ভালো চাস্‌তো ওসব খেয়াল ছেড়ে দে। বড়লোকের বাড়ীর নব্য বাবুদের মত নোংরা চাল এখানে চলবে না। আমরা গেঁয়ো মানুষ—ভদ্র পরিবার—ভদ্রভাবে থাকব। ওসব চলবে না এ বাড়ীতে বুঝলি?'

ছেলে কালো ভ্রূ জোড়া কপালে তুলে বিরক্তির স্বরে বলে :

'তুমিই তো বল্লে প্রথম।' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওয়াং সেইখানেই বসে রইল টেবিলের পাসে। চারদিকে নিঝুম—ওর বড় বিশ্রী লাগে। বড় একা মনে হয়। মনটা আরো তিক্ত হ'য়ে ওঠে। যত আপদ্! এক ফোঁটা শান্তি পাবার জো নেই এ বাড়ীতে।

ক্রোধে ওর ভেতরটা যেন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে—মাথার মধ্যে কেমন সব গোলমাল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কেন? এত রাগ কেন? ওয়াং বোঝে না।

সেই কৃশ, পাণ্ডুর ম্লানমুখী মেয়েটি ওর ছেলের চোখে লেগেছে, তাকে ওর ভালো লেগেছে···

কিন্তু ওয়াঙের মন অমন ক'রে জ্বলছে কেন? বহু দাসীর মধ্যে একজন ছাড়া আর তো কিছু নয় ওই মেয়ে···তবে?

ওয়াং কোন মতে ভুলতে পারল না ছোটর চোখে যুঁইকে ভাল লেগেছে। যুঁই কাজ কর্মে আসে যায়, ওয়াং শুধু চোখ ভরে কেবল দেখে। যুঁই কখন ওর অনুভূতিতে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে গেল ওয়াং জানল না।

শীত কেটে গেছে। রাতের বাতাস উষ্ণতায় আর ফুল সুগন্ধে ঘন। ওয়াং আপন মহলে একা বসে ছিল একটা কুসুমিত 'কাসিয়া' গাছের নীচে। ওর জরা আজ সেই সুগন্ধের সাথে মিলে হাওয়ায় গেছে উড়ে। ধমণীর রক্তে যৌবনের বান ডেকে গেছে। সারাদিন ও নিজের মধ্যে পুণর্ভূ যৌবনের উদ্‌ঘোষিত বাণী শুনেছে। ওয়াঙের ইচ্ছে হচ্ছিল খালি পায়ে বেরিয়ে পড়ে মাঠে ;

থাকবে না পায়ে জুতোর বাধা, থাকবে না মোজা। ওর পরমাত্মীয় যে মাটি সেই মাটির নিটোল মমতা-ভরা স্পর্শ লাগুক ওর অনাবৃত পায়ের তলায়। কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে! এখন তো আর সেদিনকার ওয়াং চাষী নয়, এই মহানগরীতে এখন ও সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ জমিদার। সুতরাং চকল ভাবে মহলে মহলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেখানে গাছের ছায়ায় বসে কমল ধূমপান করছিল—সে ধার দিয়েও ওয়াং গেল না। সাবধানে তার চোখের বাইরে রইল, সন্ধানী চোখ নারীর—পুরুষের এমনি চঞ্চলতা সে-দৃষ্টির কাছে ধরা পড়বেই। ওয়াঙের বড় একা মনে হ'তে লাগলো। কোথায় যাবে? কলহপ্রিয়া পুত্রবধূদের কাছে মন যেতে চাইল না, আকাশ থেকে ঝরে-পড়া-আনন্দের টুকরোর মত নাতি-নাতনীদের কাছেও না।

এমনি ক'রেই লম্বা দিনটা কেটেছে একটা পীড়াদায়ক নৈঃসঙ্গে। এদিকে রক্তে ফেনিল সুরার উচ্ছলতা। ভুলতে পারছে না ওয়াং ছোটর ঋজু দীর্ঘছন্দ মূর্তি। ঘন-সংশ্লিষ্ট কালো ভ্রূ-জোড়ার বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় যৌবনের কি দীপ্ত গাম্ভীর্য! আর যুঁই! যুঁইএর কথাও ভুলতে পারছে না। নিজের মনে মনেই বলে: 'বোধ হয় ওরা এক বয়সীই হবে। বছর আঠার হবে দুজনেই।'

সঙ্গে সঙ্গেই অনুভবে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠল, বেশীদিন নেই আর, ওর বয়স হবে সত্তরের গণ্ডী পেরিয়ে। আজ এ বয়সে ধমনীর সংগোপনে রক্তের যৌবন-সুলভ উন্মত্ততা ওকে লজ্জা দেয়, ভাবে—ভালো—সেই ভালো, ছেলের হাতেই সঁপে দেব এই কন্যাকে। বার বার ক'রে এই মন্ত্র ও জপে' জপে' শোনাতে লাগল দুই কানকে। কিন্তু উচ্চারণ করতেই ওর ক্লিষ্ট মাংসে যেন একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ঝক্-ঝকে ফলা আমূল ফুঁড়ে বসে। হবে, এ আঘাত ওকে সইতেই হবে, ব্যথা লাগবে তাও। নিজের হাতেই নিজের দেহে ছোরা বসাতে হবে।

রাত হ'ল—কেউ এল না। একা, বড় একা। আপন মহলে ওয়াং বসে রইল একা। এত বড় পুরীতে একটা মানুষ নেই যার কাছে দাঁড়াতে পারে গিয়ে। বাতাসে কাসিয়া ফুলের গন্ধ। রাতটা উষ্ণতায় স্পন্দিত। আঙিনায় গাছের তলাকার অন্ধকারে ওয়াং এসে বসে। কে যেন পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়।

যুঁই!

'যুঁই !—চুপি চুপি ডাকে ওয়াং। স্বরটা শোনায় নিশ্বাসের মত। যুঁই থেমে প'ড়ে শুনতে চেষ্টা ক'রল।

ওয়াং আবার ডাকে। চাপা স্বরটা কণ্ঠের গণ্ডী ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসতে চায় না।

'যুঁই এখানে এস একটু।'

যুঁই শুনতে পেয়ে ভয়ে ভয়ে গেট পেরিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। অন্ধকার যুঁইকে দু'হাতে রাখলে আড়াল ক'রে। ওয়াং ওকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু অনুভব ক'রছে স্পষ্ট—ঐ তো যুঁই দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে যুঁইএর জামাটা ধরে ফেলে ঘন কণ্ঠে ডাকে : 'যুঁই—'

আর বলা হ'ল না। ওয়াং থেমে গেল। বলবে কি লোকে ওকে ; এরই বয়সী নাতি-নাতনীতে যে ওর ঘর ভরা। ওয়াং আস্তে আস্তে ওর জামাটায় হাত বুলোতে লাগল।

যুঁই দাঁড়িয়ে আছে! প্রতিক্ষায়। ওয়াঙের রক্তের উত্তাপ ওর অন্তরে গিয়ে লাগে। তারপর হঠাৎ বৃন্ত হ'তে খ'সে পড়া ফুলটির মত যুঁই ব'সে পড়ল মাটিতে ; উপুড় হয়ে দু'হাতে ওয়াঙের পাদুটো জড়িয়ে ধ'রে পড়ে রইল। ওয়াং ধীরে ধীরে বলে :

যুঁই আমি যে বুড়ো হয়েছি, বড় বেশী বুড়ো—'

'তাই ভালোবাসি, আমি বড় ভালবাসি—বুড়োরাই ভালো—' কাসিয়া ফুলের সুবাসিত নিঃশ্বাসের মত যুঁইএর কণ্ঠ ভেসে এল অন্ধকারের উপর দিয়ে।

'তুই যে বড় ছোট যুঁই। তোরই মন অমন টুকটুকে সুন্দর যোয়ান তাজা ছেলেই যে তোর সাথে মানায় যুঁই!' মনে মনে জুড়ে দিল—'আমার ছেলের মত—' কিন্তু জোরে বলতে পারল না সাহস ক'রে ; কি জানি মেয়েটার মনে একথাটা কোন্ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ব'য়ে আনে। তাহ'লে পারবে না, ওয়াং কিছুতে সহ্য ক'রতে পারবে না।

'না, না,' যুঁই বলে : 'না না, কক্‌খনও না, ওরা, ওই যুবো ছেলেরা ভালো নয়—ওরা বড় নিষ্ঠুর, বড় ভয়ানক—'

কচি কোমল ভীরু স্বরটা কাকুতির মত মর্মরিত হ'য়ে, কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে ওর পায়ের কাছ থেকে উর্দ্ধে উঠে ওর বুককে স্পন্দিত মথিত ক'রে তোলে। একটা বিশাল ভালোবাসায় ওয়াঙের হৃদয় তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে। বিশ্বের কোমলতা হাতে মাখিয়ে ধীরে ধীরে যুঁইকে তুলে নিয়ে যায় নিজের ঘরে।

নিজের কাছেই অদ্ভুত বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে ওঠে ওয়াঙের এই পরিণত বয়সের নূতন প্রেম। ওর যৌবনের দিনের কত চিত্ত-বৈকল্য, কত উদ্দামতা, কত চঞ্চলতা, কত উন্মত্ত কামনার ইতিহাস।—এমন বিস্মিত ওয়াং হয়নি কোনদিন। ওর প্রেম যেন ওর বার্ধক্যে নবজন্ম নিয়েছে নবরূপে। কৈ ওয়াং তেমন ক'রে তো যুঁইকে কাছে টানে নি—যেমন ক'রে এনেছিল ওই নারীদের যারা ওর প্রখর যৌবনের দিনে ওর জীবনে পদার্পণ ক'রেছিল।

না, আজ ওর স্পর্শে সে তীব্রতা ছিল না। আজ ও যুঁইকে কোমল হাতে আল্‌তো করে ধরেছিল। ওর স্থবির মাংসে ওই দেহখানির কোমল উষ্ণ স্পর্শটুকুই তৃপ্তি আনে। দিনের বেলায় ওকে দেখেই ওয়াঙের দু'চোখ ভ'রে ওঠে। মন ভ'রে ওঠে ওর জামাটার উপর হাত বুলিয়ে, আর রাতে প্রশান্ত নির্ভরতায় যুঁইএর এলিয়ে দেওয়া দেহের নৈকট্যে। কি বিচিত্র এই পরিণত বয়সের ভালোবাসা! কত সহজে এর তৃপ্তি!

আর যুঁই! ওর মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই। পিতার কাছে কন্যা যেমন, তেমনি শান্ত নির্ভরতায় ও ঘুমায় ওয়াঙের পাশে। ও যেন নারী নয়, কৈশোরোন্মুখী শিশু; নারী হ'য়ে এখনও ফুটে ওঠেনি।

ওয়াং কাউকে কিছু বলল না। বলবেই বা কেন? ও-ই প্রভু, ও-ই মালিক, জবাবদিহি ক'রবে কার কাছে!

কিন্তু কোকিলার চোখ এড়ায় না একদিন ভোরবেলা ওয়াঙের মহল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যুঁই ধরা প'ড়ে যায়। কোকিলার শ্যেন-চক্ষু ঝক্‌মক্‌ ক'রে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে:

'হুঁ। বড় মাছটাই জালে তুলেছিস্‌, লো!'

ওয়াং ঘর থেকে শুনতে পেয়ে তাড়াতড়ি কাপড় ঠিক ক'রে বাইরে এসে কতক গর্ব কতক ভয়ের হাসি হেসে যেন সাফাই দিতে দিতে বলে:

'তা-তা আমি বলেছিলুম ওকে, আমি বুড়ো হ'য়েছি। হেঁ হেঁ—কোন সোমত্ত জোয়ান—তা ওর এই বুড়োকেই পছন্দ।'

কোকিলার চোখ বিষে জ্বলে ওঠে! বলে:

'তা বেশ গিন্নীকে খবরটা দিই গে।'

ওয়াং ধীরে ধীরে বলে: 'কি জানি কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কি যে ঘটে গেল, টেরই পেলাম না।'

'ভালই তো খোস্‌খবরটা দিইগে গিন্নীকে।'

কমলের প্রলয়ঙ্কর ক্রোধকেই ওয়াঙের ভয় বেশী। ভয়ে ভয়ে বলে :

'বলতে চাও বল। কিন্তু—হেঁ হেঁ - দেখ, তোমায়—হেঁ হেঁ—কিছু দেব এই হাত খরচ কিছু। দেখ যেন গিন্নী রাগ না করে।'

কোকিলা হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা করে। ওয়াং গিয়ে ঘরে ঢোকে, আর বেরয় না। কোকিলা এসে ডাকে :

'বেরিয়ে এসগো কর্তা! উত্‌রে গেছে। বাবাঃ কি রাগটাই না ক'রল প্রথম। সে এক কাণ্ড! কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিলুম, সেই সেবারে বিলিতী ঘড়ি দেবে বলেছিলে, আর চুণীর একজোড়া আংটি, তু'হাতের তু' আঙুলে পরবে। আর যা যা চায় দিয়ে দাও বাপু সব। আর যুঁইয়ের জায়গায় আর একটি ঝি ঠিক ক'রে দাও। সাবধান ও যেন আর সামনে না যায়। তুমিও এখন যেওনা বাপু। তোমায় দেখলে নাকি গিন্নীর পিত্তি জ্বলে যায়।'

পরম আগ্রহে ওয়াং সব স্বীকার ক'রে নিল! দাও দাও, যা চায় সব দাও। কমলের সামনে যেতে হবে না, এতে ওয়াং আশ্বস্ত হ'ল।

কিন্তু তিন ছেলে র'য়েছে। তাদের কাছে ওয়াং যেন মরমে মরে রইল। কিন্তু কেন? কিসের লজ্জা, কিসের ভয়। ওয়া কি বাড়ীর কর্তা নাকি? নিজের পয়সায় বাঁদী কিনেছে ওয়াং, অন্যের পয়সায় নয়।

কিন্তু তবুও লজ্জা করে। লজ্জার সাথে গর্ব। সবাই দেখেছে ওয়াং বৃদ্ধ। অতগুলো পৌত্র পৌত্রী র'য়েছে ওর—পিতামহ। কিন্তু ওরা তো জানে না—যুবক ওয়াং মরেনি। বৃদ্ধ ওয়াঙের ধমনীতে এখনও তাজা রক্ত বয়।

ছেলেরা আসে—আলাদা আলাদা। প্রথম মেজবাবু। সে কয় সংসারী কথা, জমি-জমার কথা, ফসলের কথা, বৃষ্টি হ'ল না—ফসল তেমন হবে না। ওয়াঙের তাতে ভারী এল গেল। গতবছরের উদ্‌বৃত্ত ফসল র'য়েছে, সঞ্চিত অর্থ র'য়েছে। বাজারে পাওনা র'য়েছে সেও তো অনেক। উঁচু সুদে লগ্নী কারবার চলছে। মেজবাবু সুদ যা আদায় উসুল করে তার পরিমাণও কম নয়। সুতরাং মাটির দিকে আকাশ যে কি দৃষ্টিতে তাকাল সে ভাবনা ওয়াঙের ভাব্‌বার নয়।

মেজবাবু এ সব কথাই বলে আর চারিদিকে চায় অপাঙ্গে। ওয়াং

বোঝে—সে দৃষ্টির উদ্দেশ্য, কানে যা শুনেছে তা চোখে পরখ ক'রে নেওয়া। যুঁই, শোবার ঘরে আত্মগোপন ক'রে ছিল, ওয়াং ডাকল :

'কোথায় যুঁই, আমার আর মেজ খোকার জন্য চা নিয়ে আয় তো!' যুঁই বেরিয়ে এল। কমল পাণ্ডুর মুখে লালের আভা ফুটে উঠেছে পিচ্ ফলের মত। মাথা নীচু ক'রে নিঃশব্দে যুঁই এগিয়ে এল। মেজ বাবু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যুঁইএর দিকে অনেকক্ষণ। ওর যেন এতক্ষণ যা শুনেছে বিশ্বাস হচ্ছিল না কিছুই। কিন্তু মুখে বলল না কিছু। জমি-জমার কথা, রায়ত প্রজার কথাই বলে চলল,—আসছে বছর অমুককে জমি আর বরগা দেওয়া চলবে না, চণ্ডুখোর ব্যাটা, জমি চষবে কি!

ওয়াং খবর নিল মেজর ছেলেরা কেমন আছে। ক'মাস ধরেই তো কাশি চলেছে ওগুলোর। গরম পড়ে এসেছে, সেরে যাবে এবার। চা খেতে খেতে ঘুরে ফিরে এ সব কথাই হ'ল। নাং ওয়েন্ তার দ্রষ্টব্য ভাল ক'রে দেখে চলে গেল। ওয়াঙের একটা ফাঁড়া কাটল।

দুপুরের আগেই আসে বড় বাবু। তার দেহ ঋজু, সুষ্ঠু, দীর্ঘতায় বয়সের উপযুক্ত মর্যাদা, মুখে গাম্ভীর্য। ওয়াং এই মর্যাদা-বোধকে ভয় করে। প্রথমে যুঁইকে সে সামনে ডাকল না। নাং এন্ সম্ভ্রম ও আত্মবোধে কঠিন হ'য়ে ব'সে পিতার কুশল প্রশ্ন করে যথারীতি। ওয়াং শান্ত ভাবে উত্তর দেয়। ছেলের দিকে তাকিয়ে ওয়াঙের ভয় ভেঙে গেল। কেন ভয় করবে ওই ভীরুটাকে? শরীর খানাই আছে। এদিকে সহরে বৌটির কাছে তো কেঁচোটি—আর পাছে চেহারার কোনো ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে উনি চাষার ছেলে সেই ভয়ে সারা। একে ভয়? ছিঃ, মাটির যে বলিষ্ঠতা ওয়াঙের সত্তার সাথে ওর অজ্ঞাতসারেই এক হ'য়ে মিশে আছে, এই মুহূর্তে তাতে যেন জোয়ার জাগল। ওয়াং আবার আগের মতই বড় ছেলেকে ভয় করল না, গ্রাহ্য করল না ওর মার্জিত-রুচি, পরিচ্ছন্ন পালিশ-লাগানো চেহারাকে। অকস্মাৎ নিতান্ত সহজ সুরে যুঁইকে ডেকে ওদের জন্য চা আনতে বলে দিল।

যুঁই আসে, যেন হিমাক্ত প্রস্তর মূর্তি—মুখ রক্তহীন, যুঁই ফুলের মত সাদা। চোখ রইল মাটিতে—কলের পুতুলের মত আদেশ পালন ক'রে নীরবে বেরিয়ে গেল।

যতক্ষণ যুঁই চা ঢালছিল—ওরা দু'জন নীরবে বসেছিল। চলে যেতে

পেয়ালা তুলে নিল। ওয়াং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চায়—নাং এন্‌এর চোখে একদিকে কা'র রূপের প্রতিফলিত আলো, আর একদিকে গোপন ঈর্ষার চাপা আগুন।

এক সঙ্গে ব'সে ওরা চা খায়। অবশেষে দুর্বল বিচলিত স্বরে নাং এন্‌ বলে :

'এতক্ষণ বিশ্বেস হয়নি যা শুনেছি।'

ওয়াং শান্ত, স্থির কণ্ঠে জবাব দেয় :

'কেন হয়নি? এ বাড়ী আমার মনে রেখো।'

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে একটু থেমে নাং এন্‌ বলে :

'তুমি বড়লোক, যা খুশী করতে পারো বৈকি।'

তারপর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে :

'কোন পুরুষেরই একজন চলে না বরাবর…এবং একটা সময় আসে—' নাং এন্‌ থেমে যায়। দৃষ্টিতে সেই ঈর্ষা। ওয়াং দেখে হাসে। ছেলেকে ও চেনে,—তার ভেতরের কামনার লালা-ক্লিন্ন জন্তুটাকেও চেনে। জানে নাগরিকা স্ত্রীটি ওর রাশ চিরকাল টেনে রাখতে পারবে না। একদিন না একদিন জন্তুটা ছুটে পালাবেই।

নাং এন্‌ আর কিছু না ব'লে কি যেন ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল। ওয়াং বসে পাইপ টানতে টানতে গর্বে স্ফীত হ'তে লাগল—বৃদ্ধ ওয়াং তার যা খুসী ক'রেছে।

রাতে এল ছোট ছেলে—সেও একাই। ওয়াং মাঝের ঘরে ব'সে। লাল মোমবাতি টেবিলের উপর জল্‌ছে। টেবিলের একধারে ব'সে ওয়াং পাইপ টেনে চলেছে। আর একধারে যুঁই। ওর হাত দু'খানি যুক্ত হ'য়ে কোলের ওপর যেন ঘুমিয়ে। মাঝে মাঝে শিশুর সারল্য-মাখা, ছলা-কলা-হীন পরিপূর্ণ শান্ত দৃষ্টিতে ওয়াঙের দিকে তাকায়। হঠাৎ ছোট এসে সামনে দাঁড়ায়। কেউ ওকে ঢুকতে দেখেনি। ও যেন অন্ধকারের বুক চিরে সেই মুহূর্তে এখানে এসে ছিট্‌কে পড়্‌ল। অদ্ভুত একটা হিংস্র ভঙ্গীতে ও দাঁড়িয়ে, যেন এখনি কা'র ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। ওয়াং লাং এর চকিতে মনে পড়ে গেল—কবে গ্রামের লোকেরা পাহাড় থেকে একটা চিতা বাঘ ধরে এনেছিল। বাঘটা ছিল বন্দী, তবু শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার একটা প্রচেষ্টা স্পষ্ট ছিল ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে—চোখে ছিল জিঘাংসার স্ফুলিঙ্গ। ছোটর

চোখও তেমনি হিংস্রতায় বাবার মুখের ওপর যেন বিঁধে আছে। আর ঐ ভ্রূ-জোড়ায়--ওর বয়সের তুলনায় যা বড় বেশী কালো, বড় বেশী নিবিড়—কী ভীষণতায় কুঞ্চিত, রাশীকৃত, কৃষ্ণতর হ'য়ে যেন ওর চোখের ঠিক ওপরে জমাট বেঁধে আছে। অমনি করে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আবেক-মথিত স্বরে ধীরে ধীরে বলল :

'চল্লুম এবারে আমি যুদ্ধে – আমি চল্লুম—'

যুঁইয়ের দিকে তাকাল না। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল। আর ওয়াং— যে বড় ছেলেকে ভয় করেনি, গ্রাহ্য করেনি মেজকে,—হঠাৎ ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেল ছোটর কাছেই, জন্ম থেকে যাকে সে আমলেই আনেনি মোটে।

ওয়াঙের মুখে কথা আটকে গেল। কি যেন বলতে গিয়ে অস্পষ্ট ভাঙ্গা-চোরা কয়েকটা শব্দের টুকরো মাত্র বেরুল। তাড়াতাড়ি হুঁকোটা চেপে ধরল মুখে। বিকৃত শব্দও বেরুতে দিল না। তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে। ছেলে বার বার ব'লে চলল :

'এবারে যাবই আমি, যাবই।'

তারপর অকস্মাৎ ছোট পেছন ফিরে দৃষ্টি ফেলল যুঁইয়ের দিকে। যুঁইও সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল পরম কুণ্ঠায়! দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজল যুঁই। ছোট তার দৃষ্টি উপড়ে নিয়ে ছিটকে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

সীমাহীন অন্ধকার। খোলা দরজার চতুষ্কোণ অন্ধকার অবকাশের পথে নিদাঘ রাত্রির সেই উৎসারিত কালোর পারাবারে কোথায় হারিয়ে গেল ছোট। চারিদিকে স্তব্ধতা থম্‌থম্ ক'রে উঠল।

বৃদ্ধের গর্বের চূড়া মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অব্যক্ত বেদনায় গুমরে উঠল ওর স্থবির বুক।

'ওরে যুঁই, আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি, বুড়ো হয়ে গেছি, তোর যোগ্য নই, নই।'

মুখ থেকে হাত পড়ে গেল যুঁইয়ের। প্রবল আবেগে কান্না উদ্বেল হ'য়ে উঠল। অমন ক'রে ওকে কাঁদতে ওয়াং দেখেনি।

'আমি বুড়োদেরই ভালবাসি গো। ঐ ওরা, ছেলেরা বড় নিষ্ঠুর, বড়—'

রাত ভোর হ'তে দেখা গেল ছোট নেই। কিন্তু কোথায় ছোট? কোথায়?

নিদাঘের শেষ উত্তাপটুকু বুকে আঁকড়ে ক্ষণিকের জন্ম প্রচণ্ড হ'য়ে উঠে শরতের পরিসমাপ্তি ঘটে শীতের নিষ্প্রাণ শুভ্রতায়। তেমনি যুঁইয়ের প্রতি ওয়াঙের আবেগের উত্তাপও প্রচণ্ড হ'য়ে জলে উঠে'মরে গেল। যুঁইকে ওয়াং ভালোবাসে। কিন্তু ওর রক্তের চঞ্চলতা মরে গেছে। হঠাৎ যেন বার্ধক্যের উত্তুরে হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে নিমেষে ওকে জমিয়ে দিয়েছে। তবুও ওয়াং যুঁইকে ভালোবাসে। যুঁই ওয়াঙের প্রশান্তি, ওয়াঙের আরাম, ওয়াঙের স্বাচ্ছন্দ্য। বিশাল ধৈর্য দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যুঁই ওয়াঙের সেবা করে, থাকে কাছে কাছে। তাই ওয়াং যুঁইকে ভালোবাসে। কামনার উদ্দাম তুফান থেমে গিয়ে ওর ভালোবাসার সাগরে বাৎসল্যের গভীর প্রশান্তি নেমেছে।

ওয়াঙের জন্তই যুঁই জড়বুদ্ধি মেয়েটাকে স্নেহে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। বৃদ্ধের প্রাণে এও একটা স্বস্তি এনেছে। হতভাগিনীকে নিয়ে ওয়াঙের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। সে চলে গেলে কে-ই বা এটাকে দেখবে? ওয়াং ছাড়া কেউ তো ফিরেও তাকায় না ওর দিকে। হয়ত' না খেয়েই পড়ে থাকবে: কারো খোঁজ পড়বে না। তাই ওয়াং কিছু বিষ এনে লুকিয়ে রেখেছিল। ওর ওপর যেদিন মৃত্যুর সমন জারি হবে, ঐ বিষের সাহায্যে বোবা মেয়েটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে ওয়াং। নিজের মৃত্যুর চাইতে মেয়েটার বেঁচে থাকাকে ওর ভয় বেশী। এখন যুঁইয়ের স্নেহকোমল সেবায় ও নিশ্চিন্ত হ'ল। একদিন যুঁইকে ডেকে বলল:

'আমি মরলে মেয়েটাকে কেউ দেখবার থাকতো না যুঁই। এখন তোর হাতে ওকে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুঝতে পারব। আমার পরে কতকালই তো ও বেঁচে থাকবে। ওর জগতে কোন ভাবনা, কোন জ্বালা, কোন দুঃখ তো নেই যার ঘসায় ঘসায় ওর আয়ু ক্ষয়ে যাবে। ওর পঙ্গু মনে কোন কিছুরই দাগ লাগে না। এও আমি জানি, আমি মরলে কেউ ওকে খেয়াল ক'রে একমুঠো খাবারও দেবে না। জলে ভিজবে, রোদে পুড়বে, ওকে ঘরে আনার কথা কারো মনে থাকবে না। শীতে বেচারা কাঁপবে ধরে একটু রোদে বসাবে না কেউ। হয়ত' বা কোনদিন রাস্তায় বেরিয়ে নিখোঁজই হ'য়ে যাবে। ওর মা থাকতে ওকে বুকে ক'রে রেখেছিল। সে চলে গেল হতভাগীকে আমার বুকে রেখে। আমি ওর মা বাপ দু'ই হয়ে ওকে ঢেকে রেখেছিলাম রে যুঁই। ওর গায়ে তো কোন আঁচই লাগেনি।'

বিষের মোড়কটা বের ক'রে বলল : 'ধর, তুলি রাখ এটা। আমি মরলে এর একটু ওর ভাতে মিশিয়ে দিয়ে ওকে আমার পেছন পেছন পাটিয়ে দিস্, ও মরে বাঁচবে। বল করবি। আমি তা'হলে সুখে মরি।'

যুঁই মোড়কটা দেখে ভয় পেয়ে যায়। ধীরে ধীরে বলে : 'কি বলছেন, একটা মাছি মারতে আমার হাতে বেধে যায়, আর জলজ্যান্ত একটা মানুষ মারব কি ক'রে! দিয়ে দিন ওকে আমায়। আমি নিলুম ওকে। ছনিয়ায় এক আপনি ছাড়া আমার সাথে একটা ভাল কথা কেউ তো বলেনি, একটু দরদ কেউ দেখায়নি। আপনার অগাধ স্নেহের ঋণ অণু-পরিমাণও তো শোধ দিতে পারিনি! ওর সেবা ক'রে আপনার স্নেহের একটু মর্যাদা করার অধিকার দিন আমায়।'

ওয়াঙের চোখ ছলছল ক'রে উঠল। এমন ক'রে সান্ত্বনার কথা কেউ ওকে বলেনি। যূঁই যেন আজ আরো কাছে এল।

'তা হোক, তা হোক যুঁই। তোকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করিনে, রেখে দে এটা কাছে। বলতে আমার বুকটা টন্ টন্' ক'রে ওঠে, কিন্তু তুই—তুইও অমর হ'য়ে আসিসনি রে। ধর তুই-ই—' ওয়াঙের গলায় বেধে যায় : একমুহূর্ত থেমে আবার বলে : 'ধর ওর আগেই যদি তোর ডাক আসে—কেউ থাকবে না ওর তা হ'লে। আমার ছেলে বৌরা? তাদের যে নিজের জগৎ গড়ে উঠেছে যুঁই! তাদের বিবাদ, তাদের সন্তান নিয়েই তারা ব্যস্ত, অন্যদিকে তাকাবার তাদের সময় কই? আর ছেলেরা পুরুষ মানুষ, তাদের কি এসব দিকে খেয়াল থাকে?'

যুঁই বুঝতে পারে। কোন কথা না বলে মোড়কটা নিয়ে রেখে দিল। দুর্ভাগিনী মেয়েটা সম্বন্ধে ওয়াং নিশ্চিন্ত হয়।

ওয়াং যেন সত্যই এবার বাইরের সংসার হতে সংহৃত হ'য়ে তার বার্ধক্যের খোলসের মধ্যে ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকতে লাগল। ওর মহলের দুটি প্রাণীর সাময়িক সঙ্গ ছাড়া বেশীর ভাগ ওর একাই কাটে। মাঝে মাঝে যেন গভীর সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে যুঁইয়ের মুখের দিকে তাকায়—গভীর উদ্বেগে মুখ রেখায়িত হ'য়ে ওঠে। বলে : 'আমি যে একেবারে জুড়িয়ে গেছি যুঁই! এ ঠাণ্ডা জীবন তোর সহ্য হবে কেন?'

গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে যুঁই কোমল স্বরে জানিয়ে দেয় : 'হোক তা, কিন্তু এ যে বড় শান্তি, কত বড় নিশ্চিন্ত আশ্রয়।'

ওয়াং আবার কখনও হয়ত' বলে : 'যুঁই, একেবারে জুড়িয়ে গেছি, আগুন নেই এককোঁটা, পড়ে আছে খালি ছাই।'

যুঁইয়ের ঐ এক জবাব—অন্য কোন পুরুষকে সে চায় না, চায় না। ওয়াঙের অবাক লাগে। একদিন কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রল এই তরুণ বয়সে পুরুষ জাতির ওপর অমন ভয়ের কারণ ওর কি ঘটল। উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল যুঁইয়ের মুখের দিকে। একি! অতিকায় শঙ্কা কালো হ'য়ে ওঠে ওর দুই চোখে। আশ্চর্য! দুই হাতে যুঁই মুখ ঢাকল। তারপর একেবারে চাপা গলায় বলল :

'না, না, আপনি ছাড়া সব পুরুষকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি। আজন্ম ক'রে এসেছি—বাবাকে সুদ্ধ। কেনই বা ক'রব না—বাপ হ'য়ে আমাকে বেচে দিতে পেরেছিল—।'

ওয়াং আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'কিন্তু আমার বাড়ী তো তুই নির্ঝঞ্ঝাটেই ছিলি, কেউ তো কোন অত্যাচার করেনি তোর'পর।'

অন্যদিকে তাকিয়ে যুঁই বলে চলে : 'সকলকে ঘৃণা করি,—মন থেকে, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘৃণা করি।...বিশেষ ক'রে যুবকদের। ঘৃণা—কেবল ঘৃণা-আর কিছু না। ওদের কেবল ঘৃণা করি।'

যুঁই আর কিছু বলল না। ওয়াং বিস্ময়ের সাগরে ডুবে ভাবে, কেন অমন হল। কমল কি তার নিজের জীবনের ইতিহাস শুনিয়ে ওর মনকে বিষিয়ে দিল? না কোকিলা ওকে পুরুষের প্রবৃত্তির খেলায় মেয়েদের সর্বনাশের কাহিনী শোনাল! কী এ? না ওরই জীবনে রয়েছে কোন সুগোপন ইতিহাস—যার রহস্য ও উদ্‌ঘাটন করবে না!

প্রশ্নটা আর তুলল না ওয়াং! অনর্থক মাথা ঘামানো। ভালো লাগে না ঝঞ্ঝাট। ও শান্তি চায়। যুঁই আর মেয়েটাকে কাছে নিয়ে ও নিরালা চুপচাপ বসে থাকবে।

অমনি ক'রেই ওয়াং বসে থাকে। দিন যায় বছর যায়, ওয়াঙের বাবা যেমন ক'রে ঝিমুত তেমনি ক'রে যেন নেশার ঘোরে ঝিমিয়ে ওর বেশী সময় কাটে এখন। ওয়াঙের আর কোন কাজ বাকী নেই, ও পরিতৃপ্ত।

মাঝে মাঝে—যদিও খুব কম, অন্য মহলে যায়। কমলের মহলেও যায় কখনও, কিন্তু আগের চাইতে আরো কম। যুঁইয়ের কথা কমল মুখে আনে না। ওয়াংকে সাদরে অভ্যর্থনা করে। কমলও এখন বুড়ো হয়েছে। খাওয়া

আর টাকা নিয়ে সে খুসি। কোকিলা পরিচারিকার পদ হ'তে সখীর পর্যায়ে উন্নীত হ'য়েছে। দু'জনে একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করে অফুরন্ত—বেশীর ভাগ ওদের বিগত দিনের রসাল ইতিহাসের জাবর কাটে, কত গোপন পর্বের স্মৃতি নিয়ে কাণাকাণি করে। খায়, ঘুমায়, জেগে ওঠে খাবার আগে পর্যন্ত গালে হাত দিয়ে বসে আবার গল্প করে।

ওয়াং ছেলেদের মহলে গেলে তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, চা এনে দেয়, আদর ক'রে বসায়। ওয়াং নবতম শিশুকে দেখতে চায়। জিজ্ঞাসা করে কটি নাতি হ'ল সবসুদ্ধ। কতবার যে এ প্রশ্ন করেছে, প্রতিবারই ভুলে গেছে।

কেউ জবাব দিল তাড়াতাড়ি—দু'ঘরে মিলিয়ে এগার ছেলে, নয় মেয়ে। কল্ কল্ ক'রে হাসতে হাসতে বৃদ্ধ বলে: প্রতি বছর দুটো ক'রে যোগ দাও আরো। ঠিক হলো না? তারপর খাণিকক্ষণ বসে। চারিদিকে ঘিরে আসে নাতি নাত্নীরা। তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খুঁটে খুঁটে। বেশ লম্বা বড় সড় হ'য়ে উঠেছে সব। আপন মনে বসে বসে বলে: 'আরে এ ছেলেটা দেখ্‌ছি আমার বাবার মত হয়েছে ঠিক! এটা দেখছি আবার ছোট খাট একটা লিউ! বাঃ বেশ মজা তো, ইনি যে দেখছি খোকা ওয়াং লাং!'

নাতিদের জিজ্ঞাসা করে: 'ইস্কুল যাচ্ছিস তো তোরা?'

চারিদিক থেকে কল কল এলো মেলো জবাব আসে: যাচ্ছি দাদু!'

'শাস্ত্র টাস্ত্র একটু আধটু পড়ছিস তো।'

ওরা হেসে ওঠে। কচি কচি মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি। বুড়ো হয়ে গেছে দাদু, কিছু জানে না। 'না দাদু এখন আর ওসব পড়ায় না, সেবার বিপ্লবের পর থেকে ওসব উঠে গেছে।'

ওয়াং একটু ভেবে বলে: 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে, কবে একটা বিপ্লব হয়েছিল। আমার কি তখন আর মরবার ফুরসুৎ ছিল। কাজ-কর্ম নিয়ে এমনি ব্যস্ত ছিলাম, ওসব দিকে মন দিতে পারিনি। জমিজমার কাজ কি আর একটুখানি!'

নাতিরা মুখ ঘুরিয়ে নাসিকা-কুঞ্চন করে। ওয়াং উঠে পড়ে। ছেলেদের মহলে ওয়াং অতিথি।

কিছুদিনের মধ্যে ছেলেদের মহলে যাওয়া ছেড়ে দিল। কোকিলাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা ক'রে জানে বৌমারা এখনও আগের মত ঝগড়া করে কি না, না মিলেমিশে আছে। কোকিলা মাটিতে খানিকটা থুথু ফেলে বলে:

'হুঁ:, পীরিতের আর অন্ত নেই! যেন সাপ আর নেউল। বড় বৌএর নালিশের জ্বালায় বড়বাবুর তো হাড় কালি হয়ে গেল। খালি বাপের বাড়ীর গুমর। অমন মেয়েমানুষ নিয়ে পুরুষে ঘর কত্তে পারে? শুনছি বড়বাবু নাকি আবার বিয়ে করবে।'

কোকিলার কথা শেষ হবার আগেই ওয়াঙের কৌতুহল শেষ হ'য়ে গেছে। ততক্ষণে চায়ের ভাবনা ওর মনে জুড়ে বসেছে। যা হাওয়া, শীতও যে করছে বড়!

আর একদিন হয়ত' কোকিলাকে জিজ্ঞাসা করে: 'ছোটর খবর পেলে কিছু? এতদিনে কোথায় রইল ছেলেটা।'

কোকিলা এ বাড়ীর সব জানে। সে হয়ত জবাব দেয়:

'না, তা চিঠিপত্র লেখে কই? দক্ষিণ দেশ থেকে কেউ কেউ এলে শুনি সে নাকি ভারী বড় চাকরী করে সেখানে সৈন্যদের দলে। বিপ্লব না বিপ্লব, কি বলে ছাই মাথা মুণ্ডু, কী হ'য়েছিল সেবারে, তাতেই নাকি তার বড় মান বেড়েছে।'

'বেশ বেশ,'—বার বার মাথা নেড়ে ওয়াং বলে। কিন্তু কোকিলার সব কথা হয়ত' ওর কানে পৌছায় না। এদিকে; সন্ধ্যে হ'য়ে আসে, ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, ওর বুড়ো হাড় শীতে কন্ কন্ ক'রে উঠেছে। বেশীক্ষণ কোন জিনিষে ওর মন বসাতে পারে না, ভালও লাগে না। তাছাড়া সব কিছুর চাইতে ওর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনানুভূতি এখনও খুব বেশী। রাতে যুঁই পাশে শোয়। তরুণ দেহের উত্তাপ ওয়াঙের উত্তাপহীন দেহে সঞ্চারিত হয়।

কত বসন্ত এল আর গেল। যতই দিন যায় ঋতুর পদধ্বনি ওয়াঙের কানে ক্ষীণতর হ'য়ে আসে। কিন্তু একটি জিনিস এখনও র'য়েছে তেমনি ভাস্বর, তেমনি জীবন্ত। সে ওর মাটির টান। মাটি থেকে ও আজ সরে এসেছে কত দূরে—ঘর বেঁধেছে নগরে: ঘরে র'য়েছে রাজার ঐশ্বর্য। কিন্তু ওয়াঙের শিকড় রয়েছে মাটি আঁকড়ে। মাসের পর মাস হয়ত ক্ষেতে যায় না, সম্পূর্ণ ভুলে যায় ক্ষেতের কথা। কিন্তু বসন্ত এলে আর ওয়াং ঘরে থাকতে পারে না। নিজের হাতে হাল চালাবার শক্তি নেই, তবুও যাবে, দাঁড়িয়ে দেখবে কৃষাণদের হাল চালানো, হালের ফলায় মাটির বুক চিরে ফেড়ে চলে যাওয়া।

কখনও সঙ্গে ভৃত্য তার বিছানা নিয়ে যায়। রাতে ঘুমায় সেই মেটে ঘরে, সেই পুরানো খাটে—যেখানে ও শুয়েছে, যেখানে পৃথিবীর আলো দেখেছে ওর সন্তানেরা, যেখানে ওলান্‌এর শেষ নিশ্বাস পড়েছে। ভোর বেলা জেগে উঠে বেরিয়ে যায় মাঠে। কম্পিত হাতে কষ্টে সৃষ্টে ভেঙ্গে নেয় মুকুলিত উইলো গাছের একটা শিশু-শাখা, পিচ ফুলের একটা স্তবক। সারাদিন হাতের মুঠোয় ক'রে রাখে।

সেবার বসন্তের শেষ দিকে একদিন হাঁটতে হাঁটতে ওয়াং এসে পড়ল ছোট পাহাড়টার গায়ে সেই ঘেরা জায়গায়, যেখানে ওর কত প্রিয়জনের সমাধি রচিত হয়েছে। লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও কাঁপতে লাগল। সমাধিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, এদের নীচেকার অধিবাসীদের প্রত্যেকের কথা ওর মনে পড়ে গেল। এই মৃতরা আজ সত্যতর স্পষ্টতর হয়ে উঠল—হয়ে উঠল জীবিতের চাইতে, ওর জীবন্ত পুত্রদের চাইতে, বোবা মেয়েটা আর যুঁই ছাড়া সব কিছুর চাইতে। কতগুলী স্তূপীকৃত বছরের স্তর ডিঙ্গিয়ে ওর চেতনা আজ চ'লে গেল এক সুদূর অতীতের তটোপান্তে। সুদূর সেই অতীতের সব কিছু, তার ক্ষুদ্রতম অণুটুকুও ওয়াঙের কাছে আজ বিশাল তেজোময় হ'য়ে উঠল - এমন কি ছোট খুকীর কথাও আজ মনে প'ড়ে গেল। কতদিন খবর পায়নি তার—হয়ত' মনেও নেই কতদিন। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে ছিল, এক টুকরো পাতলা সিল্কের মতো টুকটুকে দুটি ঠোঁট। সেও ওয়াঙের কাছে এই মৃতদের মতই বিস্মৃতির তলায় ডুবে গিয়েছিল! হঠাৎ বিদ্যুতের মত ওর মনে খেলে গেল, তাইতো—এবার পালা যে ওর!

ওয়াং ভালো ক'রে দেখে দেখে ঘেরার মধ্যে নিজের জন্য একটা স্থান নির্বাচন ক'রে নিল—যেখানে ও এসে শুয়ে পড়বে, বাবা কাকার পায়ের নীচে, চিংএর মাথার কাছে আর ওলান্‌এর পাশে। মাটির এ টুকরোটার দিকে ও নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট দেখতে পেল, মাটির তলায় ওই যে ওয়াং রয়েছে শুয়ে। শাশ্বত কালের মাটির ছেলে ওয়াং আবার শাশ্বতকালের জন্য ফিরে এলো মাটির কোলে—ওর পরম আপনার ধন ওই মাটি, ওই জমি,—ক্ষেত মাঠ—।

এবারে কফিনটাও দেখে নিতে হবে। মনে হ'তেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল,—কিন্তু কথাটা ওকে পেয়ে বসল। সহরে ফিরে এসে নাং এন্‌কে ডেকে পাঠাল। সে এসে বলল :

'আমার একটা কথা বলার আছে।'

'এই তো রয়েছি বাবা, কি বলবে ?'

কিন্তু বলতে গিয়ে কি বলতে বসেছিল তা মনে ক'রে উঠতে পারল না। ওর চোখ ফেটে জল এল। এত কষ্ট ক'রে ও আঁকড়ে জড়িয়ে রেখেছিল কথাটা বুকের মধ্যে ; ব্যথা বাজছিল, কাঁটার মত ফুটে বসেছিল—আর তাই কিনা দুষ্টু ছেলের মত কোন ফাঁকে পালিয়ে গেল! যুঁইকে ডেকে বল্‌ল :

'আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম রে যুঁই ?

'কোথায় গিয়েছিলেন আজ ?'

ওয়াং যুঁইয়ের চোখে চোখ রেখে খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বলল :

'মাঠে গিয়েছিলাম।'

'কোন্ মাঠে ?'

নিমেষে ওয়াঙের স্মৃতি ফিরে এল, জল ভরা চোখে হাসি ঝল্‌মল্ ক'রে উঠল। চীৎকার ক'রে বল্‌ল : 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। আমি আমার কবরের জায়গা ঠিক ক'রে এসেছি। এখন মরবার আগে আমি আমার কফিনটা দেখতে চাই।'

'ও কথা ব'লো না বাবা।...যাক্ তুমি যা বল্‌ছ, করব'—নাং এন্ বল্‌ল। যেমন ক'রে বলা উচিত ঠিক তেমনি ক'রে—বল্‌ল ওজনে, ধরনে কোথাও একচুল এদিক ওদিক হলো না।'

নাং এন্ সুগন্ধি কাঠের কারুকার্যখচিত একটা কফিন নিয়ে এল। এক কফিন ছাড়া আর কোন কাজে এ কাঠ ব্যবহার হয় না, বোধহয় লোহার চাইতে, মানুষের অস্থির চাইতে এ কাঠের স্থায়িত্ব বেশী। ওয়াং নিশ্চিন্ত হ'ল। কফিনটাকে নিজের ঘরে আনিয়ে রাখল। প্রতিদিন দেখে দেখে ওর তৃপ্তি হয়।

হঠাৎ একদিন আর একটা ইচ্ছা ওর মনে খেলে গেল। কফিনটা নিয়ে ও চলে যাবে সেই মাটির ঘরে। সেখানেই কাটাবে শেষের দিনকটা।

কিছুতেই ওয়াংকে ফেরান গেল না। সে আবার ফিরে গেল তার মাটিতে, মাটি দিয়ে বাঁধা ঘরে। সঙ্গে গেল যুঁই, বোবা মেয়ে, আর প্রয়োজন মত পরিচর অনুচর। আবার এসে ওয়াং বাসা বাঁধল ওর মাটির বুকে, মাটির ঘরে। নগরের বিশাল পুরী, যে মহা-পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে, সব পেছনে রেখে এল তাদের জন্ম।

বসন্ত আসে, যায়। গ্রীষ্মও যায়, ফসলের সম্পদে ধরিত্রীকে ঐশ্বর্যশালিনী ক'রে। ওর বাবা যেখানে বসে রোদ পোয়াত, সেখানে ওয়াং দেয়াল ঠেসান দিয়ে ব'সে শরতের শেষ রৌদ্র উপভোগ করে। কি ফসল হ'লো, কি বীজ বুনবে, সে সব ওর মন থেকে সরে গেছে। এখন কেবল মাটির ধ্যান ওর চেতনায়; ওর অবচেতনে মাটির ধ্যান মিশে একাকার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নত হ'য়ে একমুঠো মাটি খাব্‌লে তুলে নেয়। আঙুলের বন্ধনে মুঠোর মধ্যে মৃত মাটি জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। মুঠোর মধ্যে মাটির স্পর্শে অপূর্ব তৃপ্তিতে ভরে ওঠে ওর বুক। মাটির স্বপ্ন, মাটির ধ্যান—আর ওই কফিন ওর একমাত্র মননের বস্তু। দাক্ষিণ্যশালিণী ধরিত্রীর কোন ত্বরা নেই, অপার ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষা করে সে-দিনটির জন্য যে-দিন ওয়াং ফিরে আসবে তার কোলে।

ছেলেরা কর্তব্যপরায়ণ। প্রায় প্রতিদিন ওয়াংকে দেখতে আসে, ভালো ভালো খাবার পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু ওয়াঙের ভালো লাগে বাবার মত গরম গরম ভুট্টার মণ্ড খেতে। ছেলেরা প্রতিদিন আসতে না পারলে যুঁইয়ের কাছে অভিযোগ করে: 'কি এত ওদের কাজ যে বুড়ো বাপকে এসে একটু দেখে যাবার সময় হয় না?' যুঁই বলে: 'কাজ তো ওদের মেলাই। নাং এন্‌এর সহরে কত প্রতিপত্তি, কত মান। ধনীমহলে তার ঠাঁই। সে আবার আর একটা বিয়ে ক'রেছে। মেজ ধান চালের আলাদা ক'রে কারবার খুলেছে নিজের নামে।' ওয়াং শোনে, কিছু বোঝে না। দূর-প্রসারী মাটির ওপর ওর দৃষ্টি চলে যায়। মুহূর্তে সব কিছু ভুলে যায়।

একদিন ক্ষণিকের জন্য ওয়াং জেগে ওঠে। দু-ছেলেই সেদিন এসেছে। সাধারণ দু'চারটে অভ্যস্ত কথা ব'লে বাইরে এসে বাড়ীর চারিদিক ঘুরে তারা মাঠে এসে পড়ে। সব কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ওয়াঙের কাছে ধরা প'ড়ে যায়। ওয়াং চুপি চুপি ওদের পেছু নিল। ওরা কিছু দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ওয়াংও দাঁড়ায়—এত নিঃশব্দে, এত ধীরে যে ওরা টেরই পায় না। ওরা চাপাস্বরে কি বলাবলি করে—ওয়াং কান পাতে।

'ও জমিটাই তাহ'লে বেচা যাক। টাকার সমান বখ্‌রা হবে। তোমার বখরাটা আমায় ধার দিও। ভাল সুদ দেব! এখন সোজা রেল-রাস্তা হ'য়েছে—চাল চালান দিতে পারা যাবে এবার।'

'জমিটা বেচা যাক্' একথাটি বৃদ্ধের কানে গেল। প্রচণ্ড রাগে ওয়াং যেন ভেঙে খান খান হ'য়ে প'ড়ল। কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে:

'পাজী, হতচ্ছাড়া, নিষ্কর্মা শয়তানের দল। তবে রে! জমি বেচবে—' স্বর আট্‌কে যায়। হুমড়ি খেয়ে ও পড়ে যাচ্ছিল, ছেলেরা ধ'রে ফেলে। পাগলের মত কেঁদে ওঠে ওয়াং। ছেলেরা প্রবোধ দেয়:

'কে বল্‌লে। জমি বেচবো না, কক্‌খনও বেচবো না।'

'শেষ—শেষ—' বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে ওঠে: 'মাটি বেচতে আরম্ভ করলেই বাস্‌। মাটি বেরিয়ে গেলেই সেই পথে অলক্ষ্মী আসে। সর্বনাশ হবে, কিছু থাকবে না, সব যাবে—বংশ প্রতিষ্ঠা সব যাবে। ওরে মাটি বেচিস্‌নে তোরা!'

একেবারে ভেঙে পড়ে ওয়াং! একটু থেমে আবার বলে:

'ওরে মাটি হাতছাড়া করিস্‌নে। মাটি থেকে আমরা এসেছি, মাটিতেই আবার ফিরে যেতে হবে। মাটি! মাটি! ওরে মাটি ছাড়িস্‌নে তোরা, ছাড়িস্‌নে—! ওই তোদের বাঁচার পথ। মাটি কেউ কেড়ে নিতে পারে না রে, কেউ পারে না—'

কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে বৃদ্ধের গালের ওপর পড়ল। শুকিয়ে কয়েকটা কালো দাগ রেখে গেল। নত হ'য়ে হাত ভ'রে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে শক্ত ক'রে হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে আপন মনে বলতে লাগল:

'মাটি বেচবে—তাহলে আর কি? বাস্‌—'

দু ছেলে দুদিকে দাঁড়িয়ে ওকে শক্ত ক'রে ধরে রইল। ওয়াঙের মুঠোর মধ্যে উষ্ণ আল্‌গা মাটি···

ছেলেরা সান্ত্বনা দেয়। বারবার বলে:

'ভেবো না বাবা, ভেবো না। কোনো ভয় নেই তোমার। কে বলেছে জমি বেচব। এক তিলও বেচব না।'

কিন্তু বৃদ্ধের মাথার ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা মৃদু মৃদু হাসে।

২৩